জন কোম্পানীর বাঙালী কর্মচারী

জন কোম্পানীর বাঙালী কর্মচারী

নারায়ণ দত্ত

নবপত্র প্রকাশন / কলিকাতা-৭০০০০৯

RRRLF/ Nabapatra Prakashan
Rs - 20·00

প্রকাশক : প্রসূন বসু

নবপত্র প্রকাশন

৫৯ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

মুদ্রক : রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

নিউ মানস প্রিন্টিং

১/বি গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাধারমন মিত্রকে

এই গ্রন্থের অনেকগুলি প্রবন্ধ রবিবাসরীয় আনন্দবাজার, অমৃত, শারদীয় দেশ, শারদীয় অমৃত ও সমকালীন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ।

এই লেখকের অন্য গ্রন্থ :

দরবারী কানাড়া

সবিনয় নিবেদন

'জন কোম্পানীর বাঙালী কর্মচারী'—গ্রন্থটি রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে যে সব উদ্যোগী বাঙালী ইংরাজ বণিককুলের সংস্পর্শে এসে কলকাতাকে তার ঐতিহাসিক সূতিকাগারে লালন-পালনে প্রযত্ন করেছিলেন, তার ধাত্রীদেবতার দায়িত্ব পালন করেছিলেন, আড়াই শত বছরের বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে, এই যুগের বাঙালীদের সঙ্গে তাঁদের—সেই পিতৃপুরুষদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। উদ্দেশ্য—আড়াই শত বছরের অবজ্ঞা অনাদরের ধূলোবালি ঝেড়ে তাঁদের সত্যস্বরূপে প্রকাশ করা, অপরিচয়ের তিমিরাবরণ সরিয়ে তাঁদের চিনিয়ে দেওয়া। এটা নিঃসন্দেহে কঠিন দায়িত্ব, বুঝি বা অসাধ্যও। তবু জাতির পিতৃঋণ পরিশোধের মহৎ দায়িত্বের মতই অবশ্যপালনীয়, এবং সেই হিসেবে অবশ্যকরণীয়। এই চিন্তাই মুখ্যত লেখককে এই দুরূহ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্নকাহিনীমাত্র। ...সেখানে শুধু 'অশ্বের ক্ষুরধ্বনি, হস্তীর বৃংহিত, অস্ত্রের ঝঞ্চনা, সেখানে ভারতবাসী কোথায়? ঝড়ের দিনে, ধূলিসমাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যে পল্লীর গৃহে গৃহে যে জন্মমৃত্যু-সুখদুঃখের প্রবাহ চলিতে থাকে তাহা ঢাকা পড়িলেও, মানুষের পক্ষে তাহাই প্রধান।' শহর কলকাতার জন্মলগ্নের সেই দুর্যোগকুটিল মুহূর্তে শুধু ইংরাজ বণিক-সম্প্রদায়ের হুঁকাটানা,

তাদের বহুবিচিত্র ভৃত্যতন্ত্র, কামান-বন্দুকের বাহ্বাস্ফোট—সেটাই ইতিহাস নয়। সেকালে বহু বাঙালী কেঁদেছে, হেসেছে, জীবন-যন্ত্রণা ভোগ করেছে। নানা স্বার্থের সর্পিল টানাপোড়েনে কেউ বা ঐশ্বর্যের পাহাড় গড়েছে, কেউ বা পথের ভিখিরী হয়ে গেছে। কেউ প্রাণ নিয়েছে, কেউ দিয়েছে। কেউ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে, কেউ স্বরীসৃপের মত মাজা ভেঙে চাটুকার-বৃত্তির আশ্চর্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আপাতদৃষ্টিতে সেইসব গল্প যতই ক্ষুদ্র বলে মনে হোক না কেন, অপ্রয়োজনীয়, অবান্তর বলে দৃষ্টি আচ্ছন্ন করুক না কেন, কলকাতার ইতিহাস রচনায় এইসব ঘটনা, সেই ঘটনার কুশীলবদের জীবনচর্চা—তার চেয়ে প্রয়োজনীয়, অপরিহার্য আর কি থাকতে পারে?

এই ইতিহাস রচনা অবশ্যই কঠিন। নিশিত ক্ষুরধারের উপর দিয়ে গমনের মতই দুঃসাধ্য। একে ত এই ব্যাপারে নথিপত্র নাই বললেই চলে; এবং যাও আছে, তা ভিন্ন উদ্দেশ্যে সঙ্কলিত বলে কীটদষ্ট পুঁথির মত, যা জানায় তার চেয়ে বেশী রহস্যের সৃষ্টি করে। সি-আর-উইলসন সাহেবের চার খণ্ডের 'আর্লি অ্যানালস'···এর কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে মনে আসে। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রক্ষিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চিঠিপত্রগুলির মধ্যে সেকালের ইতিহাসের যে অমূল্য তথ্য রাখা আছে যেগুলি অনুধাবন করে সাহেব দাগ দিয়ে এসেছিলেন এবং পরে তাঁর বান্ধবী নকল করে পাঠিয়েছিলেন। এবং সেগুলির ওপর ভিত্তি করেই সাহেবের এই সুবৃহৎ চার খণ্ডের আকর গ্রন্থ রচনা। সেগুলিতে স্বাভাবিকভাবেই সেকালের জন কোম্পানীর বাঙালী কর্মচারীদের কথা এসেছে। কিন্তু বাঙালী কর্মচারীরাই সাহেবের মুখ্য বিষয়বস্তু না হওয়ার দরুন অপ্রয়োজনবোধে তাদের বহুকথাই সেই 'করসপণ্ডেন্স'গুলি থেকে মনে হয় আহরণ করা হয়নি, অথচ সেগুলি হয়ত সেকালের কলকাতার বাঙালীদের সম্বন্ধে নূতন আলোকপাত করতে পারত। ভবিষ্যতের কোন গবেষক ইণ্ডিয়া

অফিস লাইব্রেরীতে বসে যদি এই কাজ করতে পারেন, বা ভারত সরকার যদি এই সব চিঠিপত্রের মাইক্রোফিল্‌ম করে এনে এ দেশের গবেষকদের সাহায্য করেন, তাহলে, আমাদের বিস্মৃত ঊর্ধ্বতনপুরুষদের প্রতিকৃতি-গুলির ওপর থেকে অজ্ঞতার অন্ধকার অনেকটা সরে যাবে বলে আশা করা যেতে পারে।

এইসব মৌল অসুবিধা সত্ত্বেও, অসম্পূর্ণ নানা তথ্য নানা সূত্রে সংগ্রহ করে ছিন্নসূত্রগুলি গ্রন্থন করে বিচার বিবেচনার পর মোটামুটি একটা যুক্তিগ্রাহ্য চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করা গেছে। বলা বাহুল্য, এ'ছবি কখনই গোটা নয়, সম্পূর্ণ নয়। কেবল কোন ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের জন্য মোটামুটি একটা নকশার ছক মাত্র। আশা করি, আগামীকালের সেই মহৎ ইতিহাস রচয়িতা বাঙালীকে তার সেই যুগ সন্ধিক্ষণের মানুষগুলির সঙ্গে সত্য পরিচয় করিয়ে দেবেন—আজকের লেখক তাঁর পথ কিছুবা সুগম করার অতি সামান্য দায়িত্বটা পালন করে গেল।

আরও কথা আছে। শহর কলকাতার এইসব পথিকৃৎদের উত্তর-পুরুষরা এখনও আছেন। তাঁদের কাছে স্বভাবতঃই এমন কিছু তথ্য থাকতে পারে যা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তাঁরা যদি এ' বিষয়ে অগ্রণী হ'ন, সংস্করণান্তরে সেগুলি বিচার করে সন্নিবেশিত করা সম্ভব হবে। তবে জন কোম্পানীর বাঙালী কর্মচারীদের উত্তরপুরুষদের কাছে নিবেদন: তাঁদের পূর্বপুরুষরা কলকাতার আদিবাসিন্দা। তাঁদের কোনরূপ অমর্যাদা করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। ইতিহাসের নানা আবর্জনা সরিয়ে তাঁদের সত্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা, তথা বাঙালী জাতির সত্য ইতিহাস রচনা করাই আসল লক্ষ্য। তবু যদি কোনও ভাবে কোন ত্রুটি ঘটে গিয়ে থাকে—অজ্ঞতাবশতঃ বা নিতান্তই অনবধানতাবশতঃ তার জন্য লেখক আগাম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে।

বৈঁচিগ্রাম, নারায়ণ দত্ত
হুগলী

মুখবন্ধ

অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় কলকাতাকে যদি মৌচাকের সঙ্গে তুলনা করা হয়, দেখা যাবে সে মৌচাকের শ্রমিক মৌমাছিদের ভিড়ে সাহেবদের পাশাপাশি ছিল বাঙালীরা। তারাই সেই চাক বানিয়েছিল, এবং বলা নিষ্প্রয়োজন সংখ্যায় তারা ছিল অনেক। সাহেবদের চেয়ে অনেক বেশী। আজকের যে সোনার শহর কলকাতা, সেটার সবটাই সেদিন তৈরী হয়েছে জন কোম্পানীর আলাদিনের যাদুপ্রদীপের স্পর্শে নয়, বাঙালী মেহনতী মানুষের স্বেদে, শ্রমে। জন কোম্পানীর তাঁবে কাজ করে তারা এই সত্যভূমিষ্ট শহরের ধাত্রীর কাজ করেছে, তাকে লালনপালন করেছে! এই শহর রক্ষায় তারা, এই শহরের গড়ায় তারা, নানা ঝুটঝামেলার কাজে, 'পাবলিক রিলেসন্সে'র কাজেও তারা। কিসে নয়? তারা কোম্পানীর খাজনা আদায় করেছে, 'ফরেন রিলেসন্স' দেখেছে, ডিগ্ ডিগ্ করে ঢ্যাঁড়া পিটেছে, আবার শহর সাফ-সুতরা করা—তাতেও তারা।

এদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ অবশ্য যদি করতেই হয়—আগেই নাম করতে হয় উকিলদের—যাঁরা ইংরেজদের হয়ে বিভিন্ন নবাবী দরবারে কাজকর্ম করতেন। ইংরেজদের ব্যবসাপত্র যাতে ঢিলে না পড়ে, অসুবিধে না হয়, তার তদারক করতেন। এঁরা বেশ ভালো মাইনে পেতেন। কোম্পানীর কর্মচারী-কুলপঞ্জীতে এঁরা কুলীন। একেবারে নৈকষ্য। এঁরা শুধু মাইনে পেতেন না, শিরোপা পেতেন। পেতেন আর তার সঙ্গে, সামনে-পিছনে ঘোড়সওয়ার রাখবার 'এ্যালাউয়েন্স'। আবার চলেঘুরে বেড়াবার জন্যে ঘোড়াও পেতেন। তার অতিরিক্ত খরচ, সবই কোম্পানী বইত। ঢাকার উকিল ছিলেন, কলকাতার মল্লিকবাড়ির আদিপুরুষ সন্তোষ মল্লিক। সেকালের

নিরিখে ইনি 'ফ্যাট স্যালারির' লোক। তন্‌খা পঞ্চান্ন। এঁরই নামে সেকালের কলকাতায় একটা মস্ত বাজার ছিল—সুতানুটিতে সন্তোষ বাজার। এই দলে ছিলেন লক্ষণ উকিল—উকিল হিসেবে এর নামেরই সর্বপ্রথম উল্লেখ রয়েছে কোম্পানীর নথিপত্রে। রামচন্দ্র, এর পোস্টিং ছিল হুগলী, পাটনার উকিল রূপচাঁদ এবং সবচেয়ে বিখ্যাত—রাজারাম মল্লিক। এঁদের কয়েকজনের সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা পরে করা হয়েছে। এবং কলিকাতার আদি কালের ইতিহাস রচনায় এইসব ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ড অপরিহার্য।

এছাড়াও আছেন সেকালের কালা জমিদাররা। কালো কলকাতায় দণ্ডমুণ্ডের মালিক ছিলেন এঁরাই। এই দলে আছেন নন্দরাম সেন, জগতদাস, রামভদ্র চৌধুরী (?), গোবিন্দরাম মিত্র। সেকালের কলকাত্তিয়া বাঙালীদের এই সব দিকপালরা শুধু জমিদারের মত খাজনা আদায়ই করেননি, সেরেস্তায় কাজকর্মই দেখেননি—কলকাতার নতুন গড়ে ওঠা বাঙালী সমাজের পত্তন করেছেন, ঘাট বানিয়েছেন, জলাশয় স্থাপন করেছেন, মায়ের ব্রতানুষ্ঠানে উৎসব করেছেন, মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন, দোল দুর্গোৎসব করেছেন; কলকাতার বুকে বলতে কি বাঙালী সংস্কৃতির আসর বসিয়েছেন।

এ ছাড়াও আছেন বেনিয়ানরা। দালালরা। এঁদের মধ্যে আছেন দীপচাঁদ ভাল্লা, বোধকরি কোম্পানীর প্রথম দালাল। আরও আছেন জনার্দন শেঠ, বেনারসী শেঠ, বৈষ্ণবচরণ শেঠ। এঁরা সবই জন কোম্পানীর কুলীন কর্মচারী।

কিন্তু যেসব অসংখ্য ছোটখাট চাকুরেদের মেহনতে শহর কলকাতার বনিয়াদ যখন রচনা হল, তারা কারা? তাদের মনে রাখবার কোন উপায়ই আজ নেই, তবু কোম্পানীর পুরানো নথিপত্রে তাদের বৃত্তির কিছুটা পরিচয় রয়ে গেছে।

কোম্পানীর নথিপত্রে সতেরশ তিন সালের অক্টোবরে একটা

হিসেব রয়েছে কলকাতা জমিদারীর। এতে দেখা যাচ্ছে এই মাসে ২৯৬৮'৶৯ পাই খরচের মধ্যে জন কোম্পানীর ৪২০৶৩ পাই ব্যয় হয়েছিল কোম্পানীর কর্মচারীদের মাইনের খাতে। অর্থাৎ কোম্পানীর মোট খরচের শতকরা চৌদ্দভাগ ব্যয় হত কর্মচারীদের মাইনের জন্যে। ঐ বছর ঐ মাসের কলকাতার বাজার—ডিহি কলকাতা, কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের জমা খরচের একটা হিসেব পাওয়া যায়। এগুলির কর্মচারীদের জন্যে কি হারে খরচ হত তা বোঝাবার জন্যে ঐ খরচপত্রের একটা 'এ্যাবস্ট্রাক্ট' নিচে তুলে দেওয়া হল :

ডিহি কলকাতা—	জমা	৩৯২৷৷১৫	চাকুরেদের জন্য খরচ	—৭৭৸০
কলকাতা—	ঐ	২৮৫৸৵৫	ঐ	—২০/১
সুতানুটি—	ঐ	২৭৯৵১০	ঐ	—১৫৲
গোবিন্দপুর—	ঐ	২৪২৷৶৫	ঐ	—২৭৷৫
একুনে		১২০০৷১৫		১৪০/৫

বাজারের খরচের হিসেবে থেকে দেখা যাচ্ছে, কোম্পানী তখন তার চাকুরেদের জন্য 'পে বিল' দিত আয়ের প্রায় বার ভাগ। অর্থাৎ জমিদারীর তুলনায় কম। অবশ্য এর মধ্যেও কথা আছে। কলকাতা ও গোবিন্দপুরের খরচের হিসেবে কিছু আকস্মিক বা 'ইনসিডেন্টাল' খরচ রয়েছে। কলকাতার দু'জন মণ্ডলকে কোম্পানী শিরোপা দেয় যার জন্যে খরচ হয় দুই টাকা এক আনা। আর গোবিন্দপুরের বাজার খরচ থেকে এক টাকা সওয়া চার আনা দেওয়া হয় একজন সরকারী পিয়নকে। এ থেকে কোম্পানীর বেনেতী বুদ্ধির আর একটা নিদর্শন মেলে। দেখা যায়, যদিও কলকাতার জমিদারী আর কলকাতার বাজার আসলে একই কাউন্সিলের অধীনে, তবু হিসেবের খাতায় তাদের পার্থক্য সবসময় বজায় রাখা হ'ত।

সতেরশ এগার সালের মার্চ মাসের অর্থাৎ প্রায় বছর আষ্টেক পরের একটা হিসেব পাওয়া যায়। সেই সময় দেখা যাচ্ছে, কোম্পানীর আয় ২,২৪০৵৮ পাই। খরচ ৮৬৷৶৬ পাই। এর মধ্যে কর্মচারীদের মাইনে বাবদ খরচ ৭২৸০। দেখা যাচ্ছে, কোম্পানীর জমিদারীর আয় প্রায়

সমান থাকলেও কোম্পানী ব্যয়কৃচ্ছ্রতা করে মাইনের খাতে খরচ আয়ের শতকরা চৌদ্দভাগ থেকে চারভাগে কমিয়ে এনেছে। এই বক্তব্যটা আরও সুস্পষ্ট হবে, কোম্পানীর ঐ মাসের বাজারের হিসেবটা বিচার করলে। সেটা এই রকম :

ডিহি কলকাতা—	জমা—৮৭৮৶/২ পাই—	চাকুরেদের	জন্যে খরচ	—৮০।০
কলকাতা—	,, —৩৭২।/৬ ,, —	ঐ	ঐ	—২০৲
সুতানুটি—	,, —৬৩৩/৯ ,, —	ঐ	ঐ	—২৫৸০
গোবিন্দপুর—	,, —১৪৮৵/৪ ,, —	ঐ	ঐ	—১২॥০
	২০৩২।৵৯ পাই			১৩৮॥০

এ ছাড়াও এই সময়ে আরো দুটো বাজার বসেছিল তাদের হিসেবেও এইরকম—

নতুন বাজার—	জমা—২৮০৸৵০	কর্মচারীদের জন্যে খরচ	—৩॥০
সন্তোষ বাজার—	জমা—১২৩২।/৩	ঐ	—৩৸০
মোট	৩৫৪৫।৵০		১৪৫৸০

এই হিসেব থেকে দিবালোকের মত স্পষ্ট কোম্পানীর লভ্যাংশ যখন তিনগুণ বাড়তির দিকে কোম্পানীর দিশি কর্মচারীদের তন্‌খা খাতে খরচ কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র সওয়া তিন ভাগ প্রায়। কোম্পানীর আমলের সেই গোড়ার দিকের কলকাতায় অন্ততঃ 'পারকিনসন ল' চলেনি—এই হিসেবই তার প্রমাণ এবং কলকাতার সেই আদ্যিকালেই কালাধলা কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতির মারাত্মক মারাত্মক যেসব অভিযোগ পাওয়া যায়—কোম্পানীর কর্তাদের এই ব্যয়কুণ্ঠ নীতি যে তাতে ইন্ধন জুগিয়েছিল, সন্দেহ নেই।

কিন্তু দিশি যে সব কর্মচারী কোম্পানীর অধীনে চাকরি করত, কি কি কাজ তাদের করতে হত? মাইনেই বা পেত কত তারা? অথচ এ কথা ভুললে চলবে না, সেই আমলের কলকাতায় তখনও কড়ির প্রচলন রয়েছে। তখন ষোলপণ কড়িতে এক কাহণ হত আর দুই কাহণ কড়িতে হত এক টাকা। কাজেই আজকের নিরিখে এদের

মাইনে অনেক কম বলে মনে হলেও সেটা ঠিক নয়। সেকালের কোম্পানীর হিসেবের খাতায় ছোটখাট চাকুরের ফিরিস্তি এবং তাদের মাইনেও পাশাপাশি জমাখরচ হয়েছে—কোতোয়াল—৪৸৹ চারজন রাইটার—১৮৷৹ পনেরজন পিয়ন—৩৲৸৴ দশজন পাইক—১৫৷৹ চারজন খাজনা আদায়কারী তহশিলদার—৬৷৹ একজন ঢুলি ও শিঙাবাদক (Drummer and Piper)—১৸৹ এবং হালালখোর—৸৹। এঁরা ছাড়া রয়েছেন কোতয়াল বা পুলিস অফিসার এবং রাইটার—এঁরা কিন্তু কোম্পানীর দিশি কর্মচারী নন, ফোর্ট উইলিয়মের খাস বিলাতী কর্মচারী। এই কোতোয়াল চারিটি গ্রামের শান্তিরক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। আর এই রাইটাররা কলকাতায় মুখ্যত কোম্পানীর যে সব ফ্যাক্টরী বা মালগুদাম ছিল তার গুদামবাবু, ওজনবাবু বা স্টোর ক্লার্কের বা জমিদারের কাছারীতে কাজ করত। দিশি কর্মচারীদের মধ্যে ছিল পনেরো জন পিয়ন। প্রত্যেকের মাইনে ছিল দু'টাকার মত করে। দশজন পাইক—এদের সঙ্গে সড়কি বল্লম থাকত। কোম্পানীর জমিদারীর এরা সশস্ত্র রক্ষী বলা যায়। কোম্পানীর টাকা খেয়ে জয়রাম কলু যখন বরানগরে রামভদ্রের জমিদারীতে আশ্রয় নেয় তখন এদেরই প্রথমে পাঠানো হয়েছিল তাকে বেঁধে আনার জন্যে। চারজন তহশিলদার। মাইনে পেত প্রত্যেক ১৲৸৹ করে। এরা কোম্পানীর জমিদারিতে প্রজাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাজনা আদায় করে আনত। একজন ঢুলি আর একজন শিঙাবাদক—মাইনে ৸৶৹ আনা করে। হালালখোররাই সবচেয়ে মাইনে কম পেত—মাস প্রতি পৌণে একটাকা। কিন্তু এরা কি কাজ করত? কলকাতায় বিভিন্ন ঐতিহাসিক এদের পরিচয় দিতে গিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়েছেন। উইলসন সাহেব তাঁর 'আর্লি অ্যানালস অফ দি ইংলিশ ইন বেঙ্গল' গ্রন্থেও এঁদের পরিচয় ঠিক করে দেন নি। কেবল নির্ঘণ্ট বা ইনডেক্সিং-এর সময় পাশে 'সুইপার' শব্দটি লিখে দেন। গ্লাসগোর ম্যাথিসন সাহেব 'ইংল্যাণ্ড টু ডেল্হি' বই-এ হালালখোরদের

সম্বন্ধে যা লেখেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে এঁরা হচ্ছে আদি কলকাতার ডোম। সাহেব লিখছেন :

It would appear that the meanest of all occupations is that of the city dustmen (in Bombay called Halalcores ; and in Calcutta Dhomes), a degraded order of Hindoos, whose very shadow is shunned by the Brahminical class, and with whom all ordinary mortals in the community disdain to eat or associate.

এই বই-এ হালালখোরদের একটা ছবিও আছে।

সেকালের কোম্পানীর হিসেব পত্রে আরও কতকগুলি পদে দিশি কর্মচারীদের বহাল করতে দেখা যায়। এদের মধ্যে পদাধিকারবলে প্রথম হচ্ছেন শিকদার—বা রাজস্ব আধিকারিক। কলকাতা গোবিন্দপুর ও সুতানুটি—এই তিনটি গ্রামে তিনজন শিকদার থাকত। এঁদেরই উত্তরপুরুষ কি বিখ্যাত রাধানাথ শিকদারের পূর্বপুরুষরা ? জোড়াসাঁকোর শিকদারপাড়ায় এঁদেরই ছিল কি গোষ্ঠিগত বসতি ? এঁরা কিন্তু ছিলেন সেকালের বেশ জবরদস্ত নেটিভ অফিসিয়াল এবং পরে পরে খানিকটা শান্তিরক্ষার কাজও এঁদের বর্তেছিল বলে যানা যায়। কলকাতার চাকুরেদের তালিকায় রয়েছে—শিকদার, তিনজন মণ্ডল, একজন পাটোয়ারী আর পাঁচজন পিয়ন। সুতানুটির জন্য একজন পাটোয়ারী, একজন শিকদার আর পাঁচজন পিয়ন। গোবিন্দপুরে একজন শিকদার, একজন পাটোয়ারী, একজন উকিল, দু'জন রাইটার আর আটজন কাহার বা গোয়ালা। মজার কথা হচ্ছে, গ্রামভেদে সেকালের কোম্পানীর রাজত্বে মাইনের তফাৎ হত। কলকাতা বা গোবিন্দপুরের রাজস্ব আধিকারিকের মাইনে যখন চার টাকা সুতানুটিতে তখন তিন টাকা। কলকাতা গোরাপ্রধান অঞ্চল বলে যদি তার শিকদারদের মাইনে বেশী হয়, গোবিন্দপুরের সে কৌলিন্য কোথা ? যদি বলা হয় আমানতের বেশি কমের ওপরে শিকদারের মাইনের তারতম্য

হত তাহলে ও হিসেব মেলে কই? কেননা, কলকাতার আর গোবিন্দপুরের আদায়ের পরিমাণ যখন যথাক্রমে ২৮৫৸৶: পাই এবং ২৪২৷৵৩ পাই, সুতানুটির আমানত তখন ২৭৯৷৶৬ পাই। তবে একটা ব্যাপার আছে। কলকাতার গ্রামের জমি বাড়ির খাজনা শতকরা দশভাগ বাটাসহ যখন ৩২৪৷৴৬ পাই, গোবিন্দপুরের ১৭৬ টাকা সুতানুটির মাত্র ১৪৭৷৴৯ পাই। মোট খাজনাই কি শিকদারের মাইনে ঠিক করার মাপকাঠি ছিল? বলা শক্ত। তবে এদের সম্বন্ধে আলোচনায় সবচেয়ে বিস্ময়কর দিকটা হচ্ছে কোম্পানীর কলকাতার একেবারে উষালগ্নে বাঙালীপট্টির দণ্ডমুণ্ডের মালিক কালা জমিদার—নন্দরাম সেনের মাইনে ছিল ছ'টাকা। আর শিকদারদের মাইনে তিন-চার টাকা অর্থাৎ রাইটারদের সমান। এমনকি কাজ করতেন তাঁরা? তাঁদের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে কোম্পানীর নথিপত্রে কোথাও বিশেষভাবে উল্লেখ নেই কেন? নেই এমনকি তাঁদের ছ'জনের কেষ্ট বিষ্টুর সম্বন্ধেও সামান্যতম সংবাদ। ব্যাপারটা বিস্ময়কর বই কি!

এর চেয়ে পাটোয়ারীরা অনেক কীর্তিমান। এঁদের বেলায়ও গ্রামভেদে মাইনের কম বেশী হত। সুতানুটি আর কলকাতার পাটোয়ারী যখন ছ'টাকা করে পেতেন—গোবিন্দপুরে পেতেন দেড় টাকা। এঁরা খাজনা আদায় করতেন। এবং হিসেবপত্র রাখতেন। বলা বাহুল্য, পাটোয়ারীরা হতেন স্থানীয় ব্যক্তি। এবং খুব সম্ভব কলকাতায় প্রজাদের দেয় পাট্টা এঁরাই তৈরী করতেন।

সতেরশ' সাত সালের জুন মাসে এইসব পাটোয়ারীদের হঠাৎ মাইনে বেড়ে যায়। ছ'টাকার জায়গায় চার টাকা। এবং এদের কাজও বেড়ে যায়। এর কারণ, এই সময় কোম্পানী তার কলকাতার জমিদারীর প্রথম মাপজরিপ শেষ করে। এবং এর ফলে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করে: 'the Company was being cheated, many persons not paying for half the ground they possesed. The Council also discovered that the black rent coll-

ectors had been making false returns and farming out lands for their own advantage.' এই আবিষ্কারের ফলে কোম্পানী পুরনো পাটোয়ারীদের সরিয়ে দিয়ে তাদের জায়গায় নতুন লোক নেয় এবং দুর্নীতি দূরীকরণের জন্যে মাইনে বাড়িয়ে দেয়। এবং কিস্তিতে কিস্তিতে নয়, সালিয়ানা খাজনা এক থোকে আদায় করতে পারলে 'কমিশন' দেবার রেওয়াজ করে। রামনাথ পাটোয়ারীর গল্পে এসব নিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা হবে।

কোম্পানী যে শহর পত্তনের সময়ে গ্রাম্য মুখিয়া বা মণ্ডলদের মাইনে দিয়ে রাখত তার কারণ বোধ হয় এরা স্থানীয় মনোভাব রীত-করণ বুঝতে কোম্পানীর কর্তাদের সাহায্য করত। কোম্পানী যে তাদের খুবই সম্মান করত তার প্রমাণ তাদের নিয়োগের সময়ে তাদের শিরোপা কিনে দিতে হত। একমাত্র দালালদের কোম্পানী এই সম্মান দেখাত।

কোম্পানীর দিশি কর্মচারীদের জমিদাররা ছাড়া আরও যারা খুবই খাতির পেত তারা উকিল (vakil) সে কথা গোড়াতেই বলা হয়েছে। এঁরা কোম্পানীর 'এ্যামবাসাডর' বা দূত হিসেবে কাজ করতেন নবাব বা সুবেদারদের দরবারে। এঁদের মাইনে হত মোটা। গোবিন্দপুরের যে উকিলের কথা পাওয়া যাচ্ছে তার মাইনে কিন্তু মাত্র পাঁচ টাকা। অস্বাভাবিক রকম কম। কেননা, সতের শ' চার সালের তেইশে মার্চের নথিপত্রে রয়েছে, ঐদিন হুগলীর রামচন্দ্র বলে একজনকে মুর্শিদ-কুলি খাঁর দরবারে ইংরেজদের উকিল হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তাঁর মাস মাইনে কুড়ি টাকা। ঘোড়ার জন্য তিনি অতিরিক্ত পেতেন পাঁচ টাকা। আর সামনে পেছনে যাবার জন্য সড়কি বল্লমধারী দুজন পেয়াদা—যাদের মাইনে গুনত কোম্পানী তার খাজাঞ্চীখানা থেকে।

দিশি কর্মচারীদের মধ্যে সবচেয়ে নীচু পংক্তিতে বসত কাহাররা। এরা সাধারনত সমাজের নীচু স্তর থেকে আসত এবং কাছারিতে চাকরের কাজ করত।

কিন্তু কলকাতার মৌচাক আস্তে আস্তে যেমন বড় হতে লাগল, জমে উঠতে লাগল মধুভাণ্ড, দেখা গেল, কোম্পানী দিন দিন বেশ কৃপণ হয়ে উঠছে। তার কাজের পরিধি বাড়ছে, কিন্তু কমছে কর্মীর সংখ্যা। বিশেষ করে যারা সাধারণ ছোটখাট চাকুরে। কোম্পানীর আয় যখন বেড়ে তিনগুণ হয়েছে, পার্কিনসন ল'কে কলা দেখিয়ে কোম্পানী তার কর্মী সংখ্যা কমিয়ে ফেলেছে। এই খাতে তার ব্যয় মোটেই বাড়েনি। এটা কি করে সম্ভব? আজকের দিন যাকে বলে 'র‍্যাশ্যান-লাইজেশন' বা যুক্তিযুক্ত প্রয়োগ, মনে হয়, কলকাতার আদিকালে কোম্পানী তার আশ্রয় নিয়েছিল। বেঞ্জামিন বাউচার ছিল কোম্পানীর কাছারির গোরা জমিদার এবং বক্সী বা তবিলদার। তখন কাজকর্ম কম। কোম্পানী তাকে বললে, বাপুহে, এইসময় হাতে ত কাজ কম, কলকাতাটা এই অবকাশে মাপজরিপ করে ফেল। মনে হয়, যাদের হাতে কাজ কম এমন কালা শ্রমিকদেরও এই কাজে নিয়োগ করে কোম্পানী এর বাবদ খরচ অনেক কমাতে পেরেছিল।

যে করেই হোক, সতেরশ' এগার সালের হিসেবে দেখা গেল, কোম্পানী তার জমিদারীর কর্মচারীর সংখ্যা কমিয়ে ফেলেছে। নীচের হিসেব থেকে সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে:

ডিহি কলকাতা

অক্টোবর, ১৭০৩		মার্চ, ১৭১১	
কোতোয়াল	— ১ জন	কোতোয়াল	— ১ জন
রাইটার	— ৪ জন	রাইটার	— ৪ জন
পিয়ন	— ১৫ জন	পিয়ন	— ২ জন
পাইক	— ১০ জন	পাইক	— ৮ জন
তহশিলদার	— ৪ জন	তহশিলদার	— ৪ জন
ঢুলি	— ১ জন	ঢুলি	— ১ জন
শিঙাবাদক	— ১ জন	বাজনদার	— ১ জন
হালালখোর	— ১ জন	হালালখোর	— ১ জন
মোট	— ৩৭ জন	মোট	— ২২ জন

কলকাতা

শিকদার	— ১ জন	শিকদার	— ১জন
মণ্ডল	— ৩ জন	মণ্ডল	— ২ জন
পাটোয়ারী	— ১ জন	পাইক	— ৬ জন
পিয়ন	— ৫ জন	পাটোয়ারী	— ২ জন
মোট	— ১০ জন	মোট	১১ জন

সুতানুটি

শিকদার	— ১ জন	শিকদার	— ১ জন
পাটোয়ারী	— ১ জন	পাটোয়ারী	— ৩ জন
পিয়ন	— ৫ জন	মণ্ডল	— ২ জন
মোট	— ৭ জন	পাইক	— ৬ জন
		পিয়ন	— ১ জন
		ঢুলি	— ১ জন
		মোট	— ১৪ জন

গোবিন্দপুর

শিকদার	— ১ জন	শিকদার	— ১ জন
পাটোয়ারী	— ১ জন	পাটোয়ারী	— ১ জন
উকিল	— ১ জন	পাইক	— ৪ জন
রাইটার	— ২ জন		
কাহার	— ৮ জন		
মোট	১৩ জন	মোট	— ৬ জন
সর্বসমেত	— ৬৭ জন	সর্বসমেত	— ৫৩ জন

প্রসঙ্গত বলা দরকার, গোবিন্দপুরের যে উকিল, রাইটার, বা কাহারদের দেখান হয়েছে তাঁরা কিন্তু শুধু গোবিন্দপুরের জন্যে নিযুক্ত ছিলেন না। যদিও হিসেবের খাতিরে তাই দেখান হয়েছে কিন্তু তিনটি জায়গার জন্যেই তাঁদের রাখা হয়েছিল।

সে যাই হোক, এই হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে, কোম্পানী কি নিখুঁত

ভাবেই না তাঁদের কর্মচারীদের সংখ্যা প্রয়োজনভিত্তিতে বাড়িয়েছে বা কমিয়েছে। এই খাতাপত্র থেকে কলকাতার টৌন বা বাজারের উত্থান পতনের ছবিটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেখা যাচ্ছে, আট বছরের মধ্যে ডিহি কলকাতার কাজকর্মে ঝামেলা অনেক কমেছে। ইংরেজ শাসন, তার ব্যবসার মতই যে ধীরে ধীরে শিকড় গেড়ে বসেছে, পিয়নের সংখ্যা পনের থেকে দুই এবং পাইকের সংখ্যা দশ থেকে আট করার মধ্যে সেই সত্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। অপর পক্ষে টৌন কলকাতার পাটোয়ারী একটার জায়গায় হচ্ছে দুটো, অথচ গ্রাম্য মণ্ডলের পোষ্ট তখন তিনজনের জায়গায় একজন। অর্থাৎ, স্থানীয় রহিস ব্যক্তিদের প্রয়োজন, গ্রাম্যজীবনে তাদের প্রভাব কমের দিকে, জন কোম্পানী নিজের শক্তিতেই নিজের প্রতিষ্ঠা খুঁজেছে এবং কিছুটা লাভও করছে। এইখানেও পিয়ন-পাইকের দলে ভাঙন ধরেছে।

সুতানটির কাপড়ের ব্যবসা যে ফলাও হচ্ছে, এই কর্মচারীর সংখ্যা ডবল হওয়াই তার পরোক্ষ প্রমাণ। যেখানে পাটোয়ারী একজন ছিল, সেখানে হল তিনজন। ভাবী বড়বাজার জমতে আরম্ভ করেছে। তার বাজারে বৃহৎ ব্যবসায়ীদের মধুপগুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। লোকসংখ্যা বাড়ছে। আর তাই বাড়ছে পাট্টা দেবার লোক। খাজনা নেবার লোক। বাজারে ঘন ঘন ঢোল সহরৎ দরকার হচ্ছে। তাই ঢুলি আসছে তার ঢোল নিয়ে। ডিগ্ ডিগ্ করে ঢোলের কাঠি পড়েই চলেছে। পড়েই চলেছে। এই সুতানুটিতে তখন একটা আধটা নয়, ন'টা বাজার। চালের বাজার, নুনের বাজার জমজমাট। চাল চালানোর শুল্কই শুধু আদায় হচ্ছে—১৯৮০। এদিকে গোবিন্দপুর কেমন যেন নিবু নিবু। আগে তার পাইক লাগত না, এখন লাগছে। পাটোয়ারী সেই একজন!

এই আট বছরের বিবর্তনে কিন্তু শুধু প্রয়োজনভিত্তিক নিয়োগ-ছাঁটাই করেনি কোম্পানী, কর্মচারীদের মাইনে-পত্র কম বেশী করেছিল। শিকদারের মাইনে বেড়ে চার টাকার জায়গায় হয়েছিল

পাঁচ। মণ্ডলদের তিনজনের মাইনে ছিল দুটাকা। এখন টাকা-টাকা। পাইকদের মাইনে কমে দু'টাকা থেকে দেড়টাকা দাঁড়িয়েছে। ঢুলিদের হয়েছে বার আনা। পিয়নদের মাইনে কিন্তু যে কে সেই।

কিন্তু ছোট খাটই হোক আর বড়সড়ই হোক, কর্মচারীদের কথা বলতে গেলে, ছাঁটাই 'রিট্রেঞ্চমেন্টের' কথা এসেই পড়ে। কোম্পানীর শহর কলকাতায় কলির সন্ধে নামতে না নামতেই ছাঁটাই সুরু হয়েছিল। প্রথম ছাঁটাই হয় রাজনৈতিক ডামাডোলে। সতেরশ' চার সাল নাগাদ যখন নতুন আর পুরনো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী—আমে দুধে মিশে গেল, দেখা গেল দিশি কর্মচারীদের আঁটি খোলা সব বাদ। একেবারে ঝাড়েমূলে উচ্ছেদ! সেই হুকুমৎটা ছিল—'Ordered that all the black servants that look after the Company's factories and dead stock in the country be dismissed and Paid off till the Ist of February.' বলাবাহুল্য এদের মধ্যে কলিকাতা জমিদারীর কর্মীরা পড়েননি। যাঁদের ওপর ছাঁটাই-এর কোপ পড়েছিল, তাঁরা কোম্পানীর বৃহৎ যজ্ঞের ঋত্বিক-পুরোহিত। তাঁরা কোম্পানীর ফ্যাক্টরীতে থাকতেন, গুদামে কাজ করতেন। অবশ্য জয়েন্ট কোম্পানী থিতু হয়ে বসলে, পরের এক হুকুমে তাঁদের পুনর্বহাল করার নির্দেশ দেওয়া হয়। খুবই বাঁচোয়া। নয়তো বেশ কিছু গরীব বাঙালীর ভাত মারা গিয়েছিল আর কি।

কলকাতায় সত্যি করে বড়সড় ছাঁটাই-এর কথা জন কোম্পানী চিন্তা করে সতের শ' এগার সালের এপ্রিল মাসে। এই সময়ে এক সঙ্গে বহু লোকের চাকরী গিয়েছিল। এবং তার ফলে কোম্পানীর বেঁচেছিল বার শ' টাকা প্রতিমাসে। সেই আদেশটা হুবহু এই রকম :Agreed turn away several Peons Gwallas—Bannians and Gardiners Dandys and Cooleys also saves 1,200 rupees per month now therefore

ordered the Buxie discharge the same according to List now delivered him.

অবশ্য শাস্ত্র বলেছেন মধুরেণ সমাপয়েৎ। কাজেই ছাঁটাই-এর কথা বলে জন কোম্পানীর কলকাতার গোড়ার যুগে দিশি চাকুরের মুখবন্ধ শেষ করা ঠিক হবে না। সেকালের কলকাতায় মাঝে মাঝে প্রয়োজনবোধে হঠাৎ বেশি সংখ্যায় টেম্পরারি—সাময়িক লোকজন নেবার গল্পও রয়েছে। সতের শ' ছ' সালের ডিসেম্বর। সেই কনকনে শীতে কলকাতার দিশি ডাকাতরা চড়াও হয়ে অনেক কয়জন গৃহস্থের বাড়ীতে ডাকাতি করল। বেশ কয়েকজন মারা গেল। সামান্য কয়জন কালা পাইক বাধা দিতে গিয়ে চোট খেল। কোম্পানীর টনক নড়ল। কোম্পানী একত্রিশজন দিশি পাইক নিয়োগ করলে। কোম্পানীর কনসালটেশন বইয়ে লেখা হল—···'thought necessary to keep greater guard on the towns for the Company's tenants' safety, wherefore the Jeminder is ordered to entertain 31 pikes, or black peons, for the present, to prevent like mischief in the future.'

মোটামুটি এটাই হল আন্তিকালের শহর কলকাতার দিশি কর্মচারীদের কাহিনীর মুখবন্ধ। উঠন্তি মূলো পত্তনেই চেনা যায়। এর পরে আদি কলকাতা অনেক বেড়েছে। এমন বেড়েছে যে চেনাই যায় না। বেড়েছে তার আমলার সংখ্যা। তবে তার ধারা মোটামুটি একই রকম। কালে কালে অনেক বঙ্গতনয় কোম্পানীর নানা কারবারে চাকরীতে ঢুকেছে। কোম্পানীর পে-অফিসে তখন গণেশরামেরা দু'হাতে উপরি কামাচ্ছে। কাপড়ের গুদামে কাপড় মাপতে মাপতে বাঙালী সন্তান আখের গোছাচ্ছে। তখন কলকাতা সবেমাত্র কুঁড়ি। কি তারও আগে সবুজ পাতার বুকে সদ্য জন্ম নিয়েছে। ফুল হয়ে ফুটতে তার অনেক দেরী। তার মৌচাক বসতে সুরু করেছে। আরও বাড়বে। আরও বাড়বে। কত না মৌমাছির ভিড় বাড়বে। আরও অনেক মানুষ

আসছে। আসবে। নতুন নতুন কাজ নিয়ে। বৃত্তি নিয়ে। তার কত বৈচিত্র্য। কত বাহার।

* * *

এবং এমনি চিত্তাকর্ষক সেকালের জন কোম্পানীর বড় বড় বাঙালী কর্মচারীদের বিচিত্র, বিস্তৃত চাকুরে জীবন, জীবন-চর্যা,—যাঁদের মধ্যে অষ্টাদশ শতকের নতুন বাঙালীর জন্ম হচ্ছে। অভ্যুদয় হচ্ছে। এঁদেরই এক পথিকৃৎ কালা জমিদার নন্দরাম সেন। তাঁর গল্প দিয়েই আরম্ভ করা যাক।

কালা জমিদার

নন্দরাম সেন

সাত সকালে শহর কলকাতায় ডিগ্‌ডিগ্‌ করে ঢ্যাঁড়া পড়তে লাগল। কোম্পানীর মাইনে করা খাস ঢুলি পিঠে জয়ঢাক ঝুলিয়ে ঢোল সহরৎ করে গেল কলকাতার হাটে হাটে। সন্তোষ বাজার, নতুন বাজারে বাজার করতে এসে ছেলে বুড়ো সবাই শুনল কোম্পানী বাহাদুরের নতুন আদেশ : নন্দরাম সেনের নগদ টাকা, স্থাবর অস্থাবর কোন সম্পত্তি যদি কারও কাছে থেকে থাকে, কোম্পানীকে না জানিয়ে তিনি বা তাঁরা যেন কদাপি সেগুলি নন্দরাম বা তাঁর আত্মীয় স্বজনকে প্রত্যার্পণ না করেন। যতদিন পর্যন্ত না কোম্পানী তাদের শহর কলকাতার জমিদারীর খাতাপত্র 'চেক' করে সেনমশায় কি পরিমাণ টাকা তছরূপ করেছেন—তার একটা হালহদ্দ ঠিক করে উঠতে পারেন, ততদিন যেন নগরবাসীরা নন্দরাম সেনের জিনিসপত্র টাকাকড়ি সব আটকে রাখেন···ডিগ্‌···ডিগ্‌···ডিগ্‌। এটা সতের শ' নয় সালের কথা। মে মাসের কাঠফাটা রোদ্দুরে কলকাতার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। গঙ্গার বিস্তৃত বেলাভূমিতে আগুনের হল্‌কা উঠছে। হাঁটু পর্যন্ত ধুলোর রাস্তা তেমনি আগুনের মত তেতে উঠেছে। সদ্য আগত সাহেব মেমেরা ঝাঁপ ফেলে ঘরে ঘরে 'ত্রাহি ত্রাহি' রব ডাকছে। বড় বড় টানা পাখার হাওয়াও তাদের যাতনা কমাতে পারছে না। কাজ-কর্ম করবে কোত্থেকে? কিন্তু মাথায় ভিজে গামছার বিড়ে বেঁধে বাঙালী ঢুলি ঠিক ঢোল সহরৎ করে যাচ্ছে।

এখন অবশ্যই বলে দিতে হবে কে এই বঙ্গতনয় নন্দরাম সেন। কিন্তু সেকালের কালা কলকাতায় কাউকেই সেটা বলবার প্রয়োজন

অনুভব করেননি কোম্পানীর কলকাতা কাউন্সিল। সেকালের হাটখোলা অঞ্চলের তিনি এক বিশিষ্ট বাঙালী। আড়াইশ' বছরের অনাদরের ধূলো সরিয়ে আজ নন্দরামের নামের জীর্ণ কঙ্কালটাই কোনক্রমে তুলে আনা যায় বিস্মৃতির কবরখানা থেকে। সেনমশায় মৌলিক কায়স্থ এবং কলকাতার জন কোম্পানীর সরকারী কাছারিতে তিনিই বোধকরি প্রথম বড় কালা অফিসার।

কিন্তু আগের কথাটা আগে বলে নেওয়া ভাল। সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে তেরশ টাকায় কিনে ইংরেজরা লাট গোবিন্দপুর সুতানুটি কলকাতা আর ডিহি কলকাতার জমিদার হয়ে বসল। কলকাতায় আসা ইংরেজদের অনেকেরই মধ্যে বিলাতী ব্যারণদের রক্ত ঘুমিয়েছিল। তারা ভাবলে, জমিদারী—মন্দ কি ? কিন্তু আর একটা দিকও ছিল। এই জমিদারীর জন্যে হুগলীর কোষাখানায় বছরে মালগুজারি জমা দিতে হয় আন্দাজ পনের শ' টাকা। সে টাকা যাতে কোম্পানীর তহবিল থেকে না যায় সেটা ত দেখা দরকার। কেননা লণ্ডনের জন কোম্পানী ব্যবসা বোঝে। অন্য কিছু বুঝতে চায় না। জমিদারী করতে গিয়ে যদি কোম্পানীর ট্যাঁক থেকে কড়ি লাগে তাহলে কি আর তারা আস্ত রাখবে নাকি কলকাতার কাউন্সিলকে ? কাজেই মাছের তেলে মাছ ভাজবার জন্যে জমিদারী থেকে ঠিকমত রাজস্ব আদায়ের সাধু উদ্দেশ্যে কলকাতা কাউন্সিল তাদেরই কনিষ্ঠতম সভ্যকে কলকাতার জমিদার করে দিলে।

সপ্তদশ শতাব্দী শেষ হয়ে ঠিক অষ্টাদশ শতক সুরু হল। সতের শ' সাল। কলকাতার প্রথম জমিদার তাঁর কাছারিতে বসলেন। আজকের লালবাজারের আশেপাশে কোথাও ছিল তাঁর এজলাস! দুর্লভ সম্মানের অধিকারী এই ঐতিহাসিক ব্যক্তি—রালফ্ শ্যেলডন। কিন্তু পাইক পেয়াদা নগদী গোমস্তা কই ? প্রজারা সব দেশী। তাদের কথাবার্তা বুঝে যথাবিহিত সব করে কে ? কাজেই করিৎকর্মা একজন দেশী লোক খোঁজ। শ্যেলডন খুঁজে বের করলেন নন্দরাম সেনকে।

বহালতবিয়েতে জন কোম্পানীতে মাত্র কয়েক বছর কাজ করে নন্দরাম অচিরেই দশজনের একজন হয়ে উঠলেন। দিব্যি তোফা চাকরী। তখন কালা জমিদার মানে কালা কলকাতার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। দেশী লোকের মরণ কাঠি—জীয়ন কাঠি। তাছাড়া নন্দরামের হাতে সেকালের রেওয়াজে বহু লোকহিতকর কাজও হয়েছিল। তার একটা ফায়র্ফর্দ্দ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে তাঁর জীবনীকাব্যে। সেগুলি ছাড়াও কলকাতাবাসীদের গঙ্গাস্নানের জন্য আহেরীটোলা ঘাটের আরও নীচে রথতলার ঘাট বলে একটা স্নানের ঘাট স্থাপন করে গিয়েছিলেন। সে পাকা ঘাট আজ গঙ্গার গর্ভে। বিস্মৃতির কোলে। কেবল উড সাহেবের আঁকা সেকালের ম্যাপে তার ঠাঁই রয়ে গেছে। আজ কলকাতায় তাঁর স্মৃতিরক্ষা করছে তাঁর কীর্তিবহ শিবালয় ও তাঁর নামে শোভাবাজারের একটা গলি। কর্পোরেশনের আঁটা স্ট্রীটফলকটি হয়ত বা কোন কৌতূহলী শহরবাসীর মনে উত্তুরে ক্ষ্যাপা বাতাসের মত আচমকা নানা প্রশ্নসমাকীর্ণ কোন বিচিত্র স্মৃতি জাগিয়ে তুলতে পারে!

কিন্তু অত সহজে নন্দরাম সেনকে ভুলে যাওয়া বোধ করি শহর কলকাতার ঠিক হবে না। আমরা যখন ভারতীয় সিবিলিয়ানদের নাম মুখস্থ করি, প্রথম বাঙালী রথারথীর কথা বলি, স্মরণ করি সশ্রদ্ধচিত্তে, তখন নন্দরামকে ভুলি কোন অজুহাতে? এবং কলকাতার প্রথম কালা জমিদার হিসাবে তিনি যে কোম্পানীর যথেষ্ট আস্থাভাজন হয়েছিলেন, তার প্রমাণ আছে। বছর চারেক বাদে শ্যেলডনের যখন প্রমোশন হ'ল, বেঞ্জামিন বাউচারকে রাজ-পাট বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন তিনি, নন্দরামকেও দিয়ে গেলেন বাউচারের হাতে। এবং ব্যাপারটা প্রণিধানযোগ্য যে অধস্তন কর্মচারীদের চুরি-জুয়াচ্চুরিতে তিতিবিরক্ত হয়ে বাউচার যখন কলকাতা কলেকটরীর খোল-নলচে সব পাল্টে ফেলে কাউন্সিলের—বিশেষ করে শ্যেলডেনের, কোপে পড়লেন তখন সতের শ' পাঁচ সালের ছাব্বিশে

জুলাই কাউন্সিলের সম্যক উপলব্ধির জন্য আনুপূর্বিক ঘটনার বিবরণ দিয়ে বাউচার যে চিঠি লেখেন কাউন্সিলকে, তাতেও নন্দরাম সেন সম্বন্ধে সরাসরি কোন 'করাপসনের চার্জ' আনেননি তিনি।

বরঞ্চ এই ডামাডোলে নন্দরামের এক অবিশ্বাস্য সততার কাহিনীই লিপিবদ্ধ রয়েছে। ব্যাপারটা হয়েছিল অনেকটা এইরকম। কাউন্সিলকে বিশেষ করে প্রাক্তন জমিদার শ্যেলডনকে জিজ্ঞাসাবাদ না করে এক সঙ্গে কমসে কম ছয়জনের চাকরী খেয়ে দিলেন বাউচার। তাতে শ্যেলডন গেলেন ক্ষেপে। তাঁর মানে ঘা লেগেছিল, বুঝি বা স্বার্থেও। তিনি কলকাতা কাউন্সিলের হয়ে সরাসরি অভিযোগ করলেন— কোম্পানীর কাজে এত সব গণ্ডগোল, যার জন্যে এত সব বরখাস্ত, তবে কারণ আসলে বাউচারের অকর্মণ্যতা ও অপদার্থতা। বাউচারও কাউন্সিলের মেম্বর। হোক না কনিষ্ঠতম। রুখে দাঁড়ালেন। তখন নিজের অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য শ্যেলডন একটা ঘটনা ফাঁস করে দেন। বলেন, দেখ বাপু, শুধু গদীয়ান হয়ে ঘুমোও তাই তোমার লোকলস্কর যাদের তুমি তাড়িয়ে দিয়েছ তারা গত অল্প কয়েকদিনের মধ্যে কমসে কম কোম্পানীকে হাজার তিনেক টাকা ফাঁকি দিয়েছে। বাউচার প্রতিবাদ করে বললেন, এই রকম অমূলক অভিযোগের অর্থ কি? এর কি কোন প্রমাণ আছে?

শ্যেলডন টেবিল চাপড়ে বললেন, আলবৎ আছে। আর তার প্রমাণ নন্দরাম। কলকাতার প্রথম জমিদার কিরে কেটে ভগবানের নাম নিয়ে কাউন্সিলকে জানালেন—নন্দরাম তাঁর কাছে শ' দুই টাকার থলি জমা রেখে গেছে। সেটা কোম্পানীর সম্প্রতি তছরূপের টাকার তার হিস্যা। শেয়ার মাত্র।

যতদূর মনে হয়, এটা একটা আস্ত যোগসাজস কাহিনী। শ্যেলডনই নন্দরামকে দিয়ে ব্যাপারটা গড়েপিঠে তৈরী করেছিলেন বাউচারকে হেনস্থা করার জন্যে। নয়তো, নন্দরাম এতটা ধোয়া তুলসী হতে গেলেন কেন? মাসে দু'টাকা মাইনের চাকরীতে ঢুকে নন্দরাম অচিরে

যে বিপুল ধন-সম্পত্তির অধিকারী হ'ন তাতে, এ' ধরনের গল্প যেন খাপ খায় না। সে যাই হোক, শ্লেলডন যাই বলুন, বাউচার তাঁর কোন কথাই শোনেননি এবং পুরনো কর্মচারীদের ঝাড়ে বংশে উচ্ছেদ করে তিনি জগৎ দাস নামে এক ব্যক্তিকে কলকাতার ব্ল্যাক জমিদার পদে নিয়োগ করেন তাঁরই বেনিয়ান হিসেবে। তবে দুঃখের কথা জগৎ দাসও জন কোম্পানীতে বেশিদিন চাকরী রাখতে পারেননি এবং বিস্ময়ের কথা, তাঁর খালি জায়গায় মাঝে মাঝে চাকরী করেছে আর কেউ নয়—সেই অসাধু সন্দেহে অপসৃত নন্দরাম সেন!

হ্যাঁ, মনে হয় কলকাতা কাউন্সিলের জবরদস্ত সভ্য রালফ্ শ্লেলডনের কল্যাণে নন্দরাম সেন মাঝে মাঝে বেশ কিছুকাল 'একটিনি' করেছিলেন। অবশ্য ঠিক কতদিন সে কথা জানা যায় না। কেন না, জগৎ দাসের শেষ বেশ চাকরী যাওয়ার পর আর এক বাঙালীকে ঐ পদে বসান হয়। তিনি রামভদ্র। তারপর একজন ফিরিঙ্গীকে বহাল করা হয়। কিন্তু ফল যে ভালো হয়নি, তার প্রমাণ গোবিন্দরামের চাকরী। সে সব কাহিনী পরে প্রকাশ্য। তবে শেষের দিকের চাকরীই নন্দরামের কাল হয়। কেন না, এই সময়েই তাঁর বিরুদ্ধে কোম্পানীর টাকাকড়ি তছরূপের অভিযোগ আসে। অবশ্য সেটা ঠিক তাঁর 'পেট্রন' রালফ শ্লেলডনের মৃত্যুর পরই।

ব্যাপারটা ঘটেছিল এই! কলকাতার আবহাওয়ায় শ্লেলডন দিন দিন বেশ কাহিল হয়ে পড়ছিলেন। ওষুধে ডাক্তারে দেহ জরজর। এমন সময় বললে সবাই, হাওয়া বদল কর। তখন কলকাতায় সাহেব ডাক্তার এসে গেছে। মোটামুটি একটা চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে। বিশেষ করে সাহেবদের! ডাক্তাররা সব রকম চেষ্টাচরিত্তির করে বললেন, হ্যাঁ, আপনি একটু হাওয়া বদল করেই আসুন। সাহেবদের হাওয়া বদল সেকালে শিমুলতলা-গিরিডি-মধুপুরে নয়। গঙ্গায় বজরা ভাসিয়ে ব্যারাকপুর-হুগলী-কাশিমবাজার ঘুরে আসা। ওদিকের জলহাওয়ায় স্বাস্থ্যের স্পর্শ পেত অনেক সাহেব।

ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন। কাউন্সিল রাজী। মার্চ মাসের এক সোনার সকালে মেরী নামে এক বজরায়—অ্যাডামস তার কাপ্তেন—শ্যেলডন বেরোলেন স্বাস্থ্য উদ্ধারে। এই নৌকাবিহারে মনে হয় তাঁর সঙ্গী ছিলেন সেই পরম অনুগত পুরাতন ভৃত্য নন্দরাম সেন।

মন্দভাগ্য আর কাকে বলে, গঙ্গার অমন ফুরফুরে হাওয়ায় শ্যেলডনের স্বাস্থ্যের কোনই উন্নতি হল না। হপ্তা পাঁচ-ছয়ের মধ্যেই—এপ্রিলের ছাব্বিশে কলকাতা কাউন্সিলের কাছে খবর এল হুগলীতে কৃতী ইংরাজ কুঠিয়াল শহর কলকাতার প্রথম গোরা জমিদার রালফ্ শ্যেলডন ভগবান যীশুর শরণ নিয়েছেন। কলকাতার কবরখানায় তাঁকে সমাধিস্থ করার জন্য তাঁর নশ্বরদেহ নিয়ে আসা হল। তবে সবচেয়ে দুঃখের কথা, শ্যেলডন বেচারী মরবার আগে জানতেই পারল না ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁর কর্মদক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে কলকাতার গভর্নর করে দিয়েছিলেন!

আর শ্যেলডনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নন্দরামের মাথার ওপর থেকে ছাতা সরে গেল। কপাল ভাঙল। নন্দরাম অনাথ হয়ে পড়লেন। শুরু হল নন্দরামের যত কিছু ভাগ্যবিপর্যয়। তবে সে হেন কোনঠাসা অবস্থাতেও নন্দরাম কাউন্সিলের সঙ্গে বেশ জোর পাঞ্জা কষেছিলেন। কূটনৈতিক দাবার ছকে বেশ নিখুঁত চালই চেলেছিলেন। হেরে গেলেন সে তাঁর ভাগ্য! কূটবুদ্ধি নন্দরাম সহজেই আঁচ করতে পেরেছিলেন শ্যেলডনের অবর্তমানে কলকাতায় তাঁর জন্যে কি অশেষ দুর্ভোগই না অপেক্ষা করে আছে। তিনি হুগলীতে আশ্রয় নিলেন। সেখানকার সুবেদারকে জপালেন, খুব সম্ভব বেশ কিছু টাকাকড়ি কবলালেন। তারপর ইংরেজদের হাত থেকে তাঁকে বাঁচাবার জন্য জোর তদ্বির তদারক সুরু করলেন হুগলীর মুঘল দরবারে।

সবই করলেন নন্দরাম কিন্তু শেষরক্ষা হল না। শ্যেলডনের মৃত্যুর এক সপ্তাহও হয়নি, কোম্পানীর চিঠিতে সুবেদারকে জানান হল নন্দরাম খাজনা আদায়ের সময় কোম্পানীকে অনেক টাকা ঠকিয়েছে।

কাজেই—'হি বিইং আওয়ার সারভেন্ট, উই মে হ্যাভ স্যাটিসফ্যাকসন ফর দি অ্যাবিউজ টু দি কোম্পানী।' অর্থাৎ—লোকটা আমাদের কর্মচারী। কাজেই কোম্পানীর যে ক্ষতি করেছে তার পুরোপুরি উসুল করে নেওয়া আমাদের হক!'

নন্দরাম হুগলীর সুবেদারকে ভালই জপিয়েছিলেন। প্রথমটা নন্দরামকে ইংরেজদের হাতে তুলে দিতে রাজী হননি তিনি। তবে তখন ভাগ্যের পাশায় সর্বত্রই ইংরেজদের দান পড়েছে। সারা বাঙলা দেশটারই তখন হারের পালা। কাজেই সামান্য সেনমশায়ও যে আখেরে মাৎ হয়ে যাবেন, এ আর আশ্চর্য কি? ইংরেজদের নৌকাতেই সেন-মশায় এলেন কলকাতায় আর কলকাতায় তাঁর স্থান হ'ল হাজতে। সরকারী অ্যাকাউনটেন্ট বগডেন সাহেব হিসেবপত্র দেখতে লাগলেন। যে জেলে একদিন নিজেই খবরদারি করেছেন ব্ল্যাক জমিদার হিসেবে—সেইখানেই কয়েদী হয়ে ঢুকলেন নন্দরাম। আর তাঁর সম্পত্তি আটকে রাখার জন্যে সারা কলকাতায় ঢ্যাঁড়া পড়তে লাগল: ডিগ্…ডিগ্…ডিগ্।

প্রায় বছর দুই মেয়াদ হয় নন্দরামের। সতের শ এগারর উনিশে এপ্রিল ফোর্ট উইলিয়মে কাউন্সিলের এক সভার বিবরণীতে জানা যায় মুক্তিমূল্য হিসেবে নন্দরামকে তিন হাজার টাকার জামিন দিতে হয়। ঐ পরিমাণ টাকার জন্যেই আখেরে দায়ী হন সেনমশায়। নন্দরাম যখন হুগলীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন তখন তাঁকে ধরতে কোম্পানীর নাকি খরচ হয় দু'-শ' সাতচল্লিশ টাকা আট আনা। সে টাকাও উসুল নিয়ে ছাড়ে বেনিয়া কোম্পানী।

কলকাতার নাট্যমঞ্চে কিন্তু সতের শ' ছেষট্টি সালে আর এক নন্দরামকে দেখা যায়। কলকাতার পরবর্তী এক ব্ল্যাক জমিদার গোবিন্দরাম মিত্তিরের নাতি রাধাচরণের ফাঁসির হুকুম মকুব করার জন্যে কলকাতার তাবড় তাবড় ছিয়ানব্বই জন বাঙালী ঝেড়ে এক দরখাস্ত করেছিলেন কলকাতা কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ও গভর্নর স্পেন্সার

সাহেবের কাছে। সেকালের এই গণদরখাস্তকে সাহেবরা খুব ভয় করত। সেই গণদরখাস্তে সই ছিল এক নন্দরাম সেনের। এই ভদ্রলোকই যদি কলকাতার প্রথম ব্ল্যাক ডেপুটি নন্দরাম হন তা হলে বলতে হয় নন্দরাম খুবই অল্প বয়সে কোম্পানীর চাকরীতে বহাল হয়েছিলেন—এই বছর কুড়ির মধ্যে। এবং তিনি খুব দীর্ঘজীবীই শুধু ছিলেন না, সেই অশীতিপর বৃদ্ধের কর্মক্ষমতাও কম ছিল না! বৃদ্ধ বয়সেও গণ-দরখাস্তে সই করার মত মনের জোর বজায় ছিল তাঁর!

কিন্তু সেত অন্যকথা। আসল কথা হচ্ছে নন্দরাম সম্বন্ধে এই যে অপবাদ, এটাই কি সব? উইলসন সাহেব মাস্টারী ঢং-এ অবশ্য বলেছেন যে 'ব্ল্যাক কলেক্টর'দের অসাধুতা সংক্রামক। এবং 'ইট ইজ এ ফিচার হুইচ নিড নট একসাইট সারপ্রাইজ।' বাস্তবিক মাস মাইনে দু' টাকার লোকের যখন দু' হাজার টাকার মুনাফা কুড়াবার দায়িত্ব পড়ে, তখন লোভ সামলান শক্ত।

মাস্টার মশায় ঠিকই বলেছেন। তবে মনে হয়, সবটা বলেননি। নন্দরামের বিরুদ্ধে অভিযোগটা যখন তহবিল তছরূপের তখন সেটা হঠাৎ ফাঁস হয়ে যায় কি করে? তাহলে এতকাল কি কোন ইংরাজ বড়কর্ত্তার জ্ঞাতসারেই এই তছরূপ চলেছিল? এবং তছরূপ প্রমাণ হবার আগেই কেন কোম্পানী তাঁকে বাঁধতে গেল—এটা কোন দেশী বিচার? তার জবাব কই?

তাছাড়াও রহস্য আছে। উইলসন সাহেব আরও বলেননি, কি সেই রহস্যময় কারণ, যার জন্য রালফ্ শ্যেলডন মারা যাওয়ার তেরাত্তির পেরোতে না পেরোতে নন্দরাম সেনের নামে তহবিল তছরূপের মামলা রুজু হয়ে গেল? পাইক-পেয়াদা পাঠিয়ে জারী হয়ে গেল গ্রেপ্তারী সমন। ব্যাপারটা কাকতালীয় নাও হতে পারে। খুঁটি সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই নন্দরামের এই বিপর্যয় একালের মতই খুঁটি মাহাত্ম্য খ্যাপন করেছে। সেদিকটা আলোকপাত করলে বোধ করি সেকালের কালা জমিদারদের চরিত্র আর এতটা কালো দেখাত না!

কিন্তু এত কোর্ট-কাছারির নন্দরাম সেন। কোম্পানীর টাকা-আনা-পাই জমা খরচের খাতায় যাঁর নৈর্ব্যক্তিক বিচরণ। যাঁর একমাত্র পরিচয়ই শুধু কলকাতার জন কোম্পানীর ঝানু আমলা হিসেবে। কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে টুটা-ফুটা মানুষ নন্দরাম সেন কই? অষ্টাদশ শতকের উষালগ্নে গ্রাম-কলকাতার তখন উত্তরণ হচ্ছে শহর কলকাতায়; অজস্র ইংরেজ জাহাজের ভিড়ে ভাগীরথীর বুক চঞ্চল; তার বেলাভূমি নতুন শব্দে গন্ধে বর্ণে মাতোয়ারা এবং তাকে ঘিরেই পত্তন হতে সুরু হয়েছে আনকোরা নতুন এক বাঙালী সমাজের—এই কাহিনীতে সেই নব সমাজের অন্যতম প্রবর্তক নন্দরাম সেন কোথা? আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতি তার কোন হদিশ রাখে না। খবর রাখে না সেই সমাজের কীর্তি কাহিনীর ধারা প্রকরণ—যার মধ্যে সদ্যোজাত বাঙালী মানসিকতার বিশিষ্ট প্রবণতা গুলি আত্মপ্রকাশ করতে সুরু করেছে। তবে এই বিস্তৃত অবহেলা আর দুঃসহ শূন্যতার-মধ্যে নন্দরামের একটি জীবনীকাব্য সংগ্রহ করা গেছে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। শত বছরের পুরণো এই কাব্য তাঁরই অধঃস্তন পুরুষের রচনা। মঙ্গলকাব্যের আদলে লেখা পয়ারবদ্ধ এই চরিত কথা খণ্ডিত এবং যুক্তির নিকষ শিলায়। ইতিহাস হিসেবে, বেশিটাই মেকি। তবু নাই মামার তুলনায় কানা মামার একটা মূল্য থাকেই। তাই আসুন, সেই কাব্যের অন্তঃপুরে সন্তর্পনে পা ফেলে ঘরোয়া মানুষ নন্দরামের কিছুটা পরিচয় পেতে চেষ্টা করি।

নন্দরাম সেনের জীবনীকাব্য

তেলিনীপোতা আবিষ্কারের মত আসুন আমরা কল্পনার গরুর গাড়ী জুতে অজ এক পাড়াগাঁয়ের চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে পড়ি। এখানে ওখানে ইতিউতি কয়েকখানা চালাঘর, ক'জনই বা বাসিন্দা। তাদের মেয়েদের নাকে নথ, পায়ে মল। শান্তিপুরে ডুরে শাড়ীপরা বউ পুকুর থেকে জল আনতে গিয়ে পিছু ফিরে একবার আগন্তুক আমাদের দেখে নিয়ে তার সলজ্জ ঘোমটাটা নথের কানাত পর্যন্ত টেনে দেবে। চড়কা বা তকলিতে কাটা সুতো নিয়ে গামছা মাথায় হাটমুখো কোন মানুষ হয়ত বা থমকে কৌতূহলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে: তারপর চাকার একটানা ক্যাঁচ কোঁচ শব্দের রেশ যতক্ষণ না একেবারে মিলিয়ে যায়, ধূলোর মেঘ তুলে ছই গাড়ীর শেষ অস্পষ্ট রেখাটাও যতক্ষণ না অদৃশ্য হয়ে যায় ততক্ষণ চলতে চলতে পিছু ফিরে দেখবে, আর ভাববে, এ' কারা এল এদেশে। কিসের প্রয়োজনে ?

হাটখোলা হলে না হয় কথা ছিল, সেখানে নৌকা করে, ডিঙ্গি করে, ভাউলে-পিনিস করে লোক আসে; ভিন দেশের মানুষরা আসে—হুগলী, সাতগাঁ, ফরেসডাঙা, রাধানগর বা শালকে থেকে; আজকাল সাহেব মহাজনরা আসতে শুরু করেছে—লালমুখো গোরা। তাদের সঙ্গেও দেশি লোকেরা থাকে। তারা 'গস্ত' করে, সুতো কেনে। আবার গঙ্গার হাওয়ায় পালতুলে তাদের নৌকা খুলে দেয়।

কিন্তু গ্রামের জীবন শান্ত, নিস্তরঙ্গ। তার চারিদিকে জলা,

দু'এক টুকরো বা ধানজমি। তাতে ফসল হয়, রঙ পাল্টায়, সবুজের সমারোহ একসময় সোনা রঙ ধরে। এক কোণে বা কলাবাগান, দু' এক কাঁদি বা কলা। তাছাড়া শুধু বেত-হোগলার বন, আর বাঁশের জঙ্গল। জলার চারিদিকে শোলা আর লম্বা লম্বা পাতা ছড়ান একরকম জলজ গাছ। তাদের পাতার ডগায় হলদে হলদে ফড়িং বসে থাকে। তারা মাঝে মাঝে উড়ে কেমন বৈচিত্র্য এনে দেয়। তারপর ফের ঘুরে এসে বসে পাতার ডগায়।

এখানে রাস্তায় গ্রীষ্মের গোড়ালিডোবা ধূলো। শুকনো পুকুরের তলদেশে ফেটে চৌচির হওয়া পাঁকের স্তর। তামাটে নীল আকাশে ডাহুকের ক্লান্ত চিৎকার। বর্ষায় ব্যাঙের ঐকতান। আর বানভাসিতে গ্রাম-জলা-রাস্তা-ঘাট একাকার। একসময় সেই জল সরে যায়। পড়ে থাকে একরাশ মাছ। পচা, দুর্গন্ধ ওঠে আর মড়ক লাগে। আর সব-কালেই যা সমানভাবে থাকে, তা' ভ্যানভেনে মাছি আর অসংখ্য মশা। সাহেব-বাঙালী-দেশী-বিদেশী কাউকেই মান্য করে না। কামড়ে গায়ে চাকা চাকা দাগ ফুটিয়ে দেয়! জ্বলুনি আর থামতে চায় না। এইত গাঁ।

হ্যাঁ, গাঁয়ের নাম সুতানুটি। পাশেই কলকাতা। আর কলকাতা পেরোলেই গোবিন্দপুর—যেখানে দিনে রাতে শুধু খট্ খট্ শব্দে অনবরত চলছে শেঠ-বসাকদের দাদনী তাঁতিদের কয়েক হাজার তাঁত। কাপড় বুনছে, গামছা বুনছে, রুমাল বুনছে। অবশ্য ওই রুমাল গঙ্গা পেরিয়ে রাধানগরেরই ভালো হত। অন্ততঃ আদি কলকাতার বিলিতি আগন্তুক আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন তাই বলেছেন।

কিন্তু, যে কথা হচ্ছিল। গাঁয়ের নাম সুতানুটি। আর তারই একটু বাড়বাড়ন্ত অঞ্চল হাটখোলা। চওড়া গঙ্গায় নাচতে নাচতে দিন-রাত নৌকা যায়-আসে। আসে সেই দূর বঙ্গোপসাগর থেকে। অবাধে। পর্তুগীজ থানা পেরিয়ে। আর তাঁর লোকজন সব নামে হাটখোলায়। গ্রাম সুতানুটির সম্ভ্রান্ত অঞ্চল। এখানে নিয়মিত হাট বসে। বলতে কি, বসে সব জাতের আসর। 'কসমপলিটান মার্কেট'—

সূতোর হাট। এই সূতো ঐ দাদনী বণিক শেঠ বসাকদের তাঁতিদের হাতের। আর সেই সূতো কিনে গুদামজাত করা হয় হাটের একপাশে হোগলা পাতায় ছাওয়া জনকোম্পানীর গুদাম ঘরে। যে ক'দিন হাটে থাকবার এখানে থাকে। আর তাদের যেন ছেড়ে চলে যেতে অপেক্ষা। একটা ঘরও থাকে না। আবার হয়ত বা, বর্ষার আগের কালবৈশাখীর ঝড় আর বর্ষণে ফুল্লরার ভাঙা কুঁড়ের মতই এইসব হোগলার ঠাট উড়ে পুড়ে যায়, ভেঙে যায়। সাহেবরা এলে আবার নতুন করে সব ঠাট ফেলতে হয়।

এই তো পুরনো কলকাতা। সতের শ' কিংবা তারও কিছু আগেরকালের কলকাতা, হাটখোলা যার প্রাণকেন্দ্র—আর গ্রাম সুতানুটির চৌহদ্দি যার আরও পূবে। সেখানে এ'সব কর্মচাঞ্চল্য নেই। সন্ধ্যা হলেই শিয়াল ডাকে বা শিয়াল ডেকে সন্ধ্যা হয়। ঝিঁঝি পোকা সুর ধরে। গাছের পাতায়, আসস্যাওড়া আর কন্টিকারী বনে অজস্র জোনাকীর মেলা বসে। সেই শান্ত-স্থবির পটভূমিকায় হঠাৎ একদিন লোকজনের কলরব সুরু হয়ে গেল। শামুকের ডাঁই-এ আগুন দেওয়া হ'ল। ইটের পাঁজা সাজান হ'ল—কি ব্যাপার? না, দালান হবে। কার? না, সে এক বিচিত্রি ব্যক্তি—নন্দরাম সেনের। পুরনো কলকাতার প্রাণপুরুষ। সদ্য উদ্ধার করা নন্দরামের বংশধর জয়ন্তীচন্দ্র সেনের পয়ারে লেখা কাব্যগ্রন্থের মতে—

'প্রসিদ্ধ সকলে জ্ঞাত কলিকাতা ধাম!
শোভা বাজারের কুল সেন বংশ নাম॥
দীর্ঘ গঙ্গা নামে স্থান সেন কুলোদ্ভব।
তদপূর্ব্বের বার্তা জানা নাহিক সম্ভব॥
সূতানুটি গোবিন্দাদিপুর বলিখ্যাত।
এবে কলিকাতা যথা সে স্থান বিখ্যাত॥
ইংলণ্ডীয় অধিকার বহু পূর্ব কথা।
প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছি যথা॥'

এই দীর্ঘ গঙ্গা কি দক্ষিণ-চব্বিশপরগণার দে গঙ্গা ? সেখান থেকেই কি এই সেন বংশের আদি পুরুষ নন্দরাম এসেছিলেন কলকাতার শোভাবাজারে ? বন কেটে বসত করতে। জয়ন্তীচন্দ্র বলেছেন :

'এলেন পুরুষ মহা দীর্ঘ গঙ্গা হৈত্যে।
জঙ্গল কাটিয়া বাস এখানে করিতে ॥'

নন্দরাম আগে নাকি মুর্শিদাবাদে কাজ করতেন :

'মুর্শিদাবাদে কর্ম করিতেন তিনি।
শুনিয়াছি লোক মুখে স্থির নাহি জানি ॥

এই তথ্যটি ভুল নাও হতে পারে এবং এটি সংবাদ হিসেবে বিশেষ মূল্যবান। কেননা, মুর্শিদাবাদে রাজকার্যে অভিজ্ঞতা ছিল বলেই মনে হয় বিশেষ করে খাজনা আদায়, জমির পাট্টা ব্যবস্থা, জমি-জিরেত বন্দোবস্ত দেওয়ার কাজে জন কোম্পানীর ব্ল্যাক ডেপুটি নন্দরাম সেন প্রশংসনীয় উদ্যম দেখাতে পেরেছিলেন। জমিদার রালফ্ শ্যেলডনের এতটা আস্থাভাজন হতে পেরেছিলেন। আপাততঃ যে রহস্যের সি-আর-উইলসন সাহেবও কোন কিনারা করেননি। এই জীবনীগ্রন্থেও তাঁর কাজকর্মের মধ্যে এই বিষয়বুদ্ধিরও যথেষ্ট পরিচয় আছে। কেননা, জঙ্গল কেটে বাড়ী তৈরী করলেও নন্দরাম আগেভাগে অর্ধেক শোভাবাজারের পাট্টা আনিয়ে নিয়েছিলেন :

'প্রায় অর্ধ শোভাবাজারের দিব্যস্থান।
পট্টক করিয়া লন তিনি বুদ্ধিমান ॥'

শুধু শোভাবাজারের নয়। সেনমশায় যখন তাঁর মায়ের ব্রত পালনের জন্য এলো বারাসতে পুকুর প্রতিষ্ঠা করেন, তখনও বর্ধমানের মহারাজার কাছ থেকে এইসব জমির পাট্টা নিতে ভোলেননি। অন্ততঃ তাঁর জীবনীকার তাই বলেছেন :

'পত্র লিখিলেন তবে বর্ধমান ভূপে।
পেলেন ভূমির পাট্টা যথা বিধিরূপে ॥'

সে যাই হোক, বনজঙ্গল কেটে নন্দরাম যখন বাড়ী তৈরী করতে

এলেন শোভাবাজারে, তখন কি রকম ছিল কলকাতা? এই কাব্যের কল্যাণে আইন-ই—আকবরীর হিসেবে যে মহল কলকাতা থেকে বছরে বছরে তেইশ হাজার টাকার মত খাজনা আদায় হত সম্রাট আকবরের, সেই গঞ্জ কলকাতা নয়—এক শিয়ালডাকা কলকাতার ছবিই ওঠে ভেসে। কেননা, এখানে পুরনো কলকাতায় এক বিচিত্র ব্রতের কথা রয়েছে। এই চব্বিশ পাতার খণ্ডিত গ্রন্থটিতে বলা হয়েছে ঃ

'নিত্য সেবা স্থির হয় সকল দেবের।
শিবাবলি ব্রত হয় সন্ধ্যায় পুণ্যের॥'

শিবাবলি ব্রতটা কি? না, ঠাকুর চাকর রেখে রোজ রাঁধা হত ভাত, পায়েস, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন। শুধু তাই নয় রোজ রোজ নতুন পাত্রে হত রন্ধন। নতুন থালা বাসনে সব জামাই আদরে সাজিয়ে দেওয়া হল! খাবে কে? দাঁড়ান, দাঁড়ান। সন্ধ্যে হোক। আকাশের বুকে সূর্য তার রক্তিম রশ্মির শেষ ছোঁয়া দিয়ে করুণ চোখে বিদায় নিক; একটা, আধটা করে সারা নীল আকাশে হাজারো তারা ফুটে উঠে মেলা বসাক, দেখবেন :

'সন্ধ্যা পরে লক্ষ লক্ষ শিবা উপস্থিত।
প্রত্যেকেতে আলাহিদা খায় পরিমিত॥
সর্বরাত্রি বাটিমধ্যে থাকিত শুইয়া।
প্রাতেতে মঙ্গলধ্বনি সকলে করিয়া॥
অরণ্যে যাইত চলি দিবা আগমনে।
পুনঃ সন্ধ্যা কালে পৌঁছে খাইত সেখানে॥'

এই হচ্ছে সেই বিস্মৃত কলকাতার শিবাবলি ব্রত। এবং নন্দরাম সেন নাকি এই ব্রত পালনে এক অট্টালিকা বানিয়ে দিয়েছিলেন!

নন্দরামের আর এক পরিচয়, তিনি ভাটপাড়ার বিশ্বনাথ তর্কবাগীশ তর্কালঙ্কারের শিষ্যত্ব অর্জন করেছিলেন। জীবনীকার বলেছেন, এটাও ঐতিহাসিক ব্যাপার কেননা,

'ভাটপাড়া দেবগণে শূদ্রশিষ্য নাই।
ভক্তি দেখি বিচলিত হলেন গোঁসাই॥'

কিন্তু কে এই বিশ্বনাথ ? 'ভট্টপল্লী বাশিষ্ঠ বংশ পরিচয়-'এ এক বিশ্বনাথের কথা আছে যিনি প্রথম শূদ্রের গুরুপদ গ্রহণ করেন। ইনি এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা নারায়ন ঠাকুরের অধঃস্তন অষ্টম পুরুষ। এঁর পিতা রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ। এঁর এক প্রপিতামহ বীরেশ্বর যখন নব্বই বছর বয়সে মারা যান, সেদিন কলকাতার লড়াই জিতে সিরাজদ্দৌল্লা মুর্শিদাবাদ ফিরছিলেন। কুড়ি বা পঁচিশ বছরে পুরুষ ধরলে বিশ্বনাথের বয়স তখন আন্দাজ কুড়ি বা পনের। অর্থাৎ নন্দরাম যদি এঁরই কাছে মন্ত্র নিয়ে থাকেন, তবে একটু বেশি বয়সেই এ' কাজ করেছিলেন তিনি। অর্থাৎ নন্দরাম যে দীর্ঘজীবী বলে ধারণা করা গিয়েছিল সেটা অলীক নাও হতে পারে। তবে পয়সা কড়ি কামিয়ে মন্দির তৈরী করে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে যে সেনমশায়ের জীবনের দুপুর গড়িয়ে গিয়েছিল, সেটা এই কাব্যের কল্পনালক্ষ্মীও চাপা দিতে পারেন নি।

তবে কথা আছে। এই বিশ্বনাথ 'সংসারের কল্যাণার্থে দশহাজার তুলসীদানে হরিপূজা করাইতেন।' বৈষ্ণব বিশ্বনাথের শিষ্য নন্দরাম শৈব হলেন কেন ? এই জীবনীকাব্যে অবশ্য বিশ্বনাথের জন্য 'গোঁসাই' অভিধা ব্যবহার করা হয়েছে !

জয়ন্তীচন্দ্র তাঁর আদি পুরুষের কীর্তিকাণ্ড সম্বন্ধে স্বভাবতই বেশ অত্যুৎসাহী। তবে এই সব পুণ্যকর্ম করার রসদ নন্দরাম কিভাবে সংগ্রহ করলেন, সে ব্যাপারে কোন আলোকপাত করার চেষ্টা করেননি তিনি। এবং কেনই বা তিনি মুর্শিদাবাদ ছেড়ে এলেন, পিছনে ফেলে রেখে এলেন—তাঁর পিতৃপুরুষ যেথায় মানুষ, সে মাটি সোনার বাড়া—দে গঙ্গার মাটি, তার কোন হদিশ নেই। তবে সম্রাট ফররুকশিয়রের ফরমান অনুযায়ী ইংরেজরা যখন কলকাতা, ডিহি কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর কিনে নিয়ে রাজপাট বসালেন, তখন অনেক বাঙালীই নবাবের নৈরাজ্য ছেড়ে কলকাতায় এসে আস্তানা গেড়েছিল। সেই গড্ডালিকাস্রোতেই কি এসেছিলেন নন্দরাম সেন ?

মনে হয় তাই। তবে শিবাবলি ব্রতের কারণে অট্টালিকা নির্মাণের জন্য যে সুবিশাল আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং কিভাবে তা অর্জন করা হয়েছিল সে সম্বন্ধে আপাতঃ নীরবতা—প্রকারান্তরে কি ইংরেজদের অভিযোগের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে না? অবশ্য এ কথা তো আগেই বলা হয়েছে এবং ইংরাজ ঐতিহাসিকেরাও তো অস্বীকার করেননি, যে পরিবেশে এঁরা বাস করেছেন, যে বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়েছেন, যে আলোকে চোখ চেয়েছেন, তার সবই অস্বস্তিকর। অন্ধকারাচ্ছন্ন। ক্লেদাক্ত। 'করাপসন'-কটু। নন্দরামের সাধ্য কি তা এড়িয়ে যান?

তবে এই কাব্যে নন্দরামের যে নানা কীর্তির কথা বলা হয়েছে, সেগুলি মোটামুটি প্রমাণিত সত্য। কলকাতায় চিৎপুর রোডের লাগোয়া চুয়ান্ন নম্বর নন্দরাম সেন ষ্ট্রীটে রামেশ্বর শিবের সুবৃহৎ আটচালা মন্দির আজও বর্তমান। তবে তার ফলকের সন তারিখ নিয়ে সমস্যা আছে পণ্ডিতদের। পুরাতন ফলকের স্থাপন—সাল আঠার শ' চুয়ান্ন যেমন নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত, নতুন ফলকের কাল ষোল শ' চুয়ান্ন তেমনি বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই শিবের মাহাত্ম্য খ্যাপনও করা হয়েছে এই জীবনীগ্রন্থে এবং সে এক চিত্তাকর্ষক কাহিনী, যদিও তার ইতিহাস বলতে কিছুই নেই। জয়ন্তীচন্দ্র বলছেন,

'কোথা হতে মহারাষ্ট্র জাতীয় বিশেষ।
দোর্দণ্ড প্রতাপশালী বাস পূর্বদেশ॥
দঙ্গল বাঁধিয়া এক অধ্যক্ষ লইয়া।
লুট করে দেশে দেশে বেড়ায় ভ্রমিয়া॥
আসি উপস্থিত হয় গোবিন্দপুরেতে।
তন্নিকটে সুতানটি পারিল জানিতে॥'

এটা নেহাৎই কল্পকাহিনী, কেননা, বর্গীরা কোনদিনই কলকাতায় আসেনি। শিবপুর থানা পর্যন্ত তাদের অগ্রগতির খবর জানা যায়। এছাড়াও অসঙ্গতি রয়েছে বর্ণনায়। বর্গীরা কলকাতা আসবে গোবিন্দ-পুর দিয়ে কেন? শিবপুরের কাছে গঙ্গা পেরিয়ে? অন্ততঃ তার কোন

ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। বর্গীর হাঙ্গামার কাল মোটামুটি সতেরশ' বিয়াল্লিশ থেকে একান্ন। সে সময় কলকাতা বেশ জমজমাট। বহু লোকের বসত হয়েছে সারা সুতানুটি ভরে। কলকাতার আদ্যিকালের বড় বড় বাঙালীদের তখন শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বেশ বাড়বাড়ন্ত। কাজেই জয়ন্তীচন্দ্র যে বলছেন যে সুতানুটিতে আর বড়লোক বাঙালী ছিল না, কথাটা যথার্থ নয়। আর কেউ না থাকুক কুমোরটুলির গোবিন্দরাম মিত্রের তখন যথেষ্ট বোলবোলা। সাঁইত্রিশ সালের ঝড়ে তাঁর ব্ল্যাক প্যাগোডা—নবরত্ন মন্দিরের চূড়া ভেঙে পড়লেও সেটা তখনও দিবারাত্র বকের মত উঁচু গলায় কলকাতার ভালোমন্দ পর্যবেক্ষণ করে। কাজেই এই যে বলা হয়েছে—

'দেশেতে ধনাঢ্য কেহ না ছিল তখন।
রক্ষা হইবেন কিসে সংশয় জীবন॥'

সেটা ঠিক নয়। তবে বর্গীর উপদ্রবে সুতানুটির লোকজনের যে পালাবার ছবি এঁকেছেন তার সঙ্গে গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' আঁকা আলেখ্যের বেশ মিল আছে। গঙ্গারামের বর্ণনা:

'তবে সব বরগি গ্রাম লুটিতে লাগিল।
জত গ্রামের লোক সব পলাইল॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলাএ পুথির ভাব লইয়া।
সোনার বাইনা পলাএ কত নিক্তি হড়পি লইয়া॥
গন্ধবণিক পলাএ দোকান লইয়া জত।
তামা পিত্তল লইয়া কাঁসারী পলাএ কত॥'

নন্দরাম সেনের জীবনীতে রয়েছে: নন্দরাম সেনও পালালেন। আর পালালেন সপরিবারে।

'স্বর্ণরূপ্য মুদ্রা আদি যত অলঙ্কার।
সঙ্গেতে লয়েন সবে যে ছিল যাহার॥
সুতানুটি গ্রামবাসী আর যতজনে।
পলাইয়া গেছে সবে দস্যু আগমনে॥'

সে যাই হোক, এই নাটকীয় মুহূর্তে নন্দরামের জীবনে এলেন—যষ্টি হাতে শিরে পাকাকেশ পরিচ্ছন্ন দেবরূপা অতি শুভ্রবেশ লক্ষ্মীদেবী। তিনি আশ্বাস দিলেন যে সেনজী আবার ঘুরে না আসা পর্যন্ত তিনি সেনবাড়ীতে অধিষ্ঠান করবেন। লক্ষ্মীদেবীকে তাঁর শোভাবাজারের বাড়িটি সমর্পণ করে নন্দরাম চললেন হিজলী। আর এদিকে রামেশ্বর তাঁর মাহাত্ম্য দেখালেন। লক্ষ্মীদেবী নন্দরামের পুঁতে রেখে যাওয়া সম্পত্তি বর্গীদের দেখিয়ে দিলেন। তারা সেগুলি খুঁড়ে নিয়ে বলল, আর কোথা? লক্ষ্মীদেবী বললেন, দেখ বাবা, শিবের মাথার অর্ধচন্দ্রাকার হার আছে। ধনরত্ন আছে। লোভপরবশ দস্যুরা যেই মন্দিরে প্রবেশ করতে গেল—

'কপাট সংস্পৃষ্ট ছিল খুলিবা মাত্রেতে।
ভিতরে জ্বলন্ত অগ্নি পাইল দেখিতে॥
দ্বার খুলিবাতে সেই অগ্নি নিঃস্বরিল।
সম্মুখে যাহারা ছিল বদন পুড়িল॥'

জনসাধারণের সেবায় নন্দরাম যে কটি কাজ করেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে কমসে কম বারটা জলাশয় প্রতিষ্ঠা। কারণটা অবশ্য তাঁর বৃদ্ধা মায়ের ব্রত। জলসংক্রান্তির ব্রত। গনগন করছে বৈশাখ মাসের রোদ। একটা বিরাট তৈলকটাহে যেন সারা পৃথিবী ভাজা-ভাজা হচ্ছে। নন্দরামের বুড়ী মা বললেন, জলসংক্রান্তি ব্রত করব। পণ্ডিতদের ডাক পড়ল। তাঁরা বিধান দিলেন, দ্বাদশ কুম্ভ জল দান করতে হবে। কুম্ভ, কিন্তু কিসের কুম্ভ? সোনা, রূপা, পেতল না মাটির? অবশ্যই কলসীতে জলদানই শ্রেষ্ঠদান। কিন্তু সেনমশায় বললেন, এর চেয়ে ভালো বিধান দিন। ব্রাহ্মণরা বললেন,

'স্বর্ণকুম্ভ হৈতে শ্রেষ্ঠ যদি হে মনন।
পুষ্করিণী কিম্বা কূপ করহে খনন॥'

কিন্তু সেনমশায় বিপদে পড়লেন। হাতে সময় তো একটি বছর। বারটা পুকুর কাটা হবে কি করে? আর হ'ল যদি, বারটা পুকুর একই

দিনে উৎসর্গ হবে কি করে। এই সমস্যার সমাধান করলেন তাঁর ভাট-পাড়ার গুরুদেব বিশ্বনাথ তর্কবাগীশ। তিনি স্বপ্নাদেশ দিলেন, এগারটা পুকুরের জল একটি পুকুরে এনে সেই পুকুরটা উৎসর্গ করলেই সব কয়টি ঢাকুরই উৎসর্গ করা হবে। পরে মাকে নিয়ে সব পুকুরে ঘুরলেই হবে।

যাই হোক, কলকাতার চারিপাশে জলকষ্টের জায়গা খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন নন্দরাম। তখন ঃ

'গাড়ী ঘোড়া নাহি ছিল ডুলি মাত্র সার।
বহিত ধনাঢ্য লোকে দেশস্থ কাহার॥
বহুবিধ লোকসঙ্গে হলেন বাহির।
উত্তর দিকেতে যান সুবুদ্ধি সুধীর॥'

লক্ষ্যণীয়, নন্দরাম ডুলি করে চলেছেন উত্তর দিকে। কেননা, সেকালে একটা প্রথাই ছিল, উত্তর দিকে যাবার জন্যে ডুলি বা পাল্কী ব্যবহার। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে এই মুঘলাই আদবের কথা লেখা রয়েছে—ইট ওয়াজ দি কাষ্টম ফর এ কিং গোইং টু কনকোয়েষ্ট টু রাইড এ টাস্কড এলিফ্যান্ট ইফ প্রোসিডিং টুওয়ার্ডস দি ইষ্ট, অর এ হর্স অফ ওয়ান কলার ইফ মুভিং টুওয়ার্ডস দি ওয়েষ্ট ঃ ইফ টুওয়ার্ডস দি নর্থ, এ প্যালানকুইন অর লিটার (ডুলি) ওয়াজ ইউজড, হোয়াইল ইফ টু দি সাউথ এ কার অর কার্ট ওয়াজ দি প্রপার কনভিএন্স (মেমআর্স ঃ প্রথম খণ্ড) যাই হোক, সেনের ডুলি যখন এলোবারাসতে এসে পৌঁছালো তখন দেখেন সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। দুইটি মেয়েছেলেতে ধুন্দুমার। কোন্দল। ঝগড়া। কি নিয়ে—না জল নিয়ে। একজন অপরের কাছে জল ধার নিয়েছিল। অনেকদিন হয়ে গেল শোধ দেয়নি, তাই। ডুলি থেকে নামলেন সেনমশায়।

'জিজ্ঞাসেন মিষ্ট ভাষে তিনি উভয়েরে।
হেন অকৌশল কেন অল্পবারি তরে॥
কহিতে লাগিল তাঁরে যেই দিল ধার।
দীন যে দরিদ্র মোরা নির্বাহি সংসার॥'

জল তো নয় জীবন। অনেক কষ্টে বিশ মালা জল বাঁচিয়ে একে ধার দিয়েছিলাম, মেয়েটি বলতে লাগল, এমন অকৃতজ্ঞ, আজ পর্যন্ত শোধই দিল না। নন্দরাম সেনের দিব্যচক্ষু খুলে গেল। কি নিদারুণ জলকষ্ট এখানে তা বুঝতে তাঁর কষ্ট হল না। বর্ধমান মহারাজকে লিখে বিরাট একটা ভূখণ্ডের পাট্টা নিয়ে নিলেন। তারই একাংশে বামুন বসালেন। অশ্বত্থবৃক্ষ রোপন করলেন। আর সেই অশথতলায় পঞ্চানন শিব এবং পাশেই পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করলেন। বারাসাতে পুকুর প্রতিষ্ঠা করে নন্দরাম থামলেন না। সাইমাগ (সাইবাগ?), দে গঙ্গা ও গোপালনগরেও পুকুর কাটালেন। গোপালনগরের সেনবধূ পুষ্করিণী একশ' বছর আগেও বজায় ছিল, জয়ন্তী তার সাক্ষ্য ছিলেন।

গোপালনগরের 'সেন বউ' পুকুর কাটাতে কাটাতে ভাদ্রমাস এসে গেল। বাড়ীতে লক্ষ্মীপূজো আছে। শোভাবাজারে তাঁর বাড়ীর ভেতরই কয়েকটা পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করে ফেললেন তিনি। এল দুর্গাপূজা। আর সেই সপ্তমী পূজায় পড়ল ব্যাঘাত। সেনজীর ভাগ্যরন্ধ্রে শনি প্রবেশ করলেন।

'হইল সপ্তমীপূজা যথা বিধি মতে।
বলির ব্যাঘাত ঘটে শনির খেলাতে॥
মসিবর্ণ ছাগ ছিল বলির কারণ।
শনির আবাস দিব্য জানে সর্ব-জন॥'

এখন হয়েছে কি, বলির জন্য ছাগ আনা হয়েছে কিন্তু খর্পরের পাত্র আনতে ভুল। কাজেই কে যেন আনতে গেছে। আর এই অবকাশে ছাগশিশু কাঁদতে কাঁদতে উঠে পড়ল নন্দরামের কোলে। করুণা-কাতর সেনমশায় বললেন, প্রাণী-বলি বন্ধ। ছাগশিশুটিকে তিনি পুষতে লাগলেন, আর এইভাবে ছাগরূপ ধরে তাঁর গৃহে ঢুকল শনি। আর তার ফলে:

'অল্পে অল্পে রবিসুত আরম্ভেন হানি।
অদ্ভুত শনির লীলা অপূর্ব ব্যাখানি॥

গাভীগণ হাম্বারব ছাড়ে গাভীশালে।
আহারেতে তৃপ্ত নয় বিপাক কপালে ॥
সে মহাপুরুষ ক্রমে হ'ন বন্ধুহীন।
ব্যাঘাত সকল কর্ম বুঝেন প্রবীণ ॥'

নন্দরামের কর্মজীবনে যে দুর্যোগের ঘনঘটা নেমে আসে শ্যেলডনের মৃত্যুতে এই ঘটনা কি তারই ইঙ্গিতবহ? 'হন বন্ধুহীন'—বলতে কি শ্যেলডনের মৃত্যুর কথা বলতে চেষ্টা করা হয়েছে? হয়ত! তবে, এর পরেও আর একবার অভিশাপ কুড়িয়েছিলেন তিনি—কোন সত্যপীরের ফকির ঢুকে পড়েছিল তাঁর শিবমন্দিরে। নন্দরাম স্বভাবতঃই তাঁকে বেরিয়ে যেতে বললেন। আর ক্রুদ্ধ হয়ে সে অভিশাপ দিয়ে বলল :

'বহু ক্রোধ দেখাইয়া সেনজীরে কয়।
অভিশাপ করি তোমা ফলিবে নিশ্চয় ॥
অট্টালিকা ঘরবাড়ী হয়েছে বিস্তর।
এই জন্যে আছে তব গর্ব্বিত অন্তর ॥
তাহাতে সম্পতি যাহা বংশেতে থাকিবে।
যবন রাজার ঘরে অবশ্য যাইবে ॥'

এই যবন রাজা কি ইংরেজ? জন কোম্পানীর বিচারে নন্দরাম সেনকে যে তিনহাজার টাকার নগদ খেসারত দিতে হয়, এই কাহিনী কি সেই কথাই বলতে চাইছে না? জয়ন্তীচন্দ্রের মতে উমিচাঁদের সঙ্গেও গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল নন্দরামের। এই কাব্যগ্রন্থেব শেষ দিকে রয়েছে :

'শ্রী শেখ অমিন চাঁদ কতকাল পরে।
পৌঁছে কলকাতা বাস করিবার তরে ॥
ধনাঢ্য প্রকাণ্ড দাড়ি জানিত সকলে।
বন্ধুত্ব সেনের সহ হইল কৌশলে ॥
দুই কর্মে অদ্ভুতক দু'জন বিখ্যাত।
মনে কর যেবা শুনিয়াছ অবিরত ॥
বিখ্যাত সকলে অমিন চাঁদের দাড়ী।
জানিত বৃহৎ ছিল নন্দরাম বাড়ী ॥'

গোবিন্দরামের সঙ্গে উমিচাঁদের দোস্তির খবর আছে। সে গল্প পরে আসছে। তবে নন্দরামের সম্বন্ধে অবশ্যই এটা নতুন খবর। এঁদের দুজনের মিতালী কোন খাতে বয়েছিল, কলকাতা আক্রমণের সময় উমিচাঁদ যখন জেলে, নন্দরামই বা তখন কি করছিলেন, সেই ডামাডোলের বাজারে কিভাবে নিজেদের গা বাঁচিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন সংবাদই পরিবেশন করতে পারেননি নন্দরামের জীবনীকার।

তা' না পারুন, তবু এই খণ্ডিত পয়ার গ্রন্থটির মূল্য তা বলে একেবারে ফেলবার নয়। এই ঘটনাগুলির অতিরঞ্জনের খোলস বাদ দিয়ে দেখা যায় মানুষ নন্দরাম সেনকে। তাঁর কীর্তি কম নয়। এক বৃহৎ পরিবারের আদিপুরুষের যে বিরাটত্ব থাকা প্রয়োজন, তার সকল মালমসলা রয়েছে তাঁর চরিত্রে। দুর্জ্ঞেয় নিয়তির সঙ্গে সকল বিরাট পুরুষের মতই তিনি হাসতে হাসতে পাঞ্জা লড়েছিলেন এবং হার-জিত নিয়ে খুশী মনেই জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছেন। দোল-দুর্গোৎসব, রাস, রথ—সেকালের সকল পালপার্বণ নিয়ে যে বাঙালী জীবনের জন্ম হচ্ছিল কলকাতায়, তাকেও খুঁজে পাওয়া যায় এই গ্রন্থে এবং এইভাবেই এক কালকে আর এক কালে সঞ্চারিত করেছেন কবি। সার্থকতা এইখানেই।

এ ছাড়াও কথা আছে। বাংলা সন বারশ' তেয়াত্তরে অর্থাৎ আজ থেকে একশ ছয় বছর আগে এই বই লেখা। নন্দরামের সঙ্গে লেখকের দূরত্ব চার-পাঁচ পুরুষের। কাজেই নন্দরামের শ্রুত জীবনীর উপর ভরসা হোক না হোক, সে কালের শেয়াল-ডাকা, ডাকাত-পড়া, বার-ব্রতের কলকাতার ছবি পছন্দ না করবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। তার দামও কম নয়!

* * *

নন্দরামের তবু যা হোক ছিটে ফোঁটা জীবনী সংগ্রহ করা গেছে, জগৎ দাসের আবার তাও নেই। তবু নন্দরামের পর কলকাতা কাছারির কাহিনী বলতে গেলে তাঁর কথা বলতেই হয়। এখন তাই দাসমশায়ের কথাই আরম্ভ করা যাক।

জগৎ দাস

না কোন ছুটকো চাকরি নয় জগৎ দাসের। জন কোম্পানীর কলকাতা কাউন্সিলের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সাব্যস্ত হওয়া পাকা চাকরি তাঁর। নিয়োগের তারিখটা—ষোলই আগস্ট। সতের শ' পাঁচ। ফোর্ট উইলিয়মের তখন কাদার পাঁচিল। ইঁট-কাঠের দেহ নিয়ে গড়ে ওঠাব সময় পায়নি। আজকের ডালহৌসী স্কোয়ারের পশ্চিমে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নতুন বাড়িটার বরাবর জায়গায় কলকাতার প্রথম কাউন্সিল হাউসে বসে কোম্পানীর বড়কর্তারা গঙ্গার হাওয়া খেতে খেতে বঙ্গতনয় জগৎ দাসকে কোম্পানীর চাকরীতে বহাল করতে রাজী হয়ে গেলেন। কলকাতার দ্বিতীয় কালা জমিদার হলেন জগৎ দাস। কলকাতা কাউন্সিলের সেক্রেটারি এডওয়ার্ড প্যাটল তাঁর পাখির পালখের কলমে কালিগ্রাফী করা গোটা গোটা অক্ষরে সেদিনের সিদ্ধান্তটা এমনিভাবে লিখে রেখেছিলেন—

Mr. Benj Bowcher wanting a banian to serve under him in the Jeminder's office agreed that Jagurdass may be employed by him in that service.

অর্থাৎ কোম্পানীর কাছারীতে জমিদার বেঞ্জামিন বাউচার তাঁর একজন বেনিয়ান রাখতে চাইলে জগৎ দাসকে ঐ চাকরীতে নিয়োগে সম্মতি দেওয়া গেল।

তা যেন হল। কিন্তু বাউচারই বা জগৎ দাসের জন্যে হন্যে হয়ে পড়লেন কেন? ব্যাপারটা কি?

সেটা একটু খুলে বলা দরকার। বাউচারের আগে শ্লেলডন।

কলকাতার প্রথম সাহেব জমিদার। চারটি বছর বহাল-তবিয়তে চাকরী করার পর কাউন্সিলে তাঁর প্রমোশন হল। সেকালে কলকাতার কাউন্সিলে সর্বকনিষ্ঠ সভ্য হতেন কলকাতার জমিদার। সেটাই ছিল রেওয়াজ। শ্লেলডনের শূন্য স্থানে এলেন বাউচার। সতের শ' চারের ফেব্রুয়ারী। শ্লেলডন সাহেব শুধু তাঁর সেরেস্তার কাগজপত্রই বুঝিয়ে দিলেন না, তাঁর হাতের দুটো লোকও দিলেন বাউচারকে। বোধহয় বলে থাকবেন 'ভায়া হে, তুমি ত নতুন লোক। এরা সব পাকা সেরেস্তাদার—জমিদারীর কাজে ভারী পোক্ত। এরাই সব সামলে সুমলে নেবে।' এই দুই ধুরন্ধরদের একজনের নাম জানা যায় না। তবে ইনি যে হিসেবের কাজে ভারী দড় ছিলেন, তার নজির রয়েছে। অপরজন নন্দরাম সেন। বাউচার নতুন লোক হতে পারেন, কিন্তু কাঁচা নন। তিনি শ্লেলডনের কথা না ফেললেও একেবারে গোটাগুটি তাঁর হাতে গিয়ে পড়লেন না। তিনি তৃতীয় এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করলেন। ইনি একজন দোভাষী। সাহেব বোধহয় ভেবে থাকবেন যে ঐ লোকটা যখন তাঁরই দৌলতে চাকরী পাচ্ছে তখন শ্লেলডনের দেওয়া লোকেরা যদি কোনরকম গোলমাল করেও বা, এ লোকটা তাঁর নুনের মর্য্যাদা রাখবে। কৃতজ্ঞতা বলে একটা কথা আছে ত!

কথা হয়ত আছে কিন্তু তার মূল্য যে কানাকড়িও নেই বছর না ঘুরতেই সেটা বাউচার সাহেবের কাছে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। সাহেব পাল্কী করে দিব্যি কাছারিতে আসেন; নায়েব নন্দরাম আর এক দল গোমস্তা পরিবৃত হয়ে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে পরম পরিতোষসহকারে অর্ধনীমীলিত নেত্রে হুঁকো টানেন। খাজাঞ্চীর কাছে উসুল আমানতের ফিরিস্তি শোনেন। সন্দেহ হলে দোভাষীকে ডেকে জিগ্যেস করেন। ডেপুটি বল ডেপুটি, বেনিয়ান বল বেনিয়ান, কালা জমিদার নন্দরাম কুর্নিশ করে জমিদারীর হালহদ্দ বিবৃত করেন। বাজার কলকাতার ফায়ফর্দ পড়ে শোনান। সাহেব জমিদার সমঝদারের মত ঘাড় নাড়েন। কোনরকম সন্দেহ করেন না। আর করবেনই

বা কোত্থেকে? আসল হিসেব ত আমানতে। যে কোন লোক সেটাই বিশেষ করে নজর করবে। বাউচারও তাই করতেন। সেখানে তখন কোম্পানীর পোয়া বারো। দিনে দিনে শ্রীবৃদ্ধি। জমিদারীর আয় মাসের পর মাস শশীকলার মত বাড়ছিল। মার্চ মাসে যখন কোম্পানীর ক্যাশে জমা পড়েছিল চার শ উনপঞ্চাশ টাকা নয় আনা তিন পাই সেপ্টেম্বর মাসে সেটা বেড়ে দাঁড়াল পাঁচ শ' সাতাশি টাকা সাড়ে পনর আনা। কাজেই নায়েব গোমস্তার তঞ্চকতার সন্দেহ বাউচারের মনে জাগার আপাততঃ কোন কারণই ছিল না!

তবে কথায় বলে না ধর্মের কল বাতাসে নড়ে এও সেই বৃত্তান্ত। একদিন কাছারীতে বসে হুঁকো টানতে টানতে হঠাৎ—একদমই হঠাৎ—সাহেবের নজর পড়ে গেল সাহেবেরই সই করা সরকারী একটু কাগজের ওপরে। গড়গড়ার সটকাটা সরিয়ে রেখে কাগজটা কাছে নিয়ে ভালো করে দেখতেই সাহেব বুঝতে পারলেন চিঠির সইটা আর যারই হোক তাঁর নয়। নামটা তাঁর কিন্তু সইটা জাল। একটু তল্লাস করতেই হদিশ পেতে দেরী হল না যে শ্লেলডনের 'রেকমেণ্ড' করা মুহুরীটি তাঁরই নামে এই সব চিঠিপত্র, আদেশনামা বিলি করে বেশ দু'পয়সা কামিয়েছে। সাহেব ত একেবারে ক্ষেপে আগুন। এ্যাঁ, এত বড় আস্পর্দ্ধা! সঙ্গে সঙ্গে লোকটাকে ডাকিয়ে তাকে বিল্বপত্র শুঁকিয়ে দিলেন। তারপর শুরু করলেন জিজ্ঞাসাবাদের পালা। প্রথমেই ডাক পড়ল সেনমশায়ের: খাজাঞ্চীর এই সব তছরূপের তিনি কিছু জানেন কিনা? তিনি ত আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, 'কি সর্বনাশ? তাই নাকি হুজুর?' বাউচারের নিজের পছন্দ করা সেই নিরীহ দোবাসটিকেও ডাকা হ'ল। সেও নন্দরামের কথার প্রতিধ্বনি করল। তবে জেরায় জেরায় একটা গোপন কথা ফাঁস হয়ে গেল। সেই জালিয়াত খাজাঞ্চীটি নতুন করে তার চাকরীর জন্যে করকরে পঞ্চাশ টাকা গুণে দিয়েছে পুরনো জমিদার র‍্যালফ্‌ শ্লেলডনকে!

বলে না সন্দেহ বড় বাতিক। ছিল না ত ছিল না। এখন কিন্তু

বাউচার সর্বত্রই তাঁকে ফাঁকি দেওয়ার দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগলেন এবং তক্কে তক্কে থেকে একদিন সত্যিই তিনি পুকুর চুরির একটা রহস্য উদ্ঘাটন করে ফেললেন। তাঁর আর কোন সংশয়ই রইল না যে নগদী, দারোয়ান থেকে আরম্ভ করে দিশী কর্মচারীরা সবই মিলে কোম্পানীকে ভালো রকমই ফাঁকি দিয়েছে। এমনকি যার কাছে তিনি কৃতজ্ঞতা আশা করেছিলেন সেই নবনিযুক্ত দোবাসটি পর্য্যন্ত এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত! অন্যে পরে কা কথা!

ক্রুদ্ধ বাউচার পিঞ্জরাবদ্ধ আহত সিংহের মত কাছারিতে পায়চারি করতে করতে একে একে সকল দিশী চাকুরেকেই বিদায় করে দিলেন। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো। তা না হয় হল, কিন্তু এতেও পড়লেন মুস্কিলে। তাঁর কলকাতার জমিদারী চালানোর কি হবে? সেখানেত একজন দিশী কালা জমিদার চাই। আর সেই জায়গায় অবশ্যই অনেক ভেবেচিন্তে বাউচার প্রস্তাব করলেন জগৎ দাসের নাম।

যদিও দাসমশায়ের পূর্ব পরিচয় কিছুই আজ উত্তরকালের হাতে এসে পৌঁছায়নি তবু এ'টুকু নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এত পোড়খাওয়া মানুষ বাউচার যখন তাঁর জন্যে কাউন্সিলে সুপারিশ করেছিলেন এই সংকট মুহূর্তে তখন তাঁর সততা ছিল সন্দেহাতীত। জমিদারীর কাজে তাঁর দক্ষতা ছিল নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও দাসমশায়ের চাকরির জন্যে বাউচারকে বেশ কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল।

ব্যাপারটা হয়েছিল এই। দিশী কর্মচারীদের কোম্পানীর সেরেস্তা থেকে তাড়িয়ে দিয়ে অজান্তে তিনি একটা ভীমরুলের চাকে ঢিল ছুঁড়েছিলেন। দেখা গেল, এই কাজের জন্যে তাঁকে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত এক সাংঘাতিক আক্রমণের একেবারে মুখোমুখি হতে হল। কলকাতার কাউন্সিলের বিনা পরামর্শে এই সব দিশী লোককে বরখাস্ত করে তিনি যে হঠকারিতার পরিচয় দিয়েছেন সেজন্যে খাস কাউন্সিল তাঁকে নিলেন একহাত। আর এই আক্রমণের পুরোভাগে থাকলেন আর কেউ নয় কলকাতার প্রথম সাহেব জমিদার রালফ্

শ্লেডন। কাউন্সিলে বাউচারের কোন কথা শোনাই হল না। ব্যাপারটা যেন এই যে বাউচারই কাজকর্ম না দেখে নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমাতেন বলেই দিশী কর্মচারীরা তাঁকে ফাঁকি দেবার সুযোগ পেয়েছিল। আর তার ফলেই কোম্পানীর এই লোকসান। শেষবেশ কাউন্সিলের কাছে এক স্মারকপত্রে বাউচার ব্যাপারটা খুলে বলে তাঁর মনের খেদ মেটালেন। এ ব্যাপারে কিছুটা ত নন্দরামের গল্প বলার সময় বলাই হয়েছে।

কিন্তু কলকাতা কাউন্সিল যাই করুক, দিশী চাকুরেদের ছাঁটাই-এর হুকুম পালটাল না। আর বাউচারের কথামত জগৎ দাসের চাকরীটাতেও রাজী হয়ে গেল। বোধ হয়, তাঁর সততা ও কর্মনৈপুণ্যের বিরুদ্ধে তাঁদেরও কিছু বলার ছিল না। তবে দুঃখের কথা, বাউচারের অধীনে জগৎ দাস মশায়কে বেশী দিন চাকরী করতে হয়নি। কেন না, জগৎ দাসের চাকরী হবার মাসখানেক পরেই বাউচার দুরারোগ্য জ্বরে ধুঁকতে ধুঁকতে কলকাতার মাটিতেই চোখ বুজলেন। তেইশে সেপ্টেম্বর। রাত্রি দশটা। বাউচারের পর এলেন উইগুর। তারপর কোল। কোলের পর কিং।

এমনি একটার পর একটা সাহেব জমিদার পালটালেও মনে হয় কালা জমিদার জগৎ দাস তাঁর চাকরী ঠিকই বজায় রেখেছিলেন। এবং সেকালের পুরনো দলিল দস্তাবেজে দেখা যায় যে এই সময়েই বেশ কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয় কলকাতা কাউন্সিল তাদের কলকাতার জমিদারী সম্বন্ধে। এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কলকাতার গরীবগুর্বো কালা মানুষদের হিতকর একটা নতুন আইন। আগে নিয়ম ছিল গরীব লোকেরা তাদের সম্পত্তি বাড়িঘর বাড়ির উঠান প্রভৃতি হস্তান্তর করলে বিক্রয়মূল্যের শতকরা পঁচিশ ভাগ কোম্পানীর খাজাঞ্চীখানায় জমা দিতে হত। কিন্তু বড়লোক ব্যবসায়ীদের বাড়িঘর বিক্রি হলে দিতে হত মাত্র শতকরা দুভাগ। নতুন আইনে ঠিক হল গরীবদের বিক্রয়মূল্যের শতকরা পাঁচ ভাগ টাকা জমা দিলেই হবে।

কলকাতার কালা দরিদ্র বাসিন্দাদের এই মস্ত সুবিধের পিছনে কালা জমিদার জগৎ দাসের কোন হাত ছিল না, এ কথা মনে করা শক্ত!

এ সময়ে আরও একটা ঘটনা ঘটে। সতেরশ' ছয় সালের জানুয়ারী। 'হান' বলে একটা জাহাজ নোঙর করেছিল কলকাতায়। তারই দু'জন মাল্লাকে নিয়ে সেদিন এক কাণ্ড। কি যেন কারণে তাদের সঙ্গে খাস কোম্পানীর একজন দিশী পিয়নের বেশ বচসা বেধে যায়। মুখোমুখি থেকে হাতাহাতি এবং তারপরে একেবারে খুনোখুনি। পিয়নটাকে একেবারে খুন করে ফেললে গোরা মাল্লারা। আর যায় কোথা। পরদিন সাহেব জমিদার যখন তাঁর কাছারিতে গিয়ে বসলেন, দেখলেন সেই পিয়নের আত্মীয়স্বজন জ্ঞাতিকুটুম্বে কাছারির প্রাঙ্গন ভরে গেছে। তাদের মুখে শুধু এক কথা: 'সাহেব, এর বিচার কর।'

জন কোল তো বেশ ঘাবড়ে গেলেন। ব্যাপারটা নিয়ে গিয়ে তুললেন খাস কাউন্সিলে। কাউন্সিলও খুব সহজভাবে নিলে না ঘটনাটা। নেবার কথাও নয়। কেন না, তখন সদ্য কলকাতা গড়ে উঠছে। কোম্পানীর মনে মনে মুঘলভীতি খুবই। দিল্লীতে তখনও সম্রাট ঔরঙ্গজেব। হুগলিতে মুঘল সুবেদারের নামে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়। সামান্য একটা অজুহাতেই তারা হয়ত ইংরেজদের রাজত্ব করা একেবারে ঘুচিয়ে দেবে। হয়ত বা কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে হুকুম জারী করে দেবে। সমস্ত কাউন্সিল খুব সম্ভব কালা জমিদার জগৎ দাসের পরামর্শ নিয়ে থাকবেন এটার ফয়সালা করে ফেলার জন্য। এবং কয়দিন পরেই দেখা গেল জগৎ দাসের লোক গেল সেই নিহত পিয়নের বাড়ি। তার আত্মীয়স্বজনকে ডেকে পাঠাল কোম্পানী। তাদের বোঝালে যে পিয়নটির অকাল মৃত্যুর জন্য কোম্পানী খুবই দুঃখিত। কিন্তু কি করবে, মরা মানুষ ত আর ফিরবে না। কাজেই কোম্পানীর দেওয়া ক্ষতিপূরণের পঞ্চাশ টাকা নিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলাই ভালো। অবশ্য কোম্পানী টাকাটাই শুধু দিলে না এ ব্যাপারে আর কোন ঝামেলা করবে না এমনি একটা

লিখিত প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিলে তাদের কাছ থেকে। মনে হয় এই ক্ষুদ্র নাটকে মস্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন কালা জমিদার জগৎ দাস। এবং পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে যে শাস্তি কিনেছিলেন কোম্পানীর পক্ষে সেটা কিছু খারাপ সওদা নয়। এবং সেটা কি জগৎ দাসের বিচক্ষণতারই পরিচয় নয়?

কিন্তু কতদিন কাজ করেছিলেন জগৎ দাস জন কোম্পানীতে? বলা কঠিন। তবে এটা ঠিক নন্দরাম সেনের মত জগৎ দাসের চাকরীও একটানা নয়। ছাড়া ছাড়া। ত্বু'বছর চাকরী করে ত্বু' বছর বসে গেছেন। আবার ডাক পড়েছে। আবার এটাও ঠিক, চাকুরীর ক্ষেত্রে নন্দরামের মত তিনি ভাগ্যবান নন। কেননা, খুব কম হলেও প্রায় নয় বছর জন কোম্পানীর সঙ্গে সেনমহাশয়ের সম্বন্ধ বজায় ছিল। আর বছর পাঁচ-ছয়ের মধ্যেই জগৎ দাসের সঙ্গে কোম্পানীর একেবারে কাটান-ছেঁড়ান হয়ে যায়।

সেটা সতেরশ' এগার সাল। সাতই মার্চ। বুধবার। দেখা গেল মঙ্গলে উষা বুধে পা' করে দলে দলে লোক আসতে লাগল কোম্পানীর কাছারিতে। কি ব্যাপার?—না তাদের সবায়ের মুখেই এক অভিযোগ। দাসমশায় তাদের তঞ্চকতা করেছেন। তাদের ওপর বহুবিধ অন্যায় করেছেন। অবিচার-অত্যাচার করেছেন। দেখতে সাদামাটা মানুষটা হলে হবে কি, অভিযোক্তাদের কথায় দাসমশায় এক অত্যাচারী দশানন। বিশ হাতে অনিষ্ট করেছেন কলকাতার হাজারো মানুষের। আর তাদের মুখ থেকে কথা খসতে যা দেরী, ন্যায়াধীশ ইংরেজ কোম্পানী আর কালবিলম্ব করলে না। দাসমশায়কে বরখাস্ত করে দিলে। শুধু তাই নয়, কয়েদ করলে। তাছাড়া অ্যাকাউন্ট্যান্ট আডামস, খাজাঞ্চী বাউন্ট আর জমিদার লয়েডকে নিয়ে একটা কমিটি নিয়োগ করল। তারা জগৎ দাসের বিরুদ্ধে আনা নানা দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত করবে। এবং এবারে আর দিশী নয়, একজন ফিরিঙ্গী—হ্যারী মুরকে করলে কলকাতার

ব্ল্যাক জমিদার। তনখা অবশ্য কিছু বেশী। দশ-বিশ নয়। একেবারে পঁয়ত্রিশ!

তা' না হয় হ'ল। কিন্তু এই তদন্ত নিয়েই হ'ল কাল। যাকে বলে কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ! কমিটি জানাল, এই দুর্নীতির মামলায় জগৎ দাস শুধু নয়, স্বয়ং গভর্ণর ওয়েন্টডেনও জড়িত। বেচারী ওয়েন্টডেনের সময়টাই তখন খারাপ যাচ্ছিল। কেননা মাত্র ক'দিন আগে, পাঁচই মার্চ বিলেতের এক হুকুমে তাঁর চাকরি যায়। অথচ মাস সাতেক আগে ঐ খাস বিলেত থেকেই নিয়োগপত্র নিয়ে তিনি চাঁদপাল ঘাটে এসে নেমেছিলেন। দিব্যি সংসারী মানুষ। সঙ্গে স্ত্রী ছিল। ছেলেমেয়ে ছিল। এক টন বই ছিল। একটা হার্পসিকর্ড বাজনা আর বেশ কয়েক পেটি মদ ছিল। এখানে রামরাজ্য চালাচ্ছিলেনও মন্দ নয়। এমন সময় হল বিনামেঘে বজ্রাঘাত। চাকুরীটা গেল। এর ওপর তদন্ত কমিটি দিল মরার ওপর খাঁড়ার ঘা। বলল, জগৎ দাসের মামলায় ওয়েন্টডেন জড়িত। তাদের সুপারিশ— খাস কাউন্সিলে এই মামলার বিচার হওয়া চাই। অন্য কোথাও নয়।

তাই হ'ল। 'ফুল' কাউন্সিলের সভা বসল। ভ্যাপসা গরমে ঘামতে ঘামতে কাউন্সিলের নয়জন সভ্য জজিয়তি করতে বসে গেল। এবং দেখা গেল আগেকার নানাজনের সেই নানা নালিশ সেসব স্রেফ বাজে, ভিত্তিহীন। আসল নালিশ কোম্পানীর। সেটা কি? না কলকাতায় সাদাকালো ব্যবসায়ীদের কোম্পানীর বিনাশুল্কে ব্যবসায়ের ছাড়পত্র-দস্তক প্রতিখানি পাঁচ টাকায় বিক্রি করে জগৎ দাস নাকি মোটা পয়সা কামিয়েছেন। দাসমশায় প্রথমটা হাঁকিয়ে দিলেন, তিনি এসব কিছুই জানেন না। কিন্তু কোম্পানী বেশ আটঘাট বেঁধে আরম্ভ করেছিলেন। তাঁরা বেশ কয়েকজন সাক্ষী দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারা বলল, জগৎ দাসের কাছে তারা দস্তক কিনেছে। জেরায় জেরায় জগৎ দাস কোণঠাসা। অপরাধ অস্বীকারে কি লাভ। তা ছাড়া ফরিয়াদী

আর বিচারক যখন এক—সেই কোম্পানী, তখন আসামীর আর পরিত্রাণের উপায় থাকবেই বা কি করে?

কিন্তু কথা হচ্ছে জগৎ দাস ত জমিদারী সেরেস্তার কর্মচারী। তাঁর হাতে বিনাশুল্কে ব্যবসা করার ছাড়পত্র—কোম্পানীর দস্তক আসে কোথেকে? আর কোথেকে। দস্তকের ভাণ্ডারী সেই গভর্ণর ওয়েল্টডেনের কাছ থেকে। দেখা গেল কমপক্ষে একশ' আটান্নখানি দস্তক এইভাবে বিক্রির জন্য গভর্ণর দিয়েছিল দাসমশায়কে।

এই মামলায় আরো দেখা গেল, রঘু নামে রপ্তানি গুদামের এক কর্মচারী, তার কাজ গুদামের কাপড় মাপা—সেও কিছুটা দুর্নীতির সরিক। ওয়েল্টডেনকে ঘুষ দিয়ে তার চাকরী। রঘুর অবশ্য চাকরী গেল না। সে বদলী হল। তার জায়গাতেও এক ফিরিঙ্গীকে বহাল করা হল।

সবই হ'ল। কিন্তু হ'ল না এই মামলার নিষ্পত্তি। জগৎ দাস এদিকে গারদে পচতে লাগলেন। এমনিভাবেই বছরখানেক ঘুরে যাবার পর সেখান থেকেই তাঁকে ডেকে পাঠাল কাউন্সিল। বলল, দাসমশায়, যা' হবার তা' ত হয়েছে। এখন হাজার পাঁচেক টাকা দিয়ে কোম্পানীর সঙ্গে একটা রফা করে ফেলুন। দাসমশায় বলে থাকবেন, 'টাকা কোথায় হুজুর? এসব ব্যাপারে সব টাকাই ত গভর্ণর ওয়েল্টডেনকে ধরে দিতে হয়েছে। মামলার সময় অনেক সাক্ষীই ত হলফ্ করে সে কথা বলে গেছে। কাজেই, আমাকে আর যন্ত্রণা দিচ্ছেন কেন?'

ইংরেজ বেনের জাত। টাকা আদায়ে ওস্তাদ। অনেক টানা-পোড়েনের পর দুই হাজার টাকায় মিটমাট করলে। দাসমশায়ের ছাড়ান পাবার ছয় মাসের মধ্যে টাকাটা বুঝিয়ে দেবার কড়ার করা হ'ল। তবে জন কোম্পানীর দরজা চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল জগৎ দাসের কাছে। এ'কালের ভাষায় যাকে বলে 'ব্ল্যাকলিস্টেড'—তাই হয়ে গেলেন তিনি!

কিন্তু দাস মশায়ের অপরাধটা কি ? যখন প্রথমে তাঁকে গারদে পোরা হয়েছিল, বলা হয়েছিল শহর কলকাতার বহু লোক তাঁর বিরুদ্ধে বহু রকম শঠতার (rogueries) অভিযোগ তোলায় তাঁকে এই শাস্তি দেওয়া হল। কিন্তু ফলতঃ দেখা গেল, অভিযোগ শহরবাসীর নয়, কোম্পানীর। দাসমশায় ব্ল্যাক জমিদার। সাহেব জমিদারের অ্যাসিসট্যাণ্ট। কিন্তু কার্যত অভিযোগ আনা হ'ল দস্তক বিক্রির যা মনে হয় আদপেই তাঁর সেরেস্তার কাজের মধ্যে পড়ে না। তা ছাড়া দস্তকগুলি স্বয়ং গভর্ণরই তাঁকে দিয়েছিলেন। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করে' ভৃত্যের এই সাজা কোন আইনে পড়ে সেকথা সেকালের ইংরেজ কর্তারাই বলতে পারতেন।

তা' ছাড়াও কথা আছে। নন্দরাম সেনের মামলায় দেখা গেছে যে, তাঁর মুরুব্বি রালফ্ শ্লেলডেন মারা যাবার পর তেরাত্তির পেরোয়নি, কোম্পানী তাঁর বিরুদ্ধে তহবিল তছরুপের অভিযোগ আনে। জগৎ দাসের ব্যাপারেও দেখা গেল, সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে। একই নাটকের পুনরভিনয়। কেননা, চৌঠা মার্চ 'সাকসেস' জাহাজে গভর্নর এনটনি ওয়েল্টডেনের কমিশন বাতিলের হুকুম আসে। তার ঠিক তিনদিন পরেই জগত দাসের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়। কোম্পানীর সুপ্ত ন্যায়বুদ্ধি একেবারে হঠাৎ গজিয়ে ওঠার এই নজির কি বিসদৃশ নয় ? এর পিছনে অন্য কোন খেলা আশঙ্কা করা কি অমূলক ?

অবশ্যই নয়। হয়ত আড়াই শ' বছরের আবর্জনা সরিয়ে এই অনুমান হাতেনাতে প্রমাণ করা শক্ত। তবু এটা অন্তত বলা যায়, জগৎ দাসের কয়েদের পিছনে একটা রহস্য ছিল। এটা ঠিক, গভর্নর এনটনি ওয়েল্টডেন ছিলেন পাকা ঘুষখোর। তাঁর বহু কেলেঙ্কারীর বহু দৃষ্টান্ত বহু সূত্রে পাওয়া যায়।

কিন্তু এহেন ব্যক্তিকে বিলেত থেকে চাকরী দেন খাস কোর্ট অব ডিরেকটররা। এবং যতদূর মনে হয় তাঁকে এদেশে পাঠানর সময় বাঙালী দালাল জনার্দন শেঠের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ

দিয়েছিলেন কোম্পানীর বড় কর্তারা। আরও বলে দেওয়া হয়ে থাকবে, এই কাজে অপর এক বঙ্গতনয় জগৎ দাসের সাহায্য নেবার জন্যে। কলকাতায় সাধ্যমত সেই কাজই করেছিলেন ওয়েল্টডেন। এবং সেই কাজে জগৎ দাস তাঁকে সাহায্য করেছিলেন বলেই কি দাসমশায়কে এই মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হয়নি ?

সেটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। বাঙলাদেশের কাউন্সিলের কাছে লেখা বিলেতের কোর্ট অব্ ডিরেকটরদের একটা চিঠিতে এমনি একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। সতেরশ' ষোলর পনেরই ফেব্রুয়ারি সেই চিঠিতে ডিরেকটররা লিখছেন—

When Governor Weltden made use of Jagat Das against Jonardaun's interest, there were enough found to consent to punish on the complaints against him (Jagat Das).

অর্থাৎ গভর্নর ওয়েল্টডেন যখন জগৎ দাসকে জনার্দনের স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন তখন তাঁর (জগৎ দাসের) বিরুদ্ধে নালিশের সময় অনেকেই তাঁকে শাস্তি দিতে রাজী হয়েছিলেন।' কোর্টের বক্তব্য কি মিথ্যা ?

আসলে কোন এক অশুভ গ্রহের দৃষ্টিবৈগুণ্যে কে জানে, জন্মের সেই পরম লগ্নেই কলকাতার এই অস্বাস্থ্যকর জলাভূমির মানুষ এক অসুস্থ খেলায় মেতেছিল। তাতে স্বার্থবুদ্ধিই একমাত্র বুদ্ধি, দুর্নীতিই একমাত্র নীতি, ষড়যন্ত্রের চাপা ফিসফিসানিই একমাত্র আলাপের ভাষা। সেই খেলায় দেশী-বিদেশী কেউই বাদ যায়নি।

অবশ্য জগৎ দাসের ট্রাজিডি বোধ করি অন্যত্র। দু বছরই হোক, দশ বছরই হোক, জগৎ দাস মশায় সেকালের কলকাতায় বেশ বড় চাকরীই করতেন। এবং বলা বাহুল্য, দেশী লোকেদের ভালোমন্দর ভাগ্যবিধাতা ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন কলকাতার সেকালের এক বিশিষ্ট বাঙালী। কলকাতার একেবারে আদ্যিকালের বাঙালী

অগ্রণীদের অন্যতম। কিন্তু ভাগ্যের এমনি পরিহাস, কোম্পানীর পুরনো দলিল দস্তাবেজ বা কলকাতার পুরনো বিবরণের পাতায় নিরাসক্ত উল্লেখ ছাড়া, তাঁর অন্য কোন অস্তিত্ব আজ আর কলকাতার বুকে বেঁচে নেই।

*　　　*　　　*

তবে যে বৃত্তান্ত জগৎ দাসের, সেই কাহিনীই রামভদ্র চৌধুরীর (?)। জগৎ দাসকে যেমন আমরা আর মনে রাখিনা, রামভদ্রেরও সেই একই অবহেলা। অথচ জগৎ দাসের চেয়ে রামভদ্র কৃতিকর্মা ব্যক্তি। সাহেবদের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করার যে ট্রাডিশন আছে উনবিংশ শতকের স্বাধীনচেতা বাঙালীর, সেই ঐতিহ্যের মোটামুটি গোড়াপত্তন করে গিয়েছিলেন এই অষ্টাদশ শতকের বঙ্গতনয়। রামভদ্রের কাহিনী সামান্য যা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তাতেই দেখা যাবে রামভদ্র বড় সামান্য ব্যক্তি নন। আকবর পাতশার সেনাপতিদের সঙ্গে লড়েছেন যশোরের প্রতাপাদিত্য, চাঁদরায়, কেদার রায়, ভূষণার সীতারাম রায়। 'চাঁদ প্রতাপের হুকুমে হটিতে হয়েছে দিল্লীনাথে।' ছোটখাট তেমনি লড়াই করেছেন রামভদ্র খাঁটি ইংরেজ সৈন্যদলের সঙ্গে, এবং বললে হয়ত বিশ্বাস হবেনা, পলাশীর লড়াই-এর মাত্র দেড়কুড়ি বছর আগে, সেই ইংরেজকে সম্মুখসমরে ঘায়েল করেছিলেন তিনি—এ'কি কম কথা?

আমাদের ইতিহাস নেই, সাহিত্য নেই। চারণকবিও নেই—নয়ত গান বাঁধবার এমন বিষয় তাঁরা হাতছাড়া করতেন না কখনও। লেখবার মত এমন ইতিবৃত্ত, এমন কাহিনী, কে কবে কটা পেয়েছে?

ভুললে চলবেনা, আমরা রামভদ্রের বীরত্বের যা সামান্য কাহিনী পেয়েছি তা তাঁর শত্রুপক্ষের রচনা। তার কিছু বাটা যাবেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা আস্ত মানুষ বাঙালীকে আমরা হাতের কাছে পাই সেই কলকাতার যখন পত্তন হচ্ছে—সেই আমলেই! সেই কাহিনীই ধরে রাখলাম এখানে।

রামভদ্র

টৌন কলকাতার বুকে আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নামছে। সতেরশ' উনিশ। মার্চের দোসরা। ট্যাংক স্কোয়ারের তখনও ঠিক পত্তন হয়নি। নয়ত দেখা যেত একটু আগে ঈষদুষ্ণ অপরাহ্ণেই জোড়ায় জোড়ায় সাহেব মেম ঢাউস ছাতা মাথায় ট্যাংক স্কোয়ারে হাওয়া খেয়ে ফিরছে। মেম সাহেবদের প্রায় মাটিতে লোটান ফ্রকের ওপর গঙ্গার হাওয়া লুটোপুটি খাচ্ছে। কিন্তু সে সব তখন ভবিষ্যতের গর্ভে। কোম্পানির খাতাতেই কেবল টৌন। আসলে গ্রাম। গঞ্জ। দোকানপাট-কাতারি। বন ঘিরে বসত। বনই বেশি। হিজল, বাঁশ আর বেতবন। জলার লম্বা লম্বা ঘাস। তার ভেতর থেকে কোন কোন সন্ধ্যায় শিয়াল বেরিয়ে এসে উঁচু মুখ করে ডেকে আবার বনের মধ্যে ঢুকে যায়। কলকাতার শান্ত সন্ধ্যার বিষণ্ণ স্তব্ধতা একবার ছিন্ন হয়ে পরক্ষণেই মাকড়সার জালের মত আবার জুড়ে যায়।

কিন্তু সে দিনের সন্ধ্যার সেই স্তব্ধতার পর্দাটা আকস্মিকভাবে ছিঁড়ে গেল অন্য কারণে। কলকাতার কয়েক হাজার বাসিন্দা সেই ফাল্গুনের ভাঁটফুল-ফোটা সন্ধ্যায় চোখ বড় বড় করে দেখল কলকাতা-সুতানুটির মাটি কাঁপিয়ে একে একে বেশ কয়েকজন গোরা পল্টন আর দিশি বরকন্দাজ বেরিয়ে গেল চৌকোচৌহদ্দি ফোর্ট উইলিয়মের পূব দিকের সিংদরজা দিয়ে। কাপ্তেন তাদের নিকলস রো। কৌতুহলী গৃহস্থ ফিস ফিস করে বললে, 'কি ব্যাপার?' 'হোয়াটস দিস অ্যাবাউট।' নীল আকাশের বুকে সদ্যওঠা তারারা ঝিকমিক করে বুঝি সেই প্রশ্নটারই প্রতিধ্বনি করল—কি ব্যাপার?

অর্থাৎ কিনা এ লড়াই কার বিরুদ্ধে? কি কারণে? সাড়ে ন শ গোরা পল্টন নিয়ে পলাশীর লড়াই ফতে করতে গিয়েছিল লর্ড ক্লাইভ। সে ঘটনার প্রায় তিন যুগ আগে কলকাতা থেকে ইংরেজ স্থলবাহিনীর প্রথম উল্লেখযোগ্য যুদ্ধযাত্রায় ষাট জন গোরা সৈন্য ও জনা বিশ-ত্রিশ দিশি সেপাই নিয়ে নিকলস রো চললেন কোথা? চললেন, বরানগর আক্রমণ করতে। বাঙালি জমিদার রামভদ্রকে শায়েস্তা করতে। ঢিট্ করতে। কিন্তু কে এই রামভদ্র? কেনই বা এই বরানগরের লড়াই।

না, রামভদ্র কোন নবাব নয়। না তাঁর তাঁবে ছিল কিছু দশ বিশ হাজারী মনসবদার বা কয়েক গণ্ডা ওমরা। না তিনি কিছু ছোটখাট দেশীয় নৃপতি। তবু তাঁরই বিরুদ্ধে এই ছোটখাট পলাশীর লড়াই-এর মহড়া। শুনতে অবাক লাগবে, রামভদ্র একদা ছিলেন কোম্পানীর বশম্বদ ভৃত্য। জন কোম্পানীর বাঙালি কর্মচারী। নন্দরাম সেন, জগৎ দাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কলকাতার তৃতীয় কালা জমিদার হয়েছিলেন তিনি। নিয়োগের তারিখটা—সতের শ নয়। চৌঠা এপরিল। তবে হ্যাঁ, চাকরীটার জন্যে তাঁকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। সে এক জবর গল্প। চাকরীর কথা মোটামুটি পাকা। রামভদ্র কোম্পানীর কাছারিতে রোজই এসে ঘুর ঘুর করেন, সাহেব জমিদার হুজুর কবে বলেন, রামভদ্র কাল থেকে এসো। সব উমেদারই যা করেন আর কি! কিন্তু হুজুর আর বলেন না। একদিন ডাকলেন, ত তখন হুজুরের মুখে অন্য কথা। বাড়াভাতে ছাই। গোরা জমিদার বগডেন গলা খাঁকারি দিয়ে বলে বসলেন, রামভদ্র, তোমায় জামিন দিতে হবে বাছা। কোম্পানী অনেক ঠেকে শিখেছে। অনেক টাকার কারবার কলকাতার জমিদারী। কাজেই'।···রামভদ্রের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। কিন্তু তিনি ঘাবড়ালেন না। 'আচ্ছা', বলে বেরিয়ে এলেন কাছারি থেকে। এবং কালক্ষেপ না করে জামিন খুঁজতে লেগে গেলেন। জানাশুনা ভালই ছিল। একসময়ে জামিন পেয়েও গেলেন। তাঁর হয়ে জামিন দাঁড়ালেন কোম্পানীরই এক বড়

চাকরে—ঢাকার উকিল সন্তোষ মল্লিক। অনেকে অবশ্য বলেন যে মল্লিকমশায়ও একদা কলকাতার কালা জমিদার হয়ে বসেছিলেন, কিন্তু টিকতে পারেন নি। উইলসনের সংগৃহীত কাগজপত্রে অবশ্য তার কোন উল্লেখ পাওয়া যায়নি। যাই হোক, সন্তোষ মল্লিক সেকালের উঠতি কলকাতার উজ্জ্বল নক্ষত্র। এঁরই নামে সেকালের কলকাতার সন্তোষ বাজার। কলকাতার মল্লিকবাড়ির আদি পুরুষদের অন্যতম। মল্লিকমশায় মাইনে পেতেন মোটা। সেই আমলে মাসে পঞ্চান্ন টাকা। কাজেই কোম্পানির আর আপত্তি রইল না। রামভদ্র বসলেন কালা জমিদারের গদীতে।

তা তিনি মাইনে পেতেন কত? তাঁর নিয়োগের রেকর্ডে আছে—'হ্যাভ ওয়েজেস অ্যাজ দি ফরমার ম্যান হ্যাড ইন হিজ প্লেস।' অর্থাৎ আগেকার লোকটি যা মাইনে পেত এঁকেও তাই দেওয়া হবে। আগেকার লোক মানে ত জগৎ দাস। তাঁরও আগে নন্দরাম সেন। নন্দরাম চাকরীতে ঢোকেন মাসে দু টাকা মাইনেতে। দাসের মাইনের কোন রেকর্ড নেই। রামভদ্র মাইনে পেতেন টাকা কুড়ি। অন্তত সতের শ দশ সালের মার্চ মাসে তাঁর নামে ওই টাকা খরচ লেখা হয়েছে।

এ দিকে রামভদ্র চাকরিতে ঢোকার পর এক মাসও কাটল না কাউন্সিলে বেশ ওলট পালট হয়ে গেল। শ্যেলডন গত হলেন। তাঁর জায়গায় এলেন জন রাসেল। তিনিও বেশি দিন থিতু হয়ে বসতে পেলেন না। খাস বিলেত থেকে এলেন এনটনি ওয়েল্টডেন। তাঁর বরাতেও এ সুখ বেশি দিন সয়নি জগৎ দাসের কাহিনী বলার সময় সে গল্প বলা হয়ে গেছে। তবে কেবল মনিবই পালটায়নি, রামভদ্রের আমলে কলকাতার জনজীবনে বেশ বড় একটা ওলট পালট হয়ে গেল। একটা ঝড় বয়ে গেল বলতে হবে। সতের শ দশ। জুন। কলকাতায় দারুণ চালের অভাব। শুধু কলকাতায় নয়। মাদ্রাজেও। সেখান থেকে হন্যে হয়ে দুটো জাহাজ এল কলকাতায়। চালের

জন্যে। কিন্তু কলকাতার তখন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। জাহাজ দুটো চাল না নিয়েই ফিরে গেল।

সেকালের সরকারি নথিপত্র খোলাখুলি লেখা রয়েছে, কলকাতার এই প্রথম দুর্ভিক্ষের সময় চালের অভাবে দেশে হাহাকার পড়ে গিয়েছিল। কোম্পানীও স্থির থাকতে পারেনি। প্রথমেই তারা যে কাজটা করেছিল, সেটা হচ্ছে মূল্য নিয়ন্ত্রণ। মিহি চাল টাকা টাকা মণ। মোটা—টাকায় এক মণ দশ সের। কিন্তু অসাধু ব্যবসাদার ত সেকালেও ছিল। তবে কিনা কোম্পানীও সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিল। তারা মূল্য নিয়ন্ত্রণই শুধু করেনি, কনট্রোল দরে পাঁচ শ' মণ চাল বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করে। অসাধু ব্যবসাদারদের একেবারে জোঁকের মুখে নুন। এবং শহর কলকাতার প্রথম দুর্ভিক্ষ রোধে কোম্পানীর এই সময়ের কালা জমিদার রামভদ্রেরও যে একটা ভূমিকা ছিল সে কথা বলে বোঝাবার দরকার নেই। এবং এ থেকে রামভদ্রের বাস্তবজ্ঞান ও শাসন দক্ষতারও একটা পরিচয় মেলে।

তবে রামভদ্রের শত দক্ষতা সত্ত্বেও তিনি যে মানে মানে ভদ্রভাবে কোম্পানীর চাকরী থেকে বিদায় নিতে পেরেছিলেন তা ত মনে হয় না। নন্দরাম সেনের ট্রাডিশন তৃতীয় জনেও সমানে বর্তেছিল বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এবং শুধু কলকাতা কাউন্সিল নয় সাত-সমুদ্রের তের নদীর পারেও তাঁকে নিয়ে বেশ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল কোম্পানী তার প্রমাণ রয়েছে। সতের শ ষোলয় লিডেনহল স্ট্রিটে বসে জন কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টররা লিখে পাঠালেন দালালদের সাহায্যে ও কাউন্সিলের আনুকূল্যে রামভদ্র এমন এক অলাতচক্র গড়ে তুলেছেন, যাতে কোম্পানীর স্বার্থের যথেষ্ট হানি হচ্ছে। ঐতিহাসিকরা অবশ্য মনে করেন কোম্পানীর বড়কর্তাদের এই অভিযোগ নিতান্তই ভিত্তিহীন কেননা সতের শ এগার সালে কলকাতার বাজারে তেতাল্লিশ হাজার পাউণ্ডে কেনা মাল ফ্রান্সের বাজারে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডে বিক্রি করেছে কোম্পানী। অবশ্য এই লাভের সমুদ্রে দু'এক

গণ্ডূষ জল সেকালের বাঙালী দালাল বা কালা জমিদাররা নিজেদের জন্যে রাখেননি, সে কথা নয়। এবং সে কাজটা যে একেবারে গর্হিত অন্যায় সে কথা ত এক কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টররা ছাড়া আর কেউই বোধহয় বলবেন না। এমন কি ঐতিহাসিক উইলসন সাহেব পর্যন্ত ঠাট্টা না করে পারেননি—'নো ওয়ান বাট দি কোর্ট অব ডিরেক্টরস উড মেনটেন ছাট দি হোল ডিউটি অব ম্যান শুড কনসটিটিউট ইন ড্রাইভিং গুড বারগেনস ফর দি অনারেবল কোম্পানী।' অর্থাৎ কিনা কোর্ট অব ডিরেক্টররা ছাড়া আর কেউই অবশ্য বলবেন না যে মানুষের এক এবং একমাত্র দায়িত্ব হল কোম্পানীর লাভের জাহাজ বোঝাই করা।

কিন্তু সে কথা বোঝে কে? রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘের মত কোম্পানী তখন টাকা টাকা করে পাগল হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে কালা ধলা সবাই মিলে তাঁদের ফতুর করছে, এ ধারণা তখন তাঁদের বদ্ধমূল। তাঁরা কলকাতার গভর্ণর জন রাসেলকে চিঠির পর চিঠি লিখে পাঠাতে লাগলেন এর বিহিত করার জন্যে। কিন্তু লণ্ডনে বসে চিঠি লেখা এক আর কলকাতায় বসে ব্যবসা চালান আর এক। কাজেই কাজের মানুষ রাসেল, না রামভদ্র, না বাঙালী দালাল বেনারস শেঠ—কাউকেই কোন কথা বললেন না। বরখাস্ত করা ত দূরের কথা। কিন্তু বলা-বাহুল্য, রামভদ্রের এত সুখ সয়নি। অনতিকাল পরেই এক বিষুৎ-বারের বারবেলায় কলকাতার গভর্ণর হয়ে এলেন উইলিয়ম হেজেসের ভাইপো রবার্ট হেজেস। সতেরশ' তেরর তেসরা ডিসেম্বর। হেজেস হলেন কোম্পানীর যাকে বলে 'মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সারভেন্ট' চির-অনুগত ভৃত্য। তিনি এসেই রামভদ্র এবং শেঠজী—উভয়কেই দিলেন ছাড়িয়ে। এবং শুধু চাকরী খুইয়েই যদি রামভদ্র রেহাই পেতেন তা হলেও না হয় কথা ছিল। দেখা যাচ্ছে, সতেরশ' পনের সালের দশই ডিসেম্বর কলকাতা কাউন্সিলের তিনজন সদস্য—সামুয়েল ফিক, জেমস উইলিয়মসন ও এডওয়ার্ড পেজ—এই তিনজনের সই করা কোম্পানীর

কাছে এক রিপোর্টে রামভদ্রের কয়েদের সুপারিশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে সদস্যরা রামভদ্রের হিসাব পুংখানুপুংখভাবে দেখে এই সিদ্ধান্ত না করে পারেননি যে, তিনি গত দু'বছর যাবৎ কোম্পানীর ক্যাশের চোদ্দ শ আটান্ন টাকা নিজের কাজে লাগিয়েছেন। কোম্পানীর পোদ্দার তাঁকে বার বার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও তিনি ছ শ টাকার বেশি জমা দেননি। এবং বাকী পাওনা জমা দেবার কোন গা দেখাচ্ছেন না। এই সব কারণে তাঁরা মনে করেন—'উই থিংক দিস এ ক্রাইম ইন আওয়ার ওপিনিয়ন সফিসিয়েন্ট ফর হিজ ইমপ্রিজিনমেণ্ট'—অর্থাৎ এই অপরাধ তাঁরা মনে করেন, রামভদ্রকে কয়েদ করার পক্ষে যথেষ্ট। সাহেবরা তাঁদের রিপোর্টে একটা গূঢ় ইঙ্গিত করে বলেছিলেন যে রামভদ্রকে কয়েদ করা হলে তাঁর তঞ্চকতার আরও অনেক ঘটনার ওপর আলোকপাত করার তাঁরা সুযোগ পাবেন এবং বিশেষ করে সেই কারণেই তাঁকে এই কয়েদ করার সুপারিশ।

এই সুপারিশ আদৌ কার্যকর করা হয়েছিল কিনা সরকারী নথিপত্রে তার কোন হদিশ নেই। তবে অচিরে যে তিনি কোম্পানীর চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বরানগরের এক স্বাধীন জমিদার হিসেবে আত্ম-প্রকাশ করেন, তার বিবরণ কোম্পনীর রেকর্ডেই রয়েছে। আর সেই কাহিনীই বরানগরের সেই বিস্মৃতপ্রায় লড়াই-এর গল্প।

কিন্তু কেন এই বরানগরের লড়াই? সেটাও একটু বলে নেওয়া দরকার। বললে অনেকটা পৌরাণিক কাহিনীর মত শোনাবে, তবে ব্যাপারটা কিন্তু তাই—সামান্য এক আশ্রিত রক্ষণ নিয়েই এই ধুন্ধুমার বেঁধে যায়। শুরু হয়েছিল তিল মতন, পাকেচক্রে দাঁড়িয়ে গেল তাল পরিমাণ। এটা সতেরশ' উনিশের ঘটনা। কলকাতার ইংরেজ রাজত্বে বাস করতেন জয়রাম কলু। এখন সেকালের সকল বঙ্গতনয়ের মতই তাঁরও সাধ হয়েছিল বড়লোক হবার। আর সেই দুর্দমনীয় ইচ্ছার বশেই বোধকরি কোম্পানীর বাজারে তিনি দোকান দিয়েছিলেন। কিন্তু বাণিজ্যে যে লক্ষ্মীর বসতি তিনি জয়রামের ছোট দোকান ঘরে

একেবারেই পদার্পণ করতে চাইলেন না এবং জয়রাম দিন দিন দেনায় ডুবতে লাগলেন। দেনার দায়ে হৃতসর্বস্ব জয়রাম এক গভীর রাত্রে শহর কলকাতা যখন নিশুত হয়ে গেল, তার পিতৃ-পুরুষের বসত ছেড়ে একটা গরুর গাড়িতে তার সামান্য অবশিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তি সব কিছু চাপিয়ে সুতানুটি ছেড়ে 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলে বেরিয়ে পড়লেন। সামনে বরানগরের অন্ধকার। কিন্তু সেখানেই সেই নিশ্ছিদ্র তামস গহনেই জয়রাম কিছু আশার আলোক দেখতে পেলেন। কোম্পানীর কাকপক্ষীতে টেরই পেল না যে তাদেরই একজন খাতক কলা দেখিয়ে দিব্যি গা ঢাকা দিলে। শুধু সেই অবকাশে কলকাতার বাঁশবন আর হোগলার জঙ্গলে অজস্র ঝিঁঝিঁ পোকার ঐকতানের সঙ্গে জয়রাম কলুর গরুর গাড়ির চাকার একটানা আর্তনাদ এক বিচিত্র সিম্ফনির সৃষ্টি করতে লাগল।

পরের দিন শীতের সোনার রোদে শহর কলকাতা জেগে উঠতেই চর এসে খবরটা দিয়ে গেল ফিরিঙ্গী কালা জমিদার হ্যারী মুরের এজলাসে। জমিদারীর হালহদ্দ নিতে ব্যস্ত হ্যারী মুর আলবোলার সট্‌কাটা আছড়ে ফেলে ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলে থাকবে, 'কেয়া বোলতা, জয়রাম তেলি ভাগ গয়া।' বাঙালী নগদী ভাবলে খবরটা দিয়ে সেই যেন অপরাধ করে ফেলেছে। তবু সবিনয়ে জানালে, খবরটা সত্যি। সরজমিনে সে তদন্ত করে এসেছে। অথচ খাতা খুলে দেখা গেল জয়রামের কাছে কোম্পানীর পাওনা এক কাঁড়ি টাকা। চর আরো বললে সে শুনেছে, জয়রাম বেশি দূরে যায়নি, সুতানুটির উপান্তে বরানগরে আশ্রয় নিয়েছে। তারপর যে খবরটা দিলে তাতেই হ্যারী মুরের চোখে রক্তের ছিটে লাগল। চর জানালে জয়রাম পালিয়ে ডেরা করেছে রামভদ্রের জমিদারীতে। হ্যারী মুর কালক্ষেপ না করেই হুকুম দিলে আর্মড পুলিশ—বরকন্দাজ পাঠাও। তাকে বেঁধে আনুক। কোম্পানীর হুকুম, সেকালেও বড় জবরদস্ত ছিল। টপ করে বড় একটা নড়চড় হ'ত না। হাতে গাদা বন্দুক,

মাথায় পাগড়ী, মালকোচা মারা কাপড় পরনে, কোম্পানীর বেশ কয়েকটা দিশি সেপাই রওনা হয়ে গেল বরানগরের উদ্দেশ্যে জয়রামকে বেঁধে আনতে।

কিন্তু একি ছেলের হাতের মোয়া নাকি? রামভদ্রের জমিদারী থেকে তাঁকে না বলে কয়ে তাঁরই কোন প্রজার উপর হামলা করবে? এ হেন অপমান কোন জমিদার সহ্য করবে? রামভদ্রেরও কিছু পাইকপেয়াদা আছে। ইংরেজদের বরকন্দাজ যেই জয়রামকে ধরে বেঁধে নিয়ে কলকাতা রওনা হবার উপক্রম করছে, জমিদারের লোকেরা একেবারে হৈ হৈ করে তাদের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। আর বরানগরের বুকে সেদিন দ্বিপ্রহরে একটা ছোটখাট লড়াই লেগে গেল বলতে হবে। যাকে বলে তুলকালাম কাণ্ড। কোম্পানীর পক্ষে বেশ কয়েকজন জখম। কিন্তু জয়রাম সে যাত্রায় বরানগরেই রয়ে গেল। প্রথম রাউণ্ডের লড়াই-এ আহত ব্রিটিশ সিংহের গুহায় ফিরে এসে ক্ষতস্থান লেহন করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

অতঃ কিম্? এরপর কি করা যায়? টাকার শোক বেনিয়া কোম্পানীর বুকে স্বভাবতঃই বেশ বেজে ছিল। তার ওপর অসম্মান! কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। নাকে খত দিয়ে ফিরতে হয়েছে বরানগর থেকে। কোম্পানীর নতুন জমিদার তখন ওয়াটারওঅর্থ কলেট। তিনি ভাবলেন, সম্মুখ সমরে যখন হল না, কৌশল করতে দোষ কি? কলকাতায় সীমান্তে থাকতেন রামভদ্রের খুল্লতাত। কোম্পানী এক রাত্রে তাঁর বাড়ী ঘেরাও করে তাঁকে, তাঁর এক আত্মীয় এবং একজন চাকরকে বেঁধে আনল কলকাতায়। উদ্দেশ্য স্পষ্টতঃই রামভদ্রের ওপর চাপ দেওয়া। জয়রামকে তিনি যেন ছেড়ে দেন।

রামভদ্র সে ধাতের মানুষই নন। ইংরেজদের অধীনে কাজ করে তাদের তিনি হাড়ে হাড়ে চেনেন। তাদের নষ্টামির জবাবও যে কি করে দিতে হয়, সে পাঠও তাঁর বেশ পড়া। ইংরেজদের এক গোমস্তা গিয়েছিল কি যেন কাজে বরানগর। রামভদ্র দেরী না করে তাকে

ধরে আনতে বললেন। যা কিছু তার কাছে ছিল, সব কেড়ে নিয়ে হুকুম দিলেন তাকে আটকে রাখতে। এ ছাড়া নয়জন কোম্পানীর প্রজা গিয়েছিল বাণিজ্য করতে বরানগরে। তাদেরও রাখলেন তিনি কয়েদ করে। যেমন চাপান দিল কোম্পানী তেমনি উতোর গাইলেন রামভদ্র। কলেটের কৌশল যাকে বলে মাঠে মারা গেল।

আর তখনই টনক নড়ল কলকাতা কাউন্সিলের। জোর সভা বসল। ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে কষ্ট হল না তাঁদের। এমনি যদি চলে, এর যদি বিহিত না হয়, কোম্পানীর কাজকারবার ত ডকে উঠবে। আর কেউ মানবে নাকি সাহেবদের! কাউন্সিল অনেক ভেবে চিন্তে জোর মিটিং করে একেবারে মোক্ষম দাওয়াই দেবার সিদ্ধান্ত নিল। আর কলকাতার শহরবাসীরা সবিস্ময়ে দেখল ইংরেজ কোম্পানী চলেছে বরানগর অভিযানে। কাপ্তেন নিকলস রোর অধীনে। সঙ্গে যাচ্ছে কলকাতার কাজী আর কালা জমিদার, হ্যারী মুর। খাতক জয়রাম তেলিকে চিনিয়ে দেবে। রোকে সাফ হুকুক দেওয়া হল— রামভদ্র যদি কোম্পানীর লোকজন, অপহৃত সম্পত্তি আর জয়রাম তেলিকে ফেরৎ না দেয় তাহলে, 'উই উইল বার্ন হিজ হোল কান্ট্রি এণ্ড ডেসট্রয় অল বিফোর আস' সারা জমিদারীটা পুড়িয়ে দেব আর যাকে সামনে পাব দেব খতম করে। বললে বটে, কিন্তু একটা শর্ত জুড়ে দিলে, খবরদার, কোম্পানীকে আর একবার জিজ্ঞাসা না করে যেন এ সব কিছু করে বসো না।

সেই মার্চ মাসের সন্ধ্যায় কেল্লার গুটিকয় পাকা ঘরে মোমবাতির আলো জ্বলে উঠেছে। জানালার কাঁচ দিয়ে বাইরে তার রেশ লাগছে। তারই ম্লান ছায়া নাচছে গঙ্গার জলে। শহরের উপান্তের হোগলা জঙ্গলে জোনাকগুলো জ্বলছে আর নিভছে। কোনো একটা এঁদো পুকুরের পারে সাপে ব্যাঙ ধরেছে। তারই বিকট চিৎকার ভেসে আসছে। কালা কলকাতার উনুনে এইমাত্র আগুন পড়েছে। তারই ধোঁয়ায় ঝাঁক ঝাঁক মশা গুঞ্জন তুলে আসছে সাদা কলকাতার

দিকে। এহেন সময়ে হাতে মশাল জনা নব্বই লালকালো সৈন্য মার্চ করে বেরিয়ে পড়ল বরানগরের উদ্দেশ্যে। ডুলিতে করে চলল কামান। বন্দুক। তাজা কার্তুজ। গোলাবারুদ অঢেল। তাঁবু আর সৈন্যদের নানা সাজ ও যুদ্ধসরঞ্জাম—কিছুই বাদ নেই। কোনরকম চুক নেই। লড়াই—সশস্ত্র অভিযান—কোন ত্রুটি নেই তার। একেবারে আটঘাট বেঁধে চলেছে ইংরেজ।

ইংরেজদের স্বভাবই এই। যে কাজে লাগে, তেড়েফুঁড়ে লাগে। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর শেষ হবার আগেই 'কুইক মার্চ' করে কাপ্তেন নিকলস রো, এনসাইন গীললমাস, আর তাঁর সৈন্যবাহিনী বরানগরে রামভদ্রের জমিদারীর একেবারে মাইল দুই ভিতরে ঢুকে পড়ল! শুধু তাই নয়। সেখানে সেই রাত্রেই মশালের ধোঁয়া-ঢাকা আলোয় অধীনস্থ লোকজনদের সঙ্গে বসে আগামীকালের একটা স্ট্রাটেজি ঠিক করে ফেললেন রো। সিদ্ধান্ত হল রাত্রে আর বেশিদূরে এগোন হবে না। কেননা সামনেই একটা নালা রয়েছে। সেটা পার হওয়া এমন কিছু নয়। কিন্তু কোনরকম অতর্কিত আক্রমণে যদি পেছিয়ে আসতে হয়, রাতের অন্ধকারে বেশ বেগ পেতে হবে। ছোট পলাশীর যুদ্ধের লর্ড ক্লাইভ একরাশ চিন্তাভাবনা নিয়ে সে রাত্রের জন্যে তাঁবুতে শুতে গেলেন। ঠিক করেই গেলেন একেবারে কাক-ডাকা ভোরেই রামভদ্রের গৃহ অভিমুখে বেরিয়ে পড়া হবে যাতে আটটার মধ্যে তাঁর বাড়ী ঘিরে ফেলা যায়।

ইংরেজদের সময়জ্ঞান বেশ টনকো। এদেশের রাজা বাদশাদের তারা এসে থেকেই অনেক ঘড়ি উপহার দিয়েছে। কিন্তু তাদের সময়জ্ঞান এত করেও শেখাতে পারেনি। সে যাই হোক, আটটার একটু আগেই তোপ দাগতে দাগতে ইংরেজ সৈন্য একেবারে রামভদ্রের ভদ্রাসনের কাছে দিয়ে পড়ল। গিয়েই তারা স্থানীয় এক ব্রাহ্মণকে দূত হিসেবে পাঠাল জমিদার মশায়ের কাছে। দূত নতুন করে গেল এই যা। নয়তো তার বক্তব্য সেই পুরাতন। জয়রামকে ছেড়ে

দাও। সেই সঙ্গে অন্যান্য সবাইকে। সুবোধ বালকের মত কাজ কর। জবাবে রামভদ্র কি বলেছিলেন? ব্রাহ্মণ দেখে তিনি কি দূতের কাছে আশ্রিত রক্ষণের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করেছিলেন? কিংবা তাঁর নিজের আত্মীয়দের উপর ইংরেজদের চড়াও হয়ে অত্যাচার করার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন?

কে জানে? তবে কোম্পানীর নথিপত্রে রয়েছে, ব্রাহ্মণ দূতে কোন কাজ হয়নি। আর রামভদ্র বৃদ্ধ বটুকে এইটুকু সবিনয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন, কোম্পানী যে জনা নব্বই সৈন্য নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করতে এসেছে সেটুকু সংবাদ তিনি রাখেন। তবে ভদ্র তাতে ভীত নন। এবং ভীত যে নন কিছুক্ষণের মধ্যেই ইংরেজ সেনাপতি তা দেখতে পেলেন। দূত ফিরে আসার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই প্রায় হাজার খানেক লোকের তিনটি দল ভেরী-পটহ-কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে এগিয়ে এল ইংরেজ বাহিনীর মোকাবিলা করতে। বেলা তখন প্রায় নটা বাজে।

লড়াই চলে বেলা দুটো পর্যন্ত। বহু মানুষের রক্তে সেদিন বরানগরে মাটি লাল হয়ে গেল। কলকাতার উপান্তের চওড়া মাঠে সেই পলাশীর যুদ্ধের ক্ষুদ্র সংস্করণের অনুষ্ঠানে হিংস্র বর্বরতা ও অমানুষিক নিষ্ঠুরতার এক জঘন্য উদাহরণ রেখে গেল ইংরেজ কাপ্তেন। তাঁর রিপোর্টে তিনি লিখেছেন—রামভদ্র সুরু করেছিল শেষ করলাম আমি। এবং ষাট জন গোরা যে কি করতে পারে সেদিন তা দেখিয়ে দিলাম। সত্যিই তাই। দেখালেন বটে রো। দেখালেন গোরা সৈন্য যত না লড়াই করতে পারে, তার চেয়ে ঢের বেশি পারে নিষ্ঠুর অত্যাচার চালাতে। বাড়ীতে আগুন লাগাতে। শান্ত, নিরীহ মানুষকে বিনা দোষে পুড়িয়ে মারতে। নির্লজ্জের মত তিনি লিখে গেছেন—'লেট হিম সি হোয়াট সিকসটি সোলজারস কুড ডু.... আই কিল্ড এ গ্রেট মেনি বিসাইডস হোয়াট ওএর বারনট ইন দেআর হাউসেস!'

তবে নিতান্তই আফশোসের কথা এভাবে ব্যারনী অত্যাচার করেও লড়াই জিততে পারেননি জন কোম্পানীর কাপ্তেন। বরানগরের বুক জুড়ে সেদিন রাতের অন্ধকার নামতেই রণক্ষেত্র ছেড়ে পিছিয়ে আসে কোম্পানীর ফৌজ। রো অবশ্য সাফাই গেয়েছেন যে এর কারণ জায়গাটার জল ছিল দূষিত। কিন্তু এই বক্তব্য যে ধোপে টেকে না তার প্রমাণ কোম্পানীর নিজেরই কাগজপত্র। তাতে স্পষ্টই রয়েছে এই ঘটনার সাতদিন পরেও কলকাতা কাউন্সিল সমান উদ্বিগ্ন, অধিকতর বিমর্ষ। দশই মার্চের রেকর্ডে তাঁরা স্বীকার করেছেন যে রামভদ্র তখনও সমানে শক্তিবৃদ্ধি করে চলেছেন। ব্যাপারটা এতই গুরুতর হয়ে উঠেছিল যে কলকাতার উপকণ্ঠের খৃষ্টান বাসিন্দারা উঠে এসে শহরে আশ্রয় নিয়েছিল। খৃষ্টান অধিবাসীরাই শুধু ভয় পায়নি খাস কোম্পানীও পেয়েছিল। এই সময়ে তারা সৈন্যবাহিনীতে নতুন করে চল্লিশ জন কালা বরকন্দাজকে ভর্তি করে।

কিন্তু এত সবের দরকার ছিল না। কেননা আমরা বাঙালীরা সুরুই করি, শেষরক্ষা করতে পারিনে। রামভদ্রও পারিলেন না। কয়েকদিনের মধ্যেই বোধ করি বার বার বরানগর লুণ্ঠন ও সাধারণ প্রজাদের ওপর ইংরেজদের অমানুষিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রামভদ্র ভেঙ্গে পড়লেন। জয়রামকে তিনি ইংরেজদের হাতে সঁপে দিলেন। অন্যান্য বন্দীদের ছেড়ে ছিলেন। অবশ্য একেবারে একতরফা হয়নি সন্ধিটা। বিনিময়ে ইংরেজদের বরানগর অবরোধ সরিয়ে নিতে বাধ্য করেন তিনি।

'কলিকাতার কথা'র লেখক এক জায়গায় লিখেছেন, 'রামভদ্র খুড়োর কথা বলিলে সেকালের নটিনীরা জ্বলিয়া উঠিত। তাহাতেই তাঁহাকে পুরাপুরি বুঝা যায়।' লেখক বোধকরি রামভদ্রের চারিত্রিক শিথিলতার কথা বলতে চেয়েছেন। এই কাহিনীটা একটু বিশদ হলে সেকালে উঠ্‌তি জমিদারদের তথা কলকাতার ভাবী বাবুদের গল্পটা সুরু থেকেই জমত। কিন্তু তার উপায় নেই।

আর উপায় নেই সঠিক বলার কে এই রামভদ্র? ইংরেজদের কাছে ডিহি কলকাতা, সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা এই কয়টি গ্রামের যে বিক্রি কোবালা আছে তার অন্যতম স্বাক্ষরকারী এক রামভদ্র। এই রামভদ্র গাঙ্গুলী বা চৌধুরীই কি কোম্পানীর সেরেস্তার চাকরী করে পরে তাদের নাস্তানাবুদ করেছিলেন বরানগরের মাঠে? কে জানে! রামভদ্রের কথা বলবার জন্যে কেউ নেই। কিছুই নেই প্রায়!

* * *

তবে কিছুটা সান্ত্বনার কথা, রামভদ্রের পরিচয় যথেষ্ঠ না থাকলেও গোবিন্দরামের খবর এর চেয়ে বেশ কিছুটা সংগ্রহ করা গেছে। আর যে যাই বলুক, জনকোম্পানীর বাঙালী কর্মচারীদের মধ্যে সুর্য্যের মত যিনি দেদীপ্যমান তিনিইত কুমোরটুলির গোবিন্দরাম মিত্র। বাঙালীদের নবযুগের সুচনার প্রাক্ মুহূর্তে তাঁকে মনে হয় ভোরের শুকতারা। কোম্পানীর কাছারিতে তাঁর চাকরিই শুধু সবচেয়ে বেশি-দিনের নয়। তাঁর বোলবোলা তাঁর দাপট সবাইকেই হার মানিয়েছে।

গোবিন্দরাম মিত্র

শীতের গঙ্গা। একটু আগেও ধোঁয়াটে কুয়াশার মত অন্ধকার চারিদিক ঘিরে ছিল। সকালটাই ছিল বিবর্ণ। তার মধ্যে দিয়ে ওঠা সূর্যটাকে অনেকক্ষণ অঝোরে কাঁদা একটা মেয়ের অপরিচ্ছন্ন মুখের মত দেখাচ্ছে। রোদ উঠেছে। কিন্তু তারও যেন তেজ নেই। তেজ নেই গঙ্গারও। নিস্তরঙ্গ শীর্ণ ভাগীরথীর বুকে মোচার খোলার মত কয়েকটা ডিঙি উদ্দেশ্যহীন ভাবে ভাসছে। আর গায়ে পিতৃ-পুরুষের শতছিন্ন কাঁথাটা চাপিয়ে ডিঙির মাঝি প্রাণের সুখে হুঁকো টানছে চোখ বুজে। তারও যেন আজ যাবার তাগিদ নেই। ভাসতে হয় ভাসছে।

অনেকটা এমনি উদ্দেশ্যহীন ভাবেই অপেক্ষা করছিল ছয়-জাহাজের বিরাট এক ব্রিটিশ বহর। অবশ্য তাদের উদ্দেশ্যহীনতার কারণ—উদ্দেশ্য-চরিতার্থের কোন উপায় তারা খুঁজে পাচ্ছিল না। জায়গাটার নাম ফলতা। কিছুটা দূরে সদ্য জেগে ওঠা গ্রামে মানুষজন তখনো খড়কুটোয় আগুন করে পোয়াচ্ছে। বাঁকের দু'দিকে রসভরা কলসী চাপিয়ে কর্মব্যস্ত শিউলিরা একটা খেজুর গাছ থেকে আর একটা খেজুর গাছের দিকে চলেছে দ্রুত পায়ে। আর গঙ্গার বুকে সেই 'ম্যান অফ ওয়ারে' বসে অ্যাডমিরাল ওয়াটসন, ভবিষ্যৎ বাঙলা দেশের দুর্যোগ-কুটিল নাট্যমঞ্চের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক কর্ণেল ক্লাইভ—সিলেকট কমিটির এঁরা দুজন সভ্য। আর প্রেসিডেন্টকেও না চেনবার কথা নয়। ইনি সেই বীরপুঙ্গব, যিনি নবাবী ফৌজের কলকাতা আক্রমণের সময়ে কাচ্ছা-বাচ্ছা, বৌ-ঝিদের নিরাপত্তাকে বিন্দুমাত্র আমল না দিয়ে চোরের মত

ঘাটের দরজা দিয়ে পালিয়েছিলেন ফোর্ট ছেড়ে। ইনি রোজার ড্রেক।

যাই হোক, সেই সাত সকালে সিলেক্ট কমিটির সভা বসেছিল। তিন মাথা এক করে রোজই চলে প্ল্যান—কাউন্টার প্ল্যান। তর্ক-বিতর্ক। উদ্দেশ্য—কলকাতা উদ্ধার। হৃত সম্মানের পুনরুদ্ধার। বাঙলায় ইংরাজ ব্যবসার পুনরুজ্জীবন। কিন্তু কিভাবে? অন্য পাঁচটা জাহাজে হাজারখানেক গোরা আর তার দেড়গুণ কালা সিপাহী। কিন্তু নবাবী ফৌজ কত? মানিকচাঁদ কলকাতার নিরাপত্তা কেমনভাবে গড়ে তুলেছেন? ফলতায় বহর নোঙর করেছে। কলকাতা থেকে ভাঁটায় বেশ কয়েকঘণ্টার পথ। মাঝে নবাবের বড় ঘাঁটি বজবজ। কলকাতার আরও কাছে মেটেবুরুজ। কিন্তু কোথায় কত ফৌজ? এই খবর পাওয়া যাবে কোত্থেকে? কাজেই শুধু আলোচনা। কিন্তু সিদ্ধান্তে আসা যায় না। ক্লাইভের হাত থেকে থেকে বোধকরি নিসপিস করে। কিন্তু একেবারে অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপ দিতে সিলেকট কমিটি রাজি হয় না! অথচ মাদ্রাজ ছেড়েছেন তাঁরা মাস-দুই হ'ল।

সেদিনও এমনি আলোচনা স্নুরু হয়েছিল। কিন্তু মাঝপথে সেটা থেমে গেল। জাহাজের একজন মাল্লা এসে ঘরে ঢুকল। 'বাউ' করে খবর দিলে সিলেক্ট কমিটিকে: 'একজন জেন্ট্ প্রেসিডেন্টের দর্শনপ্রার্থী। জরুরী দরকার আছে। হাটখোলা থেকে আসছে।' ক্লাইভ আর ওয়াটসন হাটখোলা চেনেন না। কিন্তু ড্রেক কলকাতার ঝানু মাল। বহুদিন এ দেশে কাটিয়ে গেছেন। তাঁর চিনতে কষ্ট হ'ল না। ক্যালকাটা থেকে আসছে। সুতানুটি-হাটখোলা। কে জানে, নতুন কোন সংবাদ আছে না কি? তাঁর কপিশ চোখে কৌতূহলের আলো জ্বলে উঠল, প্রেসিডেন্ট বললেন, 'ডাক তাকে, শো হিম ইন।'

এল। একটা খেঁকুরে মত লোক। আপাতত অত্যন্ত পরিচয়হীন অপদার্থ বলে মনে হয়। সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললে, ড্রেক সাহেবকে দেবার হুকুম আছে হুজুর। ড্রেক হাত

বাড়িয়ে বলেন, 'ইয়েস'। কাগজখানা এগিয়ে দিয়েই লোকটা তাড়া-খাওয়া ধূর্ত শেয়ালের মত দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সাহেবদের অবাক দৃষ্টি তাকে যতদূর দেখা গেল, ধাওয়া করে নিয়ে গেল।

রোজার ড্রেক অবশ্য ততক্ষণে চিঠিখানা খুলে ফেলেছেন। এবং সবিস্ময়ে দেখতে পেলেন, সেই সংক্ষিপ্ত চিরকুটে রয়েছে তাঁদের বহু আকাঙ্খিত সংবাদ—আলিনগরের সমরসজ্জার বিবরণ। সেই গোপন তথ্যটা হচ্ছে—কলকাতায় তখন ৩৩২জন অশ্বারোহী, ১১০০ বরকন্দাজ, ৫০০ পাইক ও পিয়ন ; থানায় (শিবপুরে) থানা দিচ্ছে তিন শ' পাইক ও পিয়ন ; থানার উল্টো দিকে ছয়টা কামান, থানায় নয়টা, হলওয়েল-এর বাগানে তিনটে, সুরমান সাহেবের বাগানে চারটে, গার্ডেনরীচে দুটো, গঙ্গার ধারে দুটা, গড়ের সামনে দুটো, ওয়াট সাহেবের বাড়ীতে দুটো, শেঠেদের ঘাটে দুটো, 'মারগাসের' ঘাটে দুটো, গঙ্গার ওপর জাহাজে চারটে কামান। এছাড়া শিবপুরের উল্টো দিকে রয়েছে তিনটে যুদ্ধ-জাহাজ। আর রয়েছে মাটি ভর্তি দুটো ছোট জাহাজ। এখানে বোমা ছোঁড়ার তালিম দেওয়া হচ্ছে।

এই 'ইনটেলিজেন্স' পেয়ে ক্লাইভ-ওয়াটসন-রোজার ড্রেক সম্ভবত নড়ে-চড়ে বসে থাকবেন। হয়ত বা হাতে স্বর্গ পেয়ে থাকবেন। বজবজের দুর্গ অরক্ষিত, এই খবরও তাঁদের কাছে দিনের আলোর মত স্বচ্ছ হয়ে গিয়ে থাকবে। তারিখটা বাইশে ডিসেম্বর। সতের শ' ছাপ্পান্ন। এর ঠিক এক সপ্তাহ পরেই হয় মানিকচাঁদের সঙ্গে ইংরেজদের বজবজের লড়াই। কাজেই, ইংরেজদের এই আক্রমণের পিছনে এই গোপন তথ্যের ভূমিকাটা একেবারে অপ্রয়োজনীয় নাও হতে পারে।

কিন্তু কে পাঠাল এই দারুণ জরুরী খবর ইংরেজ বাহিনীকে? ইংরেজদের এত হিতৈষী বন্ধুটাই বা কে? ইংরেজদের পুরনো নথিপত্রে রয়েছে: 'দি প্রেসিডেন্ট অ্যাকোয়েন্টস দি কমিটি ছাট ওয়ান অফ গোবিন্দরাম মিটারস পিপল হ্যাজ সেন্ট ডাউন অ্যান অ্যাকাউন্ট অফ দি স্ট্রেংথ্ অফ ক্যালকাটা থানা'…

এই খবরটা রয়েছে উইলসনের সংগৃহীত কোম্পানীর কাগজ-পত্রে। কিন্তু এই ঘটনার মানে এই নয়, গোবিন্দরাম ইংরেজদেরই একজন খয়ের খাঁ। পাদ্রী লঙ সাহেবের সঙ্কলিত সেকালের রেকর্ডপত্র থেকে দেখা যাচ্ছে, সাপ ও বেদের মুখে একই সঙ্গে চুমু খাবার ক্ষুরধার রাজনীতিতে মিত্তির মশায় ছিলেন বিশেষ পোক্ত। তাঁর কাছে ভালো-মন্দর মানদণ্ড সবই তাঁর নিজস্ব প্রয়োজনের বিচারে। সবাই ভালো, সবাই খারাপ।

এই দেখুন না, কলকাতা অধিকার করতে নবাবের লেগেছিল তিন দিন। আক্রমণ সুরু হয় ষোলই জুন। অধিকার করেন উনিশে। এবং দেখা গেল, অধিকারের অনতিকাল পরেই গোবিন্দরাম মিত্রের বাড়ি, তাঁর চুনের কারখানা—তার মালপত্র, সবকিছু রক্ষার জন্য পাহারা বসে গেছে। যাতে লুট-পাট না হয়ে যায়। লঙ অবশ্য স্পষ্ট করে বলেননি, কারা দিল এই পাহারা। ইংরেজরা তখন নিজেদের মাথা বাঁচাতেই ব্যস্ত। অপরের ঘর পাহারা দেবার কথাই উঠতে পারে না। তারা ছেলে বউ নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে 'জয় মা' বলে তরী ভাসিয়েছে। কাজেই কারা দিল এই প্রহরা? গোবিন্দরামের নিজের পাইক-বরকন্দাজ? সে ত সব জমিদারদেরই ছিল। তবে সেই দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে জমিদারদের নিজস্ব পাইক-পেয়াদরা তখনও বহাল ছিল কি না, সন্দেহের বিষয়। তাহলে কি পাহারা দিয়েছিল নবাবী ফৌজ? মনে হয় তাই। এই লুণ্ঠনের সময়ে নবাবী ফৌজ উমিচাঁদের বাড়ী-ঘর রক্ষা করেছিল, তার প্রমাণ আছে। দোস্ত উমিচাঁদকে ধরেই কি মিত্তিরজা এই আয়োজন করেছিলেন? হয়ত বা তাই।

তবে গোবিন্দরামের বাহবা এইখানে যে নবাবী ফৌজ উমিচাঁদের বাড়ি পাহারা দেবার অজুহাতেই তাঁকে কলকাতা লুণ্ঠনের ক্ষতিপূরণের যে বিরাট টাকা ক্লাইভ আদায় করেছিলেন মীরজাফরের কাছ থেকে তার কানাকড়িও ঠেকায়নি কোম্পানী অথচ মিত্তির মশায় ঠিকই কেটে বেরিয়ে এলেন, পকেটে টাকার গোছা গুনে। সে এক মজার গল্প।

পলাশীর লড়াই-এর আগে, মীরজাফরের সঙ্গে লম্বা গোপন চুক্তি হয় লর্ড ক্লাইভের। তাতে নানা ক্ষতিপূরণের অঙ্কের সঙ্গে কলকাতা আক্রমণের ক্ষতিপূরণের কথাটাও ছিল। কথা ছিল, কলকাতার কালা আদমিদের ক্ষতিপূরণ বাবদ বিশ লক্ষ টাকা দেবার। যেমন করেই হোক, সে খবর আর গোপন থাকেনি। ইংরেজ লড়াই ফতে করে নবাব মীরজাফর বাহাদুরকে গদিতে বসাতেই গোবিন্দরাম মিত্র, শোভারাম বসাক, রতন সরকার প্রমুখ শহর কলকাতার তাবড় তাবড় বাসিন্দারারা একে বারে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন, আমাদের ক্ষতিপূরণের টাকা কই? অনেক টালবাহানার পর ইংরেজরা ব্যাপারটা বিবেচনা করতে রাজী হ'ল। তেরজন নিয়ে হল একটা 'রেষ্টিটিউসন কমিশন'। এঁরা সবাই কলকাতার রহিস ব্যক্তি—বড়বাজারের শোভারাম বসাক, নয়নচাঁদ মল্লিক, দর্জিপাড়ার নীলমণি মল্লিক, রতম সরকার, হরেকৃষ্ণ ঠাকুর (?), দুর্গারাম দত্ত, রামসন্তোষ (পদবী জানা যায় না), দয়ারাম বসু আর শুকদেব মল্লিক। তিনজন ছিলেন সম্ভ্রান্ত মুসলমান—আলিজান ভাই, মহম্মদ সাদিক ও আইনুদ্দিন। এঁরা ছাড়া কুমোরটুলির গোবিন্দরাম ত ছিলেনই। কোম্পানীর রেকর্ডে কিন্তু হরেকৃষ্ণ ঠাকুরের নাম নেই। তাঁর জায়গায় আছেন দয়াকৃষ্ণ সরকার।

কমিশনের তদন্ত কি হ'ল আর না হ'ল কে জানে, দেখা গেল, দাবীদাওয়া কাটাকুটি করে সওয়া দশ লক্ষের উপর টাকা বিতরণ করল জন কোম্পানী। রতন সরকার, শোভারাম আর গোবিন্দরাম—এঁরা শুধু নিজেরাই টাকাটার ভাগ নেননি, নিজেদের আত্মীয়-স্বজনকেও বেশ কিছু পাইয়ে দিয়েছিলেন। গোবিন্দরাম ও তাঁর পুত্র রঘুনাথ দাবী করেন চার লক্ষ বার হাজার দু'শ' আশি টাকা পাঁচ আনা। কোম্পানী বাদ দেয় সাঁইত্রিশ হাজার দু'শ' আশি টাকা পাঁচ আনা। কাজেই তাঁদের মোট প্রাপ্তি ঘটে তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা। কালা আদমিদের মধ্যে এত টাকা কেউই পায় নি।

এ ছাড়াও মিত্তির মশায় তাঁব বার জন আশ্রিতকে আরও প্রায়

পঁচিশ হাজার টাকা পাইয়ে দেন। এত জন আশ্রিত আর কারও ছিল না। শোভারাম বসাকের ছিল এগার জন, রতন সরকারের মাত্র জনা তিন। গোবিন্দরামের আশ্রিতজনদের মধ্যে তাঁর কুলি কুড়োরাম বিশ্বাস পান চার হাজার টাকা। তাঁর তিনটি রক্ষিতা—রতন, ললিতা ও হররতন বিবি (কারও মতে মতি) পান যথাক্রমে আড়াই, দুই ও তিন হাজার টাকা। এঁরা ছাড়াও ছিলেন—রামকিশোর চক্রবর্তী, দুর্গারাম বেদসঙ্গা, দুর্গারাম সারামাত, নীলমনি চন্দ্র, হরিরাম ঘোষ এবং রামদেব ও শুকদেব মিত্র।

অবশ্য আশ্রিত জনদের টাকাটা আবার মুরুব্বিদের পকেটেই ঘুরে এসেছিল কিনা ভগবানই জানেন! অন্ততঃ এরকম একটা কথা মনে ভেসে ওঠা অন্যায় নয়। কেননা গোবিন্দরামের সূত্রে যাঁরা টাকা পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে চার বছর এমনকি দশ বছর আগে এন্তেকাল হয়েছে, এমন সব লোকেরাও রয়েছেন।

কোম্পানীর পকেটে হাত ঢুকিয়ে খোলামকুচির মত টাকা কুড়োলেও ইংরেজদের সাফ কথা বলতে কোনদিনই পিছিয়ে যাননি গোবিন্দরাম। পুরনো কলকাতার সেই 'গ্রেট ফেমিনে'র কথাই ধরুন। সতের শ' বাহান্ন। সরকারী নথিপত্রে অবশ্য নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রীর দ্রুত মূল্যবৃদ্ধির কথাই লেখা আছে। কিন্তু গোবিন্দরাম যে এই 'গ্রেট ফেমিনের' নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে গেছেন—জন কোম্পানীর কলকাতায় বাস করে, তাদের চাকরী করে, এবং তাদের রক্তচক্ষু মোটেই 'কেয়ার' না করে, একথা কি কেউ ভাবতে পারবেন?

এটা কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরোবার কাহিনী। কেন না, কোম্পানী কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট অনারেবল রোজার ড্রেক ব্ল্যাক কলেকটর গোবিন্দরামকে বললেন যে সে বছর দিশি জোতদাররা কোম্পানীর ধান জমির তালুক বেশ চড়া হারে ইজারা নেয় তার কারণটা কি সে সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট দিতে। মওকামত গোবিন্দরাম ব্যাপারটা বেশ খোলসা করেই বললেন: গত বছর ধান চালের দাম বেশি গেছে

কাজেব ধেনো জমির দাম বাড়বে সে আর বেশি কথা কি? নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির এত চড়া দাম গত ষাট বছরে কখনও হয়নি। এর ফলে—'মেনি অফ ইওর ইনহ্যাবিট্যান্টস হ্যাভ পেরিশড উইদিন দি টাউন উইথ হাঙ্গার'—শহরের বহু লোক ক্ষুধার জ্বালায় মারা গেছে। এই রিপোর্টে গোবিন্দরাম আরও একটা কথা বলেন, যেটা বিংশ শতকের কোন নেতার মুখেও বেমানান হবে না। 'ইফ ক্লথ ইজ ডিআর, এ পুওর মান মে পুট অফ দি বাইং অফ এ নিউ কোট আনটিল দি প্রাইস ফলস্; বাট ফর ভিকচুয়ালস, হোএন হাঙ্গার প্রেসেস, এভারিওয়ান মাষ্ট বাই ইফ হি হ্যাজ মানি টু পারচেজ ইট।' অর্থাৎ কাপড়-চোপড় মাগ্‌গী হলে গরীবগুর্বোরা দাম কমা পর্যন্ত হয়ত অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু খাদ্যের ব্যাপারে, যখন ক্ষুধার জ্বালা লাগে, তখন, যদি তার কেনবার টাকা থাকে, তখন মানুষ না কিনে পারে না। এই দুর্ভিক্ষের জন্য ইংরেজ কোম্পানী কিভাবে দায়ী, জিনিসের দাম চড়ার জন্যে কোম্পানী যে টাকার ছয় পাই করে 'সেলস ট্যাক্স' পেত, সেটার আমানত কিভাবে বেড়েছিল, সেই সাফ কথা সোজাসুজি লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন মিত্তিরজা। তাঁর হাত একটুও কাঁপেনি।

এই যে অপ্রিয় সত্য বলার জোর—এটা মিত্তিরজা বরাবর দেখিয়ে গেছেন। সেটা জন কোম্পানীর কর্তাদেরই হোক কিংবা জমিদার হলওয়েলকেই হোক। হলওয়েলের তাঁবে তাঁর চাকরী। কিন্তু তাকেও সত্য বলতে পিছপা নন গোবিন্দরাম। তাই দেখা যাচ্ছে, মনিব রালফ শ্লেলডনের মৃত্যুর পর নন্দরাম সেন পড়েছেন বিপাকে। আর হলওয়েল অভিযোগ আনলেন মিত্তির মশায়ের বিরুদ্ধে—তুমি বাপু ঠগ প্রতারক। কোম্পানীকে ডাহা ঠকিয়েছে। অতএব খাতাপত্তর দেখাও। হিসেব দাও। প্রেতচ্ছায়ার মত একরাশ অভিযোগ যেন গোবিন্দরামের চারিদিকে ব্যূহ রচনা করে দাঁড়াল। গোবিন্দরাম দেখেও দেখেননি। শুনেও শোনেননি। মোটেই ভ্রূক্ষেপ নেই। ভাব-

খানা এই, কি বাবা, এতকাল কি ঘুমুচ্ছিলে নাকি? হঠাৎ কুম্ভকর্ণের মত জেগে উঠেই বললে, এত ফাঁকি?

দিন যায়। মাস যায় যায়। বছর যায়। গোবিন্দরামের কোন হ্যাঁতক্যাঁতই নেই। অনেক পেড়াপীড়ি। অনেক চেঁচামেচি। অনেক আস্ফালন। শেষবেশ জবাব হল, বাপু হে, অত তরপাচ্ছ কেন? তুমিও চাকর, আমিও চাকর। তুমি জবাব চাইবার কে? মনিবে চাক, অর্থাৎ কলকাতা কাউন্সিল চাক, খাতা দেখাব। এইরকম দুঃসাহস দেখানর পেছনে কারণ ছিল। কাউন্সিলে গোবিন্দরামের মুরুব্বি ছিল। খুঁটি ছিল। দোস্ত ছিল। কাজেই গোবিন্দরামের আর কাউন্সিলের কনিষ্ঠতম পদাধিকারী জমিদার হলওয়েলকে অত তোয়াক্কা করার দরকারটা কি?

কিন্তু কথা আছে। ভেতরে-ভেতরে যাই থাক, বাইরে সাহেবরা খুবই কেতাদুরস্ত। তাদের কাছে নিয়মকানুনের একচুল ব্যত্যয় নেই। হলওয়েল গোবিন্দরামের ওজর কাউন্সিলের গোচরে আনল। কাউন্সিল কালক্ষেপ না করে হুকুম দিয়ে দিলে, ঠিক হ্যায়। রেকর্ড দেখাও। তোমার বিরুদ্ধে বাবু তহবিল তছরুপের অভিযোগ রয়েছে। দোষস্খালন করে তোমার সততার কি সাবুতি আছে দেখাও।' দেখাও ত দেখাও! গোবিন্দরাম মিত্রত কারও বাড়ির চাকর নয় যে বললেই অমনি হুকুম তামিল করে বলবে, 'বান্দা হাজির।'

যথা পূর্বং। মাস যেতে যেতে বছর ঘোরে। কাউন্সিল খোঁচা দিলে। এবং কয়েকবার এ ধরনের ঘটনা হওয়ার পর গোবিন্দরাম জাগ্রত হলেন। মুখখানা ব্যাজার করে বললেন, খাতা দেখাব কি, খাতা ত সব উড়ে গেছে। হাওয়ায় কাটা ঘুড়ির মত ভোকাট্টা। সেই যে হুজুররা, ঝড় হয়েছিল না, দি গ্রেট ক্যালকাটা সাইক্লোন—সতেরশ' সাঁইত্রিশ সালে—সারা কলকাতাই জলে ভেসে গেল নৌকা ঝড়ে ডুবে গেল, সারা শহর লণ্ডভণ্ড। কত লোকই না মারা গেল—হাজার ত্রিশ। তোমাদের গির্জের মাথা ভেঙে পড়ল, আমার ব্ল্যাক প্যাগোডা, অমন

নবরত্নের মন্দির—তার চুড়োই মাটিতে গড়াগড়ি। আর কয়েকটা অনিত্য কাগজপত্র, সেগুলো কি এমন ঈশ্বর-আশ্রিত বস্তু যে নষ্ট হয়ে যেতে পারে না ? বুঝুন, একবার 'ডিফেন্সে'র বহর।

মনে মনে হাসলেও, মুখে কলকাতা কাউন্সিলকে বলতেই হল, 'পারে। অবশ্যই পারে।' কলকাতার সেই সর্বনাশা ঝড়ের সঙ্গে কাউন্সিলের অনেক সভ্যেরই ব্যক্তিগত পরিচয় আছে। সে এক দুঃস্বপ্নের রাত্রি। কাজেই গোবিন্দরাম মিত্রের যুক্তি কাগজে-কলমে নাকচ করা শক্ত। অবশ্য কাউন্সিল একেবারে বেকসুর খালাস দিতে নারাজ। ভাবতে বসে গেল। একসময় বললে, আচ্ছা, না হয় তারপর থেকেই খাতা দেখাও। অর্থাৎ সতেরশ' সাঁইত্রিশের পর থেকে কলকাতা কাছারীর খাতা দেখতে চায় কর্তারা! কোম্পানী ভাবে। গোবিন্দরামও ভাবেন। একজন চাপান দেয় ত অপরে উতোর গায়। গোবিন্দরাম এইবার সখেদে বললেন, ছিল, হুজুর ছিল। কিন্তু এমন আমার কপাল, উই-এ সব পুরনো কাগজপত্র খেয়ে গেছে। 'উই-এর দেখ ব্যবহার, যা পায় তাই কেটে করে ছারখার।' না, হাসির কথা নয়। এখন আজগুবি শোনালেও, সেকালের খাস কোম্পানীর নথি-পত্রেই উই-এর এমনি ব্যবহারের গল্প রয়েছে। গোবিন্দরাম সব আটঘাঁট বেঁধে তবে না বলেছেন কথাগুলো। ভাবখানা এই : উই-এ কাগজপত্র কেন আসবাবপত্র খেয়ে ফেলেনি কলকাতায় ? সতেরশ' সাঁইত্রিশ সালে গড়ের সামনে যে গীর্জাটার চূড়া ভেঙ্গে গেল, তারই একটা প্রার্থনার জন্য কেনা 'অর্গান' কি উই-এ খেয়ে ফেলার নজির নেই কোম্পানীর খাতায় ? কোম্পানীর গুদামে দামী দামী ব্রোকেডই চলে গেল উই-এর গর্ভে। তবে আমার হিসেবের খাতাগুলো আর দোষ করল কি ?

হলওয়েল কিন্তু নাছোড়বান্দা। একটা এসপার-ওসপার করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এবং অচিরে ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠলো। হলওয়েলের ছকা গোবিন্দরামের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি লিখিতভাবে

দেওয়া হল মিত্রমহাশয়কে। জবাব দাও। অভিযোগ অবশ্য সেই একটাই—কোম্পানীর টাকা গায়েব করেছেন তিনি। কোম্পানী কখনও এইভাবে বলে না কথাগুলো। বলে, দিশি লোকদের বিরুদ্ধে অত্যাচার করে অর্থ আত্মসাৎ করেছ। কি রকম ব্যাপারটা? না, দেখ, তোমাকে কালা জমিদার হিসাবে কালা লোকদের কাছে বাজার বিলি করতে হয়। করার কানুন—'পাবলিক আউটক্রাই' বা নিলামে। পাবলিক প্লেসে বা সাধারণগম্য প্রকাশ্য স্থানে। কিন্তু গোবিন্দরাম নাকি তাঁর বাগবাজারের বৈঠকখানায় বসে তামাক খেতে খেতে কল্পতরু হয়ে, তাঁর আশ্রিতজনের কাছে এই প্রসাদ বিতরণ করেছেন। নামে-বেনামে কিছু কি আর নিজে আত্মসাৎ করেননি। বাইরের যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা অবশ্যই কবুল করেছেন মোটা সেলামী!

এহ বাহ্য। আগে কহ আর। হলওয়েল আরও বলেছেন—কোম্পানীর টাকায় মিত্তিরমশায় তার নিজের চাকর পুষেছেন। কলকাতা সংস্কারের জন্য বরাদ্দ টাকা গেছে তাঁর পেটে। তাছাড়া সেকালের কর্মচারীদের যে দোষ সবচেয়ে অমার্জনীয় বলে মনে করা হত—অথচ যে কাজ রাইটার থেকে গভর্নর—সকলেই কমবেশি নির্দ্বিধায় করে এসেছেন, সেই 'প্রাইভেট ট্রেড' বেশ ফলাও করে এসেছেন গোবিন্দরাম মিত্র।

গোবিন্দরাম খোলাখুলিই এর জবাব দিলেন। এমন জবাব যাকে লোকে বলে মুখের মত। বললেন, হ্যাঁ, তাঁর 'ফার্ম' আছে। এবং সে জন্য উপরআলাদের অনুমতি নেওয়া আছে। তা'ছাড়া বুকে হাত দিয়ে বলত বাপু, কে করে না এই কাজ? রাজা-মহারাজা দেওয়ান-জমিদার সবাই। সবাই। ঠগ বাছতে যে গাঁ উজোড় হয়ে যাবে বাছা! তাছাড়া, এসব না করে আমার উপায় কি বল। আমার একটা ইজ্জত বলে কথা আছে ত। লোক-লস্কর, পাইক-পেয়াদা, গাড়ি-পাল্কী না রাখলে জমিদারকে কেউ মানবে নাকি? তোমরা আর ক' গণ্ডা টাকা মাইনে দাও? উপরি আয় আমাকে করতেই হয়।

যাকে বলে 'প্লেন স্পিকিং'। সাফ জবাব। কিন্তু গোবিন্দরাম মিত্তির এবার ছাড়া পেলেন না। কালা জমিদারের চাকরীটা এবার চলে গেল। হলওয়েল তড়িঘড়ি তাঁর চাকরি যাবার হুকুমে সই দিয়ে দিলেন। ক্যাশ ভাঙার অপরাধে। কিন্তু সারা কাউন্সিল হাঁ-হাঁ করে উঠল। তা কি করে হয়? তা কি করে হয়? অমন একজন মানী ব্যক্তি! তাঁর এমন হেনস্থা! কাউন্সিল আবার চাকরী দিলেন গোবিন্দরামকে। তবে ঢিল যখন পড়েছে, কুটো না নিয়ে উঠবে না। কিছু গুনোগার দিতে হল মিত্তিরকে। তিন হাজার তিনশ' সাতানব্বই টাকা জমা দিয়ে দিলেন তিনি কোম্পানীর ট্রেজারীতে।

কিন্তু এত প্রতিপত্তির কারণটা কি গোবিন্দরামের? কাউন্সিল এত সমীহ করতই বা কেন? এ কি তাঁর টাকার খেলা? বাড়ির দোল-দুর্গোৎসবের সমারোহে সাহেব বন্ধুদের নিয়মিত নেমতন্ন? খানাপিনার এলাহী আয়োজন? ক্লারেট, স্যাক, মদিরার ছড়াছড়ি? সে সম্বন্ধে শপথ করে কিছু বলা দুষ্কর। তবে মিত্তিরজা, পয়সা করেছিলেন এবং করেছিলেন খুবই কম সময়ে, এটা ধারণা করা অন্যায় নয়। কেননা, অক্টারলোনী মনুমেন্টের চেয়েও যার উচ্চতা বেশি ছিল সেকালে, সেই ব্ল্যাক প্যাগোডা—নবরত্ন মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা কি গোবিন্দরাম নন? সেটা তৈরী হয় সতেরশ' ত্রিশ সালে। কাজেই তারই মধ্যে গোবিন্দরাম বেশ পয়সা করে ফেলেছিলেন। কথিত আছে এক সন্ন্যাসী এই কালীমূর্তির প্রতিষ্ঠাতা। 'পূর্বে এখানে নরবলি হইত বলিয়া প্রকাশ আছে।' যতদূর জানা যায় ব্ল্যাক জমিদারের চাকরী তিনি সতেরশ'বাইশে শুরু করেন। তাহলে মাত্র আটটি বছরেই তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করার মত বিপুল অর্থ আহরণ করেন! বেশ একটু তাড়াতাড়ি, অনেকটা রাতারাতিই ঘটেনি কি ধনসঞ্চয়?

স্বভাবতঃই অনেকেই সন্দেহ করতে পারেন, এই পয়সা চাকরী করে হয়নি। তাহলে অন্য পথটা কি? মনে হয় ব্যবসা। সতের শ'

একুশ সালের মে মাসে কোম্পানীর নীলামে কিছু দামী বিলিতি কাপড় কিনতে দেখা যাচ্ছে এক গোবিন্দরামকে। তিনি বেনারসী শেঠ, উমিচাঁদের সঙ্গে তিন গজ 'ব্রড ফাইন' কাপড়ও কিনেছিলেন উনিশ টাকায়। তাহলে কি কাপড়ের ব্যবসা? হতে পারে। তখন সুতানুটির বাজারে এটা একটা ভালো কারবার।

তবে পলাশীর যুদ্ধের আগে গোবিন্দরাম যে চুনের বড় কারবারী হয়ে পড়েছেন, কোম্পানীর নথিপত্রে তার প্রমাণ রয়েছে। সতের শ' একান্নর বাইশে মার্চ। গোবিন্দরাম মিত্তিরের কাছে এত্তেলা গেল। কোম্পানী ডেকে পাঠিয়েছে। কি ব্যাপার না, কাঠ চাই, ইট চাই, চুন চাই। কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ার রবিনস সাহেব দুদ্দাড় বাড়ি করছেন। ফোর্ট উইলিয়ম মেরামত করছেন। কাজেই 'বিল্ডিং মেটিরিয়ালস' চাই। গোবিন্দরাম বললেন, না, কাঠ বা ইট বাপু এখন পারব না। চুনটা দিতে পারি। একশ' মণ ঝিনুকের চুন আর একশ' মন শামুকের চুন যথাক্রমে সাতাশ ও তেত্রিশ টাকা মন দরে একটা 'কন্ট্রাক্ট' সই করে ফেললেন মিত্তির মশায়। তাঁর কাজকর্ম বেশ পাকা। 'এ্যাডভান্স'—অগ্রিম টাকাও নিয়ে নিলেন। বাকিটা জুনে। সইসাবুত্তি করে উঠে যাবার সময় মিত্তিরমশায় বললেন, কুলি ভাড়া?—তাও দিতে রাজী হল কোম্পানী। প্রতিদিন, লোক পিছু দুই কড়ি মজুরী। এই ধরনের ব্যবসা কোম্পানীর সঙ্গে হরবখতই করেছিলেন গোবিন্দরাম, এবং উঠতি শহর কলকাতার হাজার হাজার রাজার বাড়ি গড়ার কাহিনীর পিছনে, গোবিন্দরামের দু' পয়সা প্রাপ্তিযোগ ছিল। তাঁর অঢেল পয়সার অন্যতম উৎস বোধ করি তাই। এবং এ ছাড়াও প্রমাণ আছে যে শেষ বয়সে বিরাট নিমকমহল ছিল মিত্তিরজার। তাতেও পয়সার হৈ-গৈ ছিল না। এবং তাতে তাঁর অংশীদাররা ছিল ওয়ারেন হেষ্টিংসের দোস্তবাবুরা।

তবে এ'কথা নয়, কোম্পানীর কাছে গোবিন্দরাম কেবল 'দেহি

দেহি' করে চেঁচিয়েছেন। দরকারে তিনিও তাদের দিয়েছেন। তবে, ফেল করি মাখ তেল, তুমি কি আমার পর—গোবিন্দরামের সেই এক সুর! কলকাতার সামনে বিপদ। লড়াই হতে পারে। মিত্তি-রজাকে কোম্পানী হাতে ধরে বললে, পেরিনস গার্ডেনের সুরক্ষার জন্য সাত কাঠা জমি চাই। জমিটা গোবিন্দরামের। ওটা দিয়ে দাও। গোবিন্দরাম বললেন, অবশ্যই। অবশ্যই। নামমাত্র মূল্য। পঁচিশ টাকা কাঠা। সবনিয়ে একশ' পঁচাত্তর টাকা। কাপ্তেন মিনকিন জায়গাটা জরিপ করতে লেগে গেলেন।

কিন্তু গোবিন্দরাম কোম্পানীতে ঢুকলেন কবে? অনেকে বলছেন শহর কলকাতার জন্মের সেই উষালগ্নের কথা। যখন হুগলীর নবাবের হুমকির ভয়ে গঞ্জবাজার পুড়িয়ে একটা ব্রিটিশ জাহাজ সাত ঘাট ঘুরে ইংরেজ লোকলস্কর নিয়ে নামল সুতানুটির হাটে। দেশী হাটুরেরা এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। কাপ্তেন সাহেবটা বিচিত্র। কবে নাকি কোন রূপসী যৌবনবতীকে আগুনে সহমৃতা হতে দেখে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করেছিল। এবং অবাক কথা, মুঘল শাসকের রক্তচক্ষুকে মোটেই গ্রাহ্য করেনি। বিয়ে করেছিল মেয়েটাকে। তার ছেলেমেয়েদের বিলেত পাঠিয়েছিল। বড় বড় সাহেবদের ঘরে বিয়ে দিয়েছিল। এমনি বেয়াড়া। এমনি বেপরোয়া।

সেই বিশ্রি নিষ্ঠুর কঠিন লোকটার হোগলা ছাওয়া মাটির কুঁড়ের সামনে সপ্তদশ শতকের সেই অন্তিম মুহূর্তে একটা দৃপ্ত তরুণ এসে দাঁড়াল। ফুটফুটে রঙ। চটপটে চলনবলন। ফার্সী জানে। ইংরিজী ও কি জানে—ইয়েস নো? কে জানে? মেজাজী কুঠিয়ালের ভালো লেগে গেল গোঁফের সদ্য রেখা ওঠা তরুণটিকে। ঝপ করে চাকরি দিয়ে ফেললেন কোম্পানীর খাস দপ্তরে। ষোলশ ছিয়াশি-সাতাশি। কুঠিয়াল আর কেউ নয়, কলকাতার প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা যাঁকে দেওয়া হয়—সেই জব চার্নক। আর তরুণটি আমাদের এই গল্পের নায়ক—গোবিন্দরাম মিত্র। ব্যারাকপুর চানকে তাঁদের আদি বাড়ি। তাঁরা

এখনকার ফোর্ট উইলিয়ম যেখানে গড়ে উঠেছে সেই গোবিন্দপুরে উঠে এসে বসত করেন। অনেকে বলেন, তাঁর নামেই গোবিন্দপুর। এটা নিছক অনৈতিহাসিক কথা। বরঞ্চ গোবিন্দপুরে জন্মেছিলেন বলে তাঁর নাম—গোবিন্দরাম, হলেও হতে পারে।

খুঁটিয়ে দেখলে গোবিন্দরামকে কোম্পানীর দপ্তরে চাকরি দিয়েছিলেন চার্ণক—এ তথ্যটা ঠিক নয়। কেননা সতেরশ' থেকে সতের শ' কুড়ি সালের কোম্পানীর যেসব নথিপত্র সি-আর-উইলসন সাহেবের কল্যাণে আমাদের হাতে এসেছে, তাতে ভুলেও কোথাও মিত্তিরজার নাম নেই। এছাড়াও কথা আছে। স্টার্নডেল সাহেব বলছেন, তাঁর এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় নিকলস ওয়েলর সতেরশ' বাহাত্তর-তেয়াত্তর সালে মেদনমল্ল পরগণায় গোবিন্দরাম মিত্র ও অন্যান্যদের সঙ্গে যৌথভাবে লবণের ব্যবসা করেছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের মেহেরবাণীতে। কাজেই চার্ণকের কাছে চাকরী নিলে গোবিন্দরামের বয়স তখন একশ' পেরোতে হয়। সেটা কেমন অবিশ্বাস্য মনে হয় না কি? এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা পরে করা হবে। কিন্তু এই সমস্যায় নিশ্চিত আলোকপাত করতে পারে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত কোম্পানীর সমসাময়িক সব নথিপত্র। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেগুলি এখনও এদেশে দুর্লভ।

তবে গোবিন্দরামের বাবার নাম রত্নেশ্বর। ঠাকুরদা হংসেশ্বর। পুত্র রঘুনাথ। জ্যেষ্ঠ পৌত্র রাধাচরণ। এঁরই জালিয়াতির মামলায় ফাঁসির হুকুম হয়। পরে অবশ্য কলকাতার বহিস ব্যক্তিদের 'গণ দরখাস্তের' ফলে সেই হুকুম মকুব হয়ে যায়। রঘুনাথ জন কোম্পানীতে চাকরি করেননি। তিনি কাজ করতেন মুর্শিদাবাদের দরবারে। রাধাচরণের মুক্তির জন্যে স্বয়ং নবাব বাহাদুর জন কোম্পানীকে যে আবেদন করেন তাতে রঘুনাথকে তিনি তাঁর আপন বিশ্বস্ত কর্মচারী বলে উল্লেখ করেন।

সেকালের এক তরজা গানে কলকাতার আটবাবুদের প্রসঙ্গে গোবিন্দরাম মিত্র সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

'কালো দেশের কালো মানুষ কালো জমিদার,
গোবিন্দরাম মিত্রি আনে জুড়ি গাড়ীর বাহার ॥'

পুরনো কলকাতায় আরও একটা ছড়া কাটা হত :—

বনমালী সরকারের বাড়ি,
গোবিন্দরামের ছড়ি।
উমিচাঁদের দাড়ি,
হুজরীমলের কড়ি।

এই ছড়াটার আবার রকমফেরও আছে—

নন্দরামের ছড়ি,
উমিচাঁদের দাড়ি,
হুজুরিমলের কড়ি,
আর গোবিন্দরামের গাড়ি।

শেষ ছড়াছুটো থেকে ছড়িটা কার—নন্দরামের না গোবিন্দরামের তাই নিয়ে লড়াই লেগেছে। আসল সত্যটা মনে হয় ছুটোর মাঝামাঝি। জন কোম্পানীর রাজত্বের আদ্যিকালে দিশি লোকজনের মাথায় ছড়ি ঘোরানর ট্রাডিশন মৌলিক কায়স্থ নন্দরাম সেন মশায় সুরু করেছিলেন। আর গোবিন্দরাম সেটা কালো দেশের কালো মানুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। সেই সোনা-বাঁধান ছড়ি খাস গোরা সাহেবদের মাথার ওপরও ঘুরিয়েছিলেন তিনি। তাঁর জবরদস্ত জমিদারগিরি অনেকেই সমীহ করে স্বীকার করত। চোর-ডাকাতরা থেকে গোরা সাহেবরাও। আসলে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি যে 'ডেসপারেট,' 'ডিফায়েন্ট' বাঙালীরা ধূমকেতুর মত উদয় হয়ে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে অগ্নিবৃষ্টি করেছিলেন, গোবিন্দরাম বোধকরি তাঁদেরই আদিপুরুষ।

তবে জুড়ি-গাড়ির বাহারও যে গোবিন্দরামের অপ্রতুল ছিল না, তাও মিথ্যে কথা নয়। গোবিন্দরামের বাড়ি দুর্গাপূজায় নাক জুবরে খাননি, এমন সাহেব কটা ছিল কলকাতায়? কি তার সমারোহ।

কি তাঁর বোলবোলা। দোল-দুর্গোৎসবের মধ্যে বাঙালী ভোগ করতে চাইছে, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে—বাঙালী জীবনের সেই সুরও গোবিন্দরাম সুরু করে দিয়েছিলেন। অনেক কিছু দিয়েই গোবিন্দরাম একজন পথিকৃৎ পুরুষ। সন্দেহ নেই।

* * *

কিন্তু দুঃখের কথা গোবিন্দরামের জন্যে নেই কোন মিস কলেট। তাঁর সুবিপুল কর্মকাণ্ড, তাঁর দীর্ঘজীবনের একটা মোটামুটি হদিশ-দেওয়া কোন জীবনীও উত্তর কালের জন্য কেউ রক্ষা করে যায়নি—না সেকালের কোন সমাজসচেতন লেখক না তাঁর নিজের বংশধররা। এদিক দিয়ে যেমন নন্দরাম সেন তেমনি গোবিন্দরাম মিত্র দুজনেই সমান মন্দভাগ্য।

তবে একেবারে নেই বললে সত্যের ব্যত্যয় হয়। নন্দরামের যেমন জীবনী উল্লেখ করেছি তেমনি গোবিন্দরামেরও একটা সংক্ষিপ্ত নিরানব্বই পাতার ইংরাজীতে রচিত জীবনী আছে। নাম—এ্যান এ্যাকাউন্ট অব দি লাইফ অফ গোবিন্দরাম মিটার—নায়েব জমিন্দার ইন মিঃ হলওয়েলস ডেস, এণ্ড অফ হিজ ডিসেন্টডেনট্‌স্ ইন ক্যালকাটা এণ্ড বেনারস। রচয়িতাঃ এ মেম্বার অফ দি ফ্যামিলি। রচনাকাল আঠার শ' উনসত্তর।

কিন্তু থেকেও নেই। এই নিরানব্বই পাতার মাত্র সাতপাতা গোবিন্দরাম সম্বন্ধে। এবং এই দুর্লভ গ্রন্থটির কথা বহুলোকের মুখে শোনা গেলেও, কোথাও কোথাও উল্লিখিত হলেও বইটি এখানে পাওয়া যায় না। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর কল্যাণে তার একটি জেরেকস কপি সংগ্রহ করে পরিশিষ্টে রসিক পাঠকদের জন্য জুড়ে দেওয়া গেল। কিন্তু তার আগে বইটা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

গোবিন্দরাম মিত্রের জীবনী

গ্রন্থটি সম্বন্ধে পরবর্তীকালে সম্ভবতঃ প্রথম উল্লেখ করেন আর-সি-সটার্নডেল তাঁর 'হিসটরিক্যাল এ্যাকাউন্ট অফ দি ক্যালকাটা কালেকটরেট' নামীত চটি বইখানার পাতায়। সাহেব গোবিন্দরামের এই জীবনীর দুটি ত্রুটি ধরিয়ে দিয়েছেন—গোবিন্দরামের জন্ম আর আর মৃত্যুসাল সম্বন্ধে। সাহেবের মতে দুটোই ভুল।

এই দুষ্প্রাপ্য জীবনীতে গোবিন্দরামের কোন জন্মতারিখ নেই। তবে পরোক্ষ উল্লেখ আছে: In about 1686-87 or 1093 B. E., Govindram Mitter was brought to the favourable notice of Mr. Job Charnock....অন্যত্র আবও রয়েছে Govindram Mitter lived to a good old age of about 80 years, leaving his only son, Raghunath Mitter, to succeed him, in about 1766 or 1173 B. E.

এই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আগের অধ্যায়ে করা হয়েছে। এখন সেটা আরও বিশদভাবে করা যাক। প্রথম কথা হচ্ছে ইংরাজী সতেরশ' ছেষট্টি সালে আশি বছর বয়সে গোবিন্দরামের যদি দেহান্ত হয়—তাঁর জন্মসাল দাঁড়ায় ষোলশ ছিয়াশি। জন্মেইত আর ভগবান শুকদেবের মত গোবিন্দরাম জব চার্ণকের চাকরী নিতে যাননি। ধরা যাক, বছর আঠার বা কুড়ি বছর বয়সে 'এডুকেটেড, ইনটেলিজেন্ট এ্যাণ্ড এ্যাকটিভ ইংম্যান' গোবিন্দরাম কলকাতায় ইংরাজ কুঠীর প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণকের কাছে চাকরীর জন্যে হাজির হয়েছিলেন। তা'হলে সতেরশ' ছেষট্টিতে তাঁর বয়স হয় প্রায় শ'খানেক বছর। সেটাও

আপাতঃদৃষ্টিতে বিশ্বাস করা কঠিন। তা'ছাড়াও কথা আছে। স্টার্নডেল তাঁর কালেকটরীর কাগজপত্র থেকে একটা মোক্ষম দলিল হাজির করেছেন যাতে দেখা যাচ্ছে সতেরশ' বাহাত্তর-তেয়াত্তর সালে গোবিন্দরাম কাপ্তেন নিকলস ওয়েলারের সঙ্গে লবণ গোলার কণ্ট্রাকটারী করেছেন খাস গবর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের আনুকূল্যে। সাহেব লিখেছেন....and on his (Nicholas Weller's—লেখক) return in 1772 obtained, no doubt through the favour of Warren Hastings, in partnership with Govindram and others the valuable salt contracts, the grant of which formed one of the grounds of the virulent attack made upon the Governor General by Francis, Clavering and Monson. এই কাপ্তেন ওয়েলার ছিলেন কলকাতার যুদ্ধের পলায়িত নায়ক। তিনি শিয়ালদহের কাছে নবাবী ফৌজের সঙ্গে ইংরেজদের প্রথম চোটে যে মোকাবিলা হয় তাতে সাংঘাতিকভাবে আহত হন এবং বিলেত চলে যান। ফিরে আসেন হেস্টিংসের সঙ্গে।

সেই যাই হোক, সতেরশ' বাহাত্তরে গোবিন্দরামের লবণ গোলার কারবার করার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কেননা, স্টার্নডেল সাহেব মেয়রস কোর্টের পুরনো কাগজপত্রে রক্ষিত গোবিন্দরাম মিত্রের কাছ থেকে বকেয়া পাওনা চুক্তির চব্বিশ হাজার সাতশ' তেত্রিশ সিক্কা টাকার একটা রসিদ উল্লেখ করছেন। এই ওয়েলার সাহেব আবার স্টার্নডেলের আত্মীয় এবং এই লবনগোলার কারবারে তার অংশীদাররা ছিলেন—গোবিন্দরাম মিত্র, বলরাম মিত্র, ভূকৈলাশের রাজবাড়ীর আদিপুরুষ জয়নারায়ণ ঘোষাল ও রাধাকৃষ্ণ দত্ত। কারবারটা ছিল পরগণা মেদনমল্লে। আগের পরিচ্ছেদেও এ' সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

ব্যাপারটা তা হলে এই দাঁড়াচ্ছে যে তরুণ গোবিন্দরাম জব

চার্ণকের চাকরী করেছিলেন—এই ঘটনাটা খোপে টিকছে না। এবং এই জীবনীতে যে বলা হচ্ছে যে জীবন এবং সম্পত্তির কোনরকম নিরাপত্তা না দেখে ষোলশ' সাতাশি সাল নাগাদ গোবিন্দরাম তাঁর বারাকপুর চানকের পৈতৃক বসতবাটি সরিয়ে এনে কেল্লার কাছে গোবিন্দপুরে বসবাস করতে সুরু করেন এবং তাঁর নামেই গোবিন্দপুরের নামকরন হয়—এই তথ্যও ভ্রান্ত। কেননা, এই সময়ে গোবিন্দরামের বাস্তুভিটে সরিয়ে আনবার মতন বয়স হবার কথা নয় এবং তাঁর নামে একটা পত্তনের নামকরণ হবার মত কেওকেটা তখন তিনি কোন-মতেই হতে পারেন না। এমনকি ষোলশ' পঁচানব্বই সালেই গোবিন্দরাম কুমোরটুলিতে পাকাপাকি বসত করেন বলে যে দাবী করা হচ্ছে, তাও কতটা যুক্তিসহ, সেটাও ভেবে দেখা দরকার।

এই সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থে গোবিন্দরামের দাক্ষিণ্যে নির্মিত কলকাতার গ্রেট জেলের কাছে মহাদেবের একটি মন্দিরের উল্লেখ আছে। বইটির প্রকাশসময়ে—আঠারশ' উনসত্তর সালে নাকি মন্দিরটির ভগ্নদশা। কিন্তু সতেরশ' ত্রিশ সালে তৈরী গোবিন্দরামের বিখ্যাত নবরত্ন মন্দিরের দেবতাও মহাদেব শিব। জীবনীকার এ' সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। এর সর্বোচ্চ চূড়াটি অকটরলোনী মনুমেন্টকেও ছাপিয়ে যেত। জোড়াবাঙ্‌লো ধরনের গঠন মন্দিরের। সবচেয়ে ছোট চূড়াটি আঠার শ' উনসত্তরে বর্তমান ছিল। চিৎপুর রোডের ওপর এই মস্ত মন্দিরের দেবতা ছিলেন চার মহাদেব। এ'ছাড়াও গোকুলচন্দ, রাধিকা, বলদেব, লক্ষ্মী ও শালগ্রামের সেবা হ'ত সেখানে। এই সব দেবতার সেবার জন্যে গোবিন্দরাম, তাঁর জীবনীকারের মতে, দমদমের কাছে তাঁর প্রভূত লাভজনক জমিদারী পরগণা কেষ্টপুর লিখে দিয়ে যান। এর সরকারী খাজনা লাগত বছরে একশ' টাকা। এছাড়াও দেবতাদের জন্যে মিস্তিরজা সোনারূপার চৌকি, পদ্মাসন, বিছানা, বাসন, নৈবেদ্যের থালা গ্লাস এবং প্রতি দেবতাদের জন্য নানা মণিমাণিক্যের গহনা তৈরী করিয়েছিলেন যার মূল্য সেকালের বাজারে পঞ্চাশ হাজার টাকার কম নয়।

এই প্রসঙ্গেই গোবিন্দরামের দুর্গাপূজার বিবরণ রয়েছে। এবং এই বর্ণনার সঙ্গে হলওয়েলের লেখা সেকালের কলকাতার দুর্গাপূজার উৎসবের হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে অবশ্য পরে আলোচনা করা হবে (পরিশিষ্ট)। তবে কুমোরটুলির গোবিন্দরামের ঠাকুরের সঙ্গে অন্যান্য প্রতিমার মস্ত তফাৎ—অন্যান্য দেবপ্রতিমার গায়ে হরতাল বা হলদে রঙ মাখান হ'ত, গোবিন্দরাম সোনার বা রূপোর পাত দিয়ে তাঁর দেবতার দেহ ঢেকে দিতেন। সিংহারূঢ়া দেবী অসুর নিধনে তৎপর, সঙ্গে লক্ষী, সরস্বতী, মহাদেব, গণেশ, কার্তিক এবং রামচন্দ্র। একালের দুর্গাপূজায় রামচন্দ্র থাকে না। সেকালে কিন্তু থাকত। সেকথা এই জীবনীকার বলেছেন, বলেছেন হলওয়েলও। এঁরা সবাই স্ব স্ব বাহন সঙ্গে করে এক একটা আলাদা কুঠরীতে থাকতেন! এবং পূজার সময়ে তাঁদের আবার পাঁচটা কামরায় তৈরী রূপোর সিংহাসনে বসান হ'ত।

আর গোবিন্দরামের পূজার নৈবেদ্য? বলাবাহুল্য, এলাহী ব্যাপার। দেবী দুর্গার জন্য কাঁসার থালায় যে প্রধান নৈবেদ্য করা হ'ত তাতে চাল থাকত ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ মণ! অন্যান্য নৈবেদ্য ত সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায়!

আর একদা—নবমী নিশি পোহাল। পূজা শেষে বিসর্জ্জনের বাদ্যি বাজে। গঙ্গা বক্ষে সমর্পন করার আগে প্রতিমাগুলি নিয়ে যাওয়া হয় বহুবিচিত্র মহাপায়া, চন্দোলা, পাল্কী বা নাল্কীতে করে গঙ্গার ঘাটে। কিন্তু আগের কথা আগে। বোধন থেকেই পূজার সুরু। পক্ষকাল ধরে পূজার সমারোহ। কলকাতা বা দূর দূর দেশ থেকে কমসে কম এক হাজার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসতেন বিদেয় নিতে। এ'ছাড়াও ছিল বাইজীর নাচ। হতে পারে সেই রাজনর্তকী কোন নিকি, আশরুণ, হিঙ্গল, কি কোন সুপনজান, কে জানে। কিন্তু সে পর্ব ত সেই সারা দেবীপক্ষটা ধরে।

দুর্গাপূজা করেই ক্ষান্তি দিতেন না গোবিন্দরাম। হলেনই বা তিনি

শৈব। ঘটা করে কালী পূজো হ'ত তাঁর কুমোরটুলির পঞ্চাশ বিঘের বিস্তৃত প্রাসাদে। দেবী কালিকার সোনা রূপো জড়োয়া গহনারই দাম ছিল হাজার তিনেক টাকা। আর মিষ্টান্ন প্রসাদ বিতরণ হ'ত— সেও শ'দুই মণ। তাঁর চরিতকার তাই বলছেন।

গোবিন্দরাম যে শুধু পরলোকের দিকেই চেয়ে থাকবার মানুষ নন, ইহকালের সকল ঐশ্বর্য-বৈভব আকণ্ঠ তৃষায় যে পান করেছিলেন তিনি, এই কেতাবে তারও ইঙ্গিত আছে। আছে তাঁর রঙমহলের, নন্দন বাগানের কথা। রঙমহল ছিল তেতলা বাড়ী। চীনে পোরসিলেন ইটের গাঁথা। আর সেখানে প্রতিটি সন্ধ্যায় কোন রূপসী বাইজীর নৃত্যপরা ঘুঙুরের বোলে, তার সুরেলা কণ্ঠের আশ্চর্য মোহময় বিস্তারে কুমোরটুলির অষ্টাদশ শতকের মধ্যরাত্রি যে বিহ্বল হয়ে উঠত, সে কথা কি বলার অপেক্ষা রাখে?

কিন্তু এর চেয়ে আরও মনোরম তাঁর নন্দন বাগান। এখন যার খানিকটা জায়গা জুড়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দোতলা বাড়ীটা। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে, অনেক অনেক তদ্বির তদারক করে, তাঁর সেই সখের বাগান গোবিন্দরাম মারাঠা খালের পশ্চিমে অর্থাৎ শহর কলকাতার সীমানার মধ্যে টেনে এনেছিলেন। সেকালের—সতেরশ' সাতান্নর সরকারী একটা পুরনো ম্যাপে গোবিন্দরামের বাগানের পাশেই দেখা যায় উমিচাঁদের বাগান। একেবারে যমজ ভাই!

সে যাই হোক, গোবিন্দরামের এই নন্দন বাগানে ভোগবিলাসের আয়োজন কিছু কম ছিল না। জীবনীকার লিখেছেন, সেই সুবিস্তৃত উদ্যানের প্রধানতম শোভা ছিল বিরাট দুটি দিঘী। তাদের প্রত্যেকটিতে একটি করে জলটুঙ্গী ঘর। যেখানে সেকালের কলকাতার প্রাণান্তকর দাবদাহের জ্বালা জুড়াতেন কলকাতার কালা জমিদার। এ ছাড়াও ঐ বাগানে ছিল চৌকশ একটা বৈঠকখানা, একটা কৃত্রিম পর্বত এবং তমালতালী বনরাজী শোভা। প্রসঙ্গত, এই গ্রন্থে আর একটা নতুন খবর আছে। মারাঠা খালের সঙ্গে গঙ্গার সংযোগ ছিল

সেকালে বাগবাজারের কাছে একটা 'স্লুইশ' গেট দিয়ে। গঙ্গার জোয়ারের টাটকা জল দিনের মধ্যে একবার করে মারাঠা খালে ঢুকত। আর তাই দিয়ে কলকাতার লোকেরা তাদের পুকুর ভরে নিত। কুয়ো ভরে নিত। তবে নন্দন বাগানের দুই সুবিশাল দীর্ঘিকার জন্যও সেই ব্যবস্থা ছিল কিনা, এই কেতাবে তার উল্লেখ নেই।

গোবিন্দরামের জীবনীতে যে দিকটা উহ্য রয়ে গেছে সেটা হলওয়েল সংবাদ। হলওয়েলের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ বোধ করি বাঙালী অফিসারের সঙ্গে সাহেবের লড়াই-এর প্রথম ঘটনা। এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর আমরা যতটা খোলাখুলি তা নিয়ে আলোচনা করতে পারছি, স্বাভাবিক কারণেই সেকালে গোবিন্দরামের জীবনীকারের (যিনি সরকারী কাছারিতেই কাজ করতেন) পক্ষে তা' সম্ভব ছিল না। এই গ্রন্থে শুধু এই টুকুই বলা হয়েছে যে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজরা জেতবার পর গোবিন্দরাম কলকাতার ডেপুটি ফৌজদার অফ পুলিশ নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই সম্বন্ধে 'আঠারশ' উনপঞ্চাশ সালের বারই জুলাই-এর 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' কাগজের উল্লেখ আছে। তাতে বলেছে সতেরশ কুড়ি সালে গোবিন্দরাম নায়েব—জমিদার পদে নিযুক্ত হ'ন। হলওয়েল সাহেব তাঁকে বলত ব্ল্যাক ডেপুটি। কাগজের সংবাদে বলা হয়েছে যে ঐ বছর থেকেই শহর কলকাতার রাজস্ব, ভূমিরাজস্ব, একচেটিয়া ব্যবসা ও বিভিন্ন ফার্ম (তালুক ?) সব কিছুর ভার একজন সিবিল সার্ভিসের সভ্যের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে এবং বছর বছর নতুন লোক ঐ পদে নিয়োগ করা হয়। আসলে কিন্তু কলকাতার শাসন ব্যবস্থার জন্যে সুরু থেকেই যে কাউন্সিল থাকতেন, তাঁদেরই কনিষ্ঠতম সভ্য দেখতেন কলকাতার জমিদারী। তাঁদের পদের নামই ছিল জমিদার। এসব কথাত আগেই বলা হয়েছে। তবে বছর বছর কেন, বছরে বার দুই কি তারও বেশি নতুন লোক আসত জমিদার হয়ে। কেননা কাউন্সিলের অন্যপদ খালি হলেই জমিদার সাহেব প্রমোশন পেতেন আর কোম্পানী তার জায়গায় নতুন লোক নিয়োগ করতেন।

কিন্তু ব্ল্যাক ডেপুটির বেলায় তা' হ'ত না। তিনি বহালতবিয়তে রয়ে যেতেন—অন্ততঃ গোবিন্দরাম তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছরেরও বেশি এ পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন এবং সেই কারণেই কলকাতার বিশেষ করে কালা বাসিন্দাদের ওপরে তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম। এবং জন জোফানিয়া হলওয়েলের তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগটা ঠিক এইখানেই। তিনি বলতে চাচ্ছিলেন যে প্রচণ্ড ক্ষমতাসম্পন্ন এই পদে অতিদীর্ঘকাল ধরে থেকে তিনি দু'হাতে নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়েছেন। অনেকেই তাঁর অত্যাচারে এত ভীত যে কোন রকম প্রতিবাদ করতে সাহস করত না; আর তাঁর 'করাপসন' ও অত্যাচারের রথচক্র চলত দুর্বার গতিতে। হলও-য়েলের বিখ্যাত 'Tracts'-এ রয়েছে 'Such was the tyranny of this man, and such the dread conceived of him in the minds of the natives that no one durst complain or give information against him, however, oppressed' অর্থাৎ—এমনি ছিল ভদ্রলোকের অত্যাচারের বহর এবং এমনি ছিল তাঁর সম্বন্ধে কালা আদমিদের মনে ভীতি যে যতই অত্যাচারিত হোকনা কেন, তাঁর বিরুদ্ধে কোন রকম অভিযোগ করতে বা খবর দিতে সাহসই করত না কেউ।

অবশ্য হলওয়েল নাছোড়বান্দা। তিনি দ্বিতীয়বার বিলেত থেকে আসবার সময়ে ব্যবস্থাপত্র সব পাকা করে এসেছিলেন। সতেরশ' বাহান্ন সালের জানুয়ারী মাসে ফোর্ট উইলিয়মের কাউন্সিল অব মেম্বরস এর কনিষ্ঠতম—দ্বাদশতম পদটিতে তিনি বৃত হলেন। অর্থাৎ সেই জমিদার যে পদ একদা রালফ্ শ্লেলডন বা বেঞ্জামিন বাউচার অলঙ্কৃত করেছিলেন তাতে বসলেন হলওয়েল। তবে হলওয়েলের বেলায় নতুন দুটি শর্ত। এঁর কোন 'প্রমোশন' হবে না এবং খাস লিডেনহল স্ট্রীটের হুকুমৎ ছাড়া তাঁকে সরানো চলবে না। অর্থাৎ এতাবৎকাল যে সাদা জমিদার কথায় কথায় পাল্টে যেত এবং কালা জমিদার একনাগাড়ে রাজত্ব করত—সেই ব্যবস্থাটা আগেভাবেই রদ করে

রাখলেন হলওয়েল। হলওয়েল বলছেন, যে এর আগে যখন তিনি মেয়রস কোর্টের দণ্ডমুণ্ডের মালিক ছিলেন তখনই তিনি এইসব দেশী ফন্দিফিকিরের হালহদ্দ আন্দাজ করেই নিয়েছিলেন। কাজেই আসর তো পাতাই ছিল। হলওয়েল চোখ কান বুজে সোজা গাইতে লেগে গেলেন। এ সব কিছু কথা ত আগেই বলা হয়েছে। এখানে নতুন কিছু খবর কেবল জুড়ে দেওয়া হল।

কয়মাস যেতে না যেতেই, তেরই আগষ্ট গোবিন্দরামের বিরুদ্ধে এক লক্ষ একষট্টি হাজার সাতশ' নয় টাকা পনের আনা ছয় পাই-এর দাবীর একটা ফিরিস্তি নিয়ে এলেন, তার বিবরণ অনেকটা এই রকম :

		টা.	আ.	পা.
স্বনামে রক্ষিত তালুকগুলির জালিয়াতির দরুণ	—	৩২৮১৩	১৫	৬
ভৃত্যাদি মাসিক খরচের " "	—	৫৫৭৭৬	০	০
কাছারী মেরামতের হিসাবে " "	—	৩৯২০০	০	০
কলকাতার রাস্তা মেরামতের হিঃ " "	—	৩৩৬০০	০	০
কোতোয়ালী বাড়ীর রক্ষকের হিঃ " "	—	৩২০	০	০
একুনে	—	১,৬১,৭০৯	১৫	৬

এই মোটা টাকার দাবী দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না হলওয়েল। দেখা যাচ্ছে সতেরই আগষ্টের পত্রে আরও কিছু টাকা দাবী করছেন তিনি। এগুলি শুধু কোম্পানীর নিজস্ব পাওনা নয়, এতে অপরের পাওনা টাকারও ফিরিস্তি রয়েছে :

		টা.	আ.	প.
কোতোয়ালীর পাহারাদার খাতে	—	৩৩৪	০	০
যে সব জালিয়াতি স্বীকার করা হয়েছে	—	১৯৬৬	১১	৯
উদ্ধারণ (?) দত্তের দরুণ	—	৪৬০	০	০
চালের গঞ্জে পাহারা দেওয়া খাতে	—	২৩২	১০	০
নওর খাঁ ও হোসেন খাঁর বিধবার দরুণ	—	২১০৭	০	০
মহাদেবের বাড়ী এবং সম্পত্তির দরুণ	—	৫০০	০	০
একুনে	—	৫৬০০	৫	৯

বলা বাহুল্য, হলওয়েলের এইসব অভিযোগের ফলে কলকাতার 'বুরোক্রেসি'র সেই আদ্যিকালেও গোবিন্দরাম মাঝে কেবল নাজেহালই হয়েছিলেন, তার বেশি নয়। বহু ফায়ফর্দ্দ করেও হলওয়েল সাহেব তাঁকে এঁটে উঠতে পারেননি। কেননা, কলকাতা কাউন্সিল দায়সারা ভাবে মিত্তিরজাকে দায়রাসোপরদ্দ করলেও শেষ বেশ তাঁকে বেকসুর খালাস করে দিলেন। সে গল্পত আগেই বলা হয়েছে।

এখন দেশী লোকেরা সবিস্ময়ে কি দেখলে? গোবিন্দরামের ছড়ি ঠিকই ঘুরছে মাথার ওপর। তাঁর বাড়ীর পালপার্বণে হুদো-হুদো সাহেবরা নাক ডুবিয়ে পাত পেতে খানা খেয়ে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে পাল্কীতে উঠছে। তাঁর নাচের আসরে মাল টানতে কাউন্সিলের মেম্বার বাহাদুরেরা বেসখ্ হাজিরা দিচ্ছেন। ঝাড় লণ্ঠনের স্তিমিত আলোকে নর্তকীর অপূর্ব নৃত্যভঙ্গী তাঁদের প্রবাসজীবনে বেহস্তের স্পর্শ এনে দিচ্ছে। তাঁদের আপ্যায়নের জন্যে আয়োজনের যেন শেষ নেই। কাজেই হলওয়েলের সকল আক্রমণকে নস্যাৎ করে পলাশীর যুদ্ধের পর গোবিন্দরাম যে ডেপুটি ফৌজদার অফ পুলিশ হবেন এ'আর বেশি কথা কি? আরও কথা হচ্ছে, ধোয়া তুলসী কে? বছর কয়েক পরে মীরজাফরকে সরিয়ে মীরকাশিমকে নবাব করার জন্যে খোদ হলওয়েল সাহেব কি তিরিশ হাজার দু'শ' সাঁইত্রিশ পাউণ্ড ঘুষ খাননি? 'করাপশনের' ব্যাপারে তাঁরই বলার মুখ কোথা?

কিন্তু গোবিন্দরামের জীবনের এই সব নাটকীয় বৃত্তান্ত তাঁর চরিতকার বিবৃত করতে চাননি। বোধ করি সেকালে বলা কিছুটা শক্ত ছিল বলেই পরিত্যক্ত। তবে গোটা মানুষ গোবিন্দরামকে জানতে গেলে, বাঙালী 'পারসনালিটি'র অভ্যুদয়কে বুঝতে গেলে, এই সম্বন্ধে আরও বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। ঢাকঢাক গুড়গুড়ের কোন অবকাশই নেই এখানে!

তবে এ সব ত্রুটি থাকলেও, এই জীবনীতে সেকালের বাঙালী জীবনচর্যার কিছু চমৎকার ছবি রয়েছে। গোবিন্দরামের এক নাতি কেষ্টচরণ

কোলব্রুকের সুপারিশে ঢাকার কালেক্টর সাহেবের দেওয়ানের চাকরী পান। পিতা রঘুনাথ মারা যাবার ফলে তিনি ঢাকা থেকে কুমোরটুলি ফেরত চলে এলেন। তখনও সেই অতীত আড়ম্বর কমেনি মিত্তিরবাড়ীতে। রঘুনাথ দু'হাতে উড়িয়েছেন। তাঁর জীবনটাই দীয়তাং ভুজ্যতাং-এর কাহিনী। কেষ্টচরনও সেই ট্রাডিশনে চালাতে লাগলেন। বাড়ীতে দু'বেলা দুশোটা করে পাত পড়ে। এবং বিস্ময়ের কথা, সেই সব রান্নার কাজ করতেন বাড়ীর মেয়েরা। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, এমনি বিরাট পরিবার ছিল ত্রিবেণীর বিখ্যাত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের। তাঁরও বাড়ীতে দুবেলা পাত পড়ত শ'খানেকের ওপর। এবং সে সব রান্না পালাপালি করে করতেন বাড়ীর মেয়েরা। কিন্তু এই জীবনচরিত রচনার সময়ে অর্থাৎ আঠারশ' উনসত্তর সালে কিন্তু সে ছবি সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। লেখক সখেদে লিখছেন—Nowadays it is considered a degradation for a female member, to have ever occasion to cook for her husband or children, father or brother স্বামী বা সন্তান, বাবা বা ভাই এদের জন্য রান্না করা নাকি উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে একটা অপমানকর কাজ বলে মনে করা হ'ত। তরুণীরা নাকি রাঁধতেই জানতেন না। ঠাকুর পালালে বা অসুখে পড়লেও বাড়ীর মেয়েরা ও'সব কাজ করতেন না। তাঁরা নাকি বসে বসে বুনতেন আর স্বামীরা সারাদিনের পরিশ্রমের পর এসে সব গার্হস্থ্য কাজ করতেন। এঁদের সম্বন্ধেই কি গুপ্ত কবি লিখেছেন—'আর কি এরা আদর করে, পিঁড়ি পেতে অন্ন দেবে?'

সে সব ছাড়াও আছে—কলকাতার কালেক্টরের দেওয়ান হিসাবে অভয়চরণ মিত্র যখন রাজা নবকৃষ্ণর বাড়ী ভেতরের জরিপ করতে চান তখন কিভাবে তাঁকে আটকাবার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং শেষবেশ না পেরে তাঁর নামে পুরনো তমসুকের দরুণ একটা মামলা হাজির করা হয়েছিল, সেই সব সেকালের কেচ্ছা। কেষ্টচরণের দ্বিতীয়পুত্র

রাজচরণের বিয়েতে লর্ড কর্ণওয়ালিস কুমারটুলির বাড়ীতে বন্দুক ছোড়বার অনুমতি দিয়েছিলেন, এই উপলক্ষেই খাস ফোর্ট উইলিয়ম কেল্লা থেকে তোপ পড়ার গল্পও রয়েছে।

মিত্তির পরিবারের দেবদ্বিজে অচলা ভক্তি। অভয়াচরণের গুরুদেব তাঁকে বলেছিলেন যে তিনি জীবনে লক্ষ টাকার কথা শুনেছেন। দেখেননি কখনও। কালবিলম্ব না করে, অভয়াচরণ তাঁকে নগদ লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। ভগবতীচরণ মিত্র তো এমনি ভক্তিমান যে তাঁর গুরুদেবকে সামনে দেখলেই তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে শুয়ে থাকতেন, আর উঠতেন না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত। শেষে এমনি ব্যাপার, স্বয়ং গুরুদেবই ক্লান্ত হয়ে পড়তেন!

গোবিন্দরাম মিত্রের বংশধররা যাঁরা এখনও টিকে আছেন, তাঁরা কাশীবাসী। এই শাখার আদি পুরুষ রাজেন্দ্র মিত্র। সেকালের বহু জনহিতকর কাজে নিজেকে নিয়োজিত করায় বহু সরকারী সম্মান তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল—এই কেতাবে তার বিশদ বিবরণ রয়েছে।

কিন্তু যা নেই, অথচ যা আশা করা গিয়েছিল, এই দুষ্প্রাপ্য জীবনী-গ্রন্থে, তা হচ্ছে সেকালের কলকাতার ইতিহাস। আঠারশ' সত্তর সালের 'ক্যালকাটা রিভিউ'-তে এই বইটির সমালোচনায় বলা হয়েছিল—যে বইখানি 'is somewhat disappointing to those who expect to find in this native history much that might throw light on the early history of Calcutta'. —অর্থাৎ এই বইটি তাঁদের কিছুটা নিরাশ করবে যাঁরা ভেবেছিলেন এই দেশীয় ব্যক্তির ইতিবৃত্ত আদ্যিকালে কলকাতার ইতিহাসের ওপর কিছুটা আলোক সম্পাত করবে। বড় খাঁটি কথা। শ্রুতিকটু। তবে অস্বীকার করার উপায় নেই।

আর গোবিন্দরাম মিত্রের সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল কলকাতা কাছারিতে কালা জমিদারদের কিঞ্চিদধিক অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী চমকপ্রদ,

বৈচিত্র্যপূর্ণ অধ্যায়টি। মিত্তিরমশায় নিঃসংশয়ে সবচেয়ে কীর্তিমান, কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস, তিনিই শেষ কালা জমিদার। সরকারী কাগজপত্রে আর কোন বঙ্গতনয়কে এই কাজে ত দেখা যাচ্ছে না। সেটা বোধ করি এই কারণে যে ইংরেজ রাজত্ব ততদিনে কলকাতার গণ্ডী পেরিয়ে সারা বাঙলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এবং তাদের শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা ঢেলে সাজছে। সেই কাজে এই ধরণের পদের আর প্রয়োজন নেই। কাজেই এই অধ্যায়ের ওপর অনেকটা আকস্মিকভাবেই যে যবনিকা নেমে আসবে, এতে আর বিস্ময়ের কি আছে!

* * *

না, পাটোয়ারীরা অবশ্যই কালা জমিদারদের মত দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নন। না, তাঁদের কাজের বহরে ছিল তেমন কিছু দাপট। জমিদারদের তুলনায় তাঁরা নিতান্তই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ। হিমালয়ের তুলনায় গিরিগোবর্ধন। সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদ! তবে সেকালের কাছারির কর্মকাণ্ডে তাঁদেরও কিছু ভূমিকা ছিল—সেটা ছোট হোক কিন্তু ছেঁটে ফেলবার নয়। তাই এঁদেরও একজনের কথা বলে নেওয়া যাক এবার।

পাটোয়ারী

রামনাথ পাটোয়ারী

উকিলের যেমন মুহুরী, ডাক্তারের যেমন কম্পাউণ্ডার, সেকালের কালা জমিদারদের তেমনি পাটোয়ারী। জন কোম্পানীর বাঙালী কর্মচারী রামনাথ—রামনাথ রায়—জন কোম্পানীর কলকাতার তেমনি একজন পাটোয়ারী। কোম্পানীর কাছারির ক্ষুদে গোমস্তা। নন্দরাম সেন, জগত দাস, রামভদ্র বা গোবিন্দরাম মিত্তিরের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসবার কোন কৌলীন্যই নেই তাঁর। তবু সেকালের কলকাতার বাঙালীদের কথা বলতে গিয়ে তাঁর নাম ফেলবার উপায় নেই। বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি, তাই; নয়তো তাঁর নাম সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখার দাবী হত। আর দেশের প্রতি বিন্দুমাত্র ভালোবাসা আছে এমন কোন মানুষই সেই দাবী উপেক্ষা করতে পারতেন না।

কিন্তু সে কাহিনী বুঝিয়ে বলতে গেলে, গোড়া থেকে সব ভেঙে বলা দরকার। অবশ্য সে গল্প বলার আগে কোম্পানীর কলকাতার কালা চাকুরেদের সমাজে পাটোয়ারীদের কথা ছোট করে বলে নেওয়া ভালো। জন কোম্পানীর হিসেবের খাতা দেখে মনে হয় সতের শ' সালের সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যখন 'টৌন' কলকাতার পত্তন হল, সেদিন থেকেই কিছু কিছু বঙ্গতনয় কলকাতার কাছারিতে খাজনা তহশিলের কাজে লেগে পড়েন। তাঁরাই সেকালের পাটোয়ারী। বলা বাহুল্য, রালফ্ শেল্ডন—নন্দরাম সেনের হাতেই তাঁদের হাতেখড়ি। এবং আদ্যিকালের কলকাতার আটচালায় তাদের পাঠ ভালোরকমই চলেছিল, কিন্তু বাদ সাধল কোম্পানী স্বয়ং। তখন কাছারিতে বসেছেন দ্বিতীয় গোরা জমিদার বেঞ্জামিন বাউচার। সেই সময়—সে খবর ত

আগেও একবার দিয়েছি, কলকাতা কাউন্সিল একটা নতুন হুকুম পাঠালে, কলকাতার জরিপ হবে। চেন, ম্যাপ নিয়ে কলকাতার সীমানা সরহদ্দ চৌহদ্দি সব পাকা হবে। কোম্পানী বাউচারকে বললে, ইংরেজ সরকারের আওতায় যে ক'টা বাড়ী আছে তার প্রতিটির সীমানা সরহদ্দের পাকা মাপের হিসেব চাই। বললে, কলকাতার সব জমির জরিপ করে' কতটা বাগান, কতটায় চাষ হয়, কতটা অনাবাদী, কতটায় আবাদ হতে পারে, তার একটি ফিরিস্তি তৈরী করতে। এটা সতেরশ' পাঁচ সালের জুলাই মাসের ঘটনা।

এই জরিপ শেষ করতে লেগেছিল, গোটাগুটি দুটি বছর। শুরু করেছিল বাউচার। শেষ করল কিং। আর্থার কিং। সতেরশ' সাত। এবং এরই ফলে কোম্পানীর কাছারিতে একটা ছোটখাট ভূমিকম্প হয়ে গেল বলতে হবে। কোম্পানী সবিস্ময়ে দেখল, বহু জমি বহু লোক বিনা খাজনায় দখল করে বসে আছে। যাদের যে পরিমাণ টাকা খাজনা দেবার কথা, দেয় তার অর্ধেকেরও কম। চোখের সামনে এতবড় একটা লোকসান দেখে কোম্পানীর বুকটা টনটন করে উঠল, হায় হায় এতগুলো টাকা। কোম্পানী একটা পাকা আইন চালু করলে। ডিহি কলকাতা, কলকাতা বাজার, সূতানুটি, আর গোবিন্দপুরের বাজারে বাজারে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল' অতঃপর প্রত্যেকটি বাসিন্দাকে একটি করে পাট্টা দেওয়া হবে। তাতে তার জমির পরিমাণ, চৌহদ্দী সব লেখা থাকবে আর থাকবে সালিয়ানা খাজনার পরিমাণ। মাসে মাসে কোম্পানীর কাছারিতে খাজনা দিতে আসবার সময় সেই পাট্টাটা হাতে করে আনতে হবে। প্রতি বছর এই পাট্টা নতুন করে 'ইস্যু' করা হবে।

দেশের লোকেদের কাছে ঢ্যাঁড়া পেটান হল আর কাছারির পাটোয়ারীদের কাছে গেল নতুন পরোয়ানা। তাঁদের বলা হল খাজনা আদায়ের পাকা খাতা রাখতে। বলা হ'ল, সেই খাতায় প্রতিটি

মাসের খাজনা উস্থলের সঙ্গে এই পাট্টার বিবরণও লিখে রাখতে হবে। আর বছর শেষে কাউন্সিলকে জানাতে হবে কলকাতার প্রজাসংখ্যা বাড়ল না কমল।

কিন্তু এহ বাহ্য। এই জরিপের ফলে মোক্ষম কোপটা পড়ল পাটোয়ারীদের গলায়। ভূমিকম্পটা সবচেয়ে জোরে তাঁদেরই নাড়া দিয়ে গেল। তাঁদের অনেক জাল-জোচ্চুরি কেলেঙ্কারীর ব্যাপার ফাঁস হয়ে গেল। দেখা গেল, তাঁদের বহু রিটার্ণই হুবহু মিথ্যে। জমি সব বিলি হয়েছে বেনামীতে। এবং বলাবাহুল্য, এইভাবে তাঁরা বেশ দু' পয়সা কামিয়েছেন। অন্ততঃ কোম্পানীর নথিপত্রে এইমত অভিযোগ করা হয়েছে। রামের দোষে শ্যামের মাথা ভাঙতে কোম্পানী চিরকালই ওস্তাদ। এসময়েও তার ব্যত্যয় হল না। তারা পুরনো সব পাটোয়ারীকে বরখাস্ত করার হুকুম দিলে। এবং প্রথমেই শ্যামাদাস বলে এক পাটোয়ারীর চাকরী খেয়ে বউনি করতে বললে।

তবে এই দুঃখের দিনে একটা সুখের খবর ছিল। কোম্পানী পুরনো পাটোয়ারীদের তাড়িয়ে শুধু নতুন লোকই নিলে না, তাদের নতুন করে মাইনে ঠিক করে দিলে। তন্‌খা বৃদ্ধি হল। মাসমাহিনা চার টাকা। আগে ছিল কত? সতের শ' তিন সালের অক্‌টোবরে দেখা যায় কলকাতার কেবল বাজারগুলির খাজনা আদায়ের জন্যে চারজন পাটোয়ারী ছিল। মাইনে পেত এক টাকা নয় আনা করে। খাস কলকাতার জমিদারীর জন্য পাটোয়ারী ছিল একজন। মাইনে একটু বেশি—দু টাকা। সুতানুটির জন্যেও একজন। মাইনে একই। গোবিন্দপুরের জন্যেও একজন পাটোয়ারী ছিল। মাইনে কিছু কম। মাসিক দেড় টাকা।

এই দ্বিতীয় দফায় যে সাতজন নতুন পাটোয়ারী নিয়োগ করা হল, মনে হয় এই সপ্তরথীর মধ্যে রামনাথও ছিলেন। কেননা, এর পরে আর নতুন করে গোমস্তা বহালের কোন সংবাদ সেকালের রেকর্ড-পত্র হাঁটকে জোগাড় করা যায় নি। অবশ্য এর মানে এই নয়

যে রামনাথ কোম্পানীর চাকরীতে একেবারে আনকোরা নতুন। সতের শ' চার সালে এক রামনাথকে কোম্পানীর 'রাইটার অফ দি টৌন—হিসেবে দেখা যাচ্ছে। এঁরা একই ব্যক্তি বলে মনে হয়। ইনি ঔরঙ্গজেবের নাতি বিদার বখ্ত-এর দরুণ জায়গীরের সেলামী বাবদ পঞ্চাশ টাকা সাত আনা সেই সম্রাট-পৌত্রের গোমস্তা জিতমল কড়োড়াকে বুঝ দিয়ে রসিদ নেন।

সে যাই হোক, রামনাথের নতুন মহল হল লাট গোবিন্দপুর। আর গোবিন্দপুরের এক ঘাটেই একদিন প্রত্যূষে এই কাহিনীর যবনিকা উঠল। সেটা সতের শ' চৌদ্দ সাল। ফেব্রুয়ারী মাস। কলকাতায় তখনও বেশ শীতের আমেজ আছে। সেই শেষ শীতের কুয়াশা জমা গঙ্গার বুকে ঘষা পেন্সিলে আঁকা ছবির মত হঠাৎ একটা ভারী বজরা ভেসে উঠল। একটু একটু করে নতুন রোদের কুচি গঙ্গার জলে সোনা ছড়াতে লাগল আর সেই বজরাটা যেন অশরীরী প্রেতরাজ্যের রাহুগ্রাস থেকে আস্তে আস্তে নিজেকে মুক্ত করে নিতে লাগল। বজরায় তখন দেখা গেল অনেক মানুষ। নারী, পুরুষ, শিশু। বজরাটা আসছিল দূর দেশ থেকে। তার পালে তখন বিশেষ হাওয়া নেই। মাঝি-মাল্লারাও শ্রান্ত, ক্লান্ত। বৈঠা চালাবার আর কোন ক্ষমতাই যেন তাদের অবশিষ্ট নেই। অন্তবিহীন পথ একটানা দাঁড় টেনে এসে তাদের সব দম ফুরিয়ে গেছে।

ঘেরাটোপের বাইরে এসে একজন বয়স্ক লোক মাঝিদের কি যেন বললে। বুড়ো অভিজ্ঞ মাঝি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে। বললে হ্যাঁ, কত্তা, কালিঘাট পেরিয়ে এলম যে। এবার কোম্পানীর রাজ্য। এই গঞ্জটাই গোবিন্দপুর। ঐ যে মাকুর শব্দ আসছে, ওটা শেঠদের দাদনি তাঁতিদের তাঁত চলার শব্দ। মাঝির গলায় যশুরে টান স্পষ্ট। বুড়ো ঘাড় নাড়লে এবার। বললে, তাইত মনে হচ্ছে। এবার এক পাশপানে একটা ছোট ঘাট দেখে নৌকা ভেড়াও মাঝি।

অদূরেই চাঁদপাল ঘাট। সেখানে পতাকা উঁচিয়ে রাশি রাশি ডাচ,

ইংরেজ বোটের ভিড়। মাঝিমাল্লার গলায় বেয়াড়া কক্‌নিমেশান ইংরাজি গান। কিছুবা হুল্লোড়। এখান থেকেও তার শব্দ ভেসে আসছে। মাঝি তদ্দুর এগোল না। পাশেরই একটা ছোট স্নানের ঘাটের দিকে লগি ঠেলে এগোতে লাগল।

ঘাটটা ছোট। কিন্তু সেই সাতসকালেই তার ভিড় ছোট নয়। স্নানার্থীদের ভিড়ে ঘাট ভরে গেছে। বুড়ো মাঝি গুণ টানতে টানতে হেঁকে জিগ্যেস করলে, এটা কোন গাঁ গ' কত্তা? কর্তাদের নজর তার আগেই বজরাটার দিকে পড়েছিল। বজরাটা বড়। এবং বড়লোকের। তা দেখলেই বোঝা যায়। গঙ্গাস্তোত্র আবৃত্তি থামিয়ে, কেউবা ডুব বন্ধ করে'—কয়েকজন প্রায় একই সঙ্গে চেঁচিয়ে জবাব দিলে, গোবিন্দপুর। জের টেনে সকৌতূহলে পাশের একজন জিগ্যেস করলে, কোত্থেকে আসা হচ্ছে? মাঝি জবাব দিলে না। বৃদ্ধের মুখে হাসি ফুটেছিল। বললে, আমরা বরেন্দ্র থেকে আসছি। কলকাতার স্নানার্থী বাসিন্দারা আর প্রশ্ন করলে না। কেবল একপাশে যে দু'একজন মহিলা স্নান করছিল, তারা ঘোমটাটা একটু টেনে নিয়ে ঘোমটার মধ্যে দিয়ে জুলজুল করে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তাদের অগাধ কৌতূহলের তখনও নিবৃত্তি হয়নি।

অবশ্য সেটা নেহাৎই মেয়েলি কৌতূহল। কলকাতার লোকেরা তখনই বেশ নিরাসক্ত। কেননা গোবিন্দপুর—কলকাতা তখন আর ছোট্ট গ্রাম নয়। গঞ্জ। ইংরেজদের ভারী বাড়বাড়ন্ত। বহুদূর থেকে নিত্যি বহু লোক আসে। কেউ ব্যবসা করে। কেউবা চাকরীর উমেদারী করে। কেউ শুধু কৌতূহল নিরসন করতে আসে। রাজা মহারাজাও আসে। কালিঘাটে পূজা দিতে যাবার পথে অনেকেই একবার নেবে কলকাতা দেখে যায় প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে। কত আর কে খোঁজ রাখে!

বৃদ্ধ বজরার অন্দরমহলের দিকে গিয়ে বললে, আর ভয় নেই মা। আমরা কোম্পানীর রাজত্বে এসে গেছি। এরা মুঘলদের তাঁবেদার নয়।

আমরা এখন মা গঙ্গার কোলে। আপনারা ইচ্ছা করলে স্নান করে নিতে পারেন। বজরার ত্রস্ত অন্দরমহলে স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল। কিন্তু সেদিনের সেই স্নানার্থী কলকাতা বা ফোর্ট উইলিয়মের ব্যস্ত গোরাসাহেবরা কেউই বুঝতে পারেনি কাদের পুণ্য স্পর্শে শহর কলকাতার সেই প্রসারিত বালুচর পবিত্র হল সেদিন।

অবশ্য জানতে দেরীও হয়নি বেশি। কেননা, এই ঘটনার কয়দিন পরেই হুগলী থেকে নবাবী ছিপ এসে লাগল একেবারে গড়ের ঘাটে। কোম্পানীর পাল্কী করে আগন্তুকরা সটান গিয়ে উঠল ফোর্ট উইলিয়মে কলকাতা কাউন্সিলের আস্তানায়। উঠেই পাঠালে একেবারে খাস গভর্নরের কাছে জরুরী এত্তেলা। হুগলীর ফৌজদার মীর নাসিরের দূত তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী। দূতের হাতে খোদ ফৌজদার সাহেবের পাঞ্জামোহর করা চিঠি।

হন্তদন্ত হয়ে গভর্নর ছুটে এলেন। মীর নাসির তাঁর চিঠিতে লিখেছেন মুর্শিদাবাদে বসেই মুর্শিদকুলী খাঁ খবর পেয়েছেন যে, ভূষণার জমিদার সীতারাম রায়ের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আত্মায়স্বজন ত্রিশ লক্ষ টাকা নিয়ে কলকাতায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। সীতারাম রায়ের ফাঁসী হয়েছে দেওয়ানের হুকুমে। বিদ্রোহের অপরাধে। নরহত্যার অপরাধে। কাজেই, মৃত রাজার স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তির মালিক নবাব স্বয়ং। মীর নাসির ইংরেজদের উপর ভারী সদয়। বন্ধুভাবাপন্ন। তিনি রবার্ট হেজেসকে চিঠিতে জানিয়েছেন, সাহেব জানেন ত, জাফর খাঁ কোন রকম ছুতো পেলেই আপনাদের ছুয়ে নেবে। সেই সুযোগ যাতে কোনক্রমেই না পায় মুর্শিদকুলি সেইজন্যেই আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি। যতশীঘ্র পারেন সীতারাম রায়ের বংশধর ও আত্মীয় স্বজনদের ধরে হুগলী পাঠিয়ে দিন। নতুবা সমূহ বিপদ।

কোম্পানীকে বলতে হবে না। জাফর খাঁ যে কি চিজ, তা তারা জানে। হেজেস দূত-হুজুরকে বললে, একি সর্বনাশের কাণ্ড। বিদ্রোহী সীতারাম রায়ের ছেলেপিলে-বউ সব কলকাতায়? তা হুজুররা যখন

বলছেন, একেবারে জোর তন্বতল্লাসী করতে হবে। এখন আপনারা বালাখানায় গিয়ে বসুন। ঠাণ্ডা হন। তেল তামাক করুন। আমরা সব দেখছি ব্যাপারটা। এইসব স্তোকবাক্য দিয়ে হুগলীর ফৌজদারের লোকজনকে কলুটোলায় ফৌজদারদের চকমিলান বালাখানায় পাল্কী করে পাঠিয়ে দিলেন। তারপরই হেজেস কলকাতার জমিদার স্যামুয়েল ব্রাউনকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে ব্যাপারটা ইতিবৃত্তান্ত সব বললেন। কাউন্সিলের কাউকে কাউকে ডাকা হল। পাঁচ মাথা এক করে ঠিক হল বিকেলে রাজদূতকে ফোর্ট উইলিয়মে আসতে বলা হবে। আর সেই সময় তাঁর সামনে কলকাতার কালা-গোরা সব কোতোয়াল, পাটোয়ারী, নগ্‌দী, দারোয়ানকে ডেকে পাঠিয়ে তাদের এজেহার নেওয়া হবে। কোম্পানী যে এই ব্যাপারে ঘুণাক্ষরেও জানে না, এ থেকে অবিশ্যি সেটা প্রমাণ হবে।

যেই কথা সেই কাজ। সকাল কাটল। দুপুর কাটল। এক সময় শীতের কলকাতা বিকেলের ধূসর জোব্বাটা পরে বুঝি হাওয়া খেতে বেরল। বিকেলের দিকে সেকালে কলকাতার কোর্ট-কাছারি বন্ধ থাকত। সাহেবরা ছড়ি ঘুরিয়ে ডালহৌসী স্কোয়ারে বেড়াতে বের হত। পানসি চালাত। কিন্তু গরজ বড় বালাই। সেদিন ফৌজদারের অভিযোগের তল্লাসীর জন্যে সবাই মুখ চুন করে কাছারি এল। এক সময় দিবানিদ্রা শেষে চুমকি দেওয়া ঝালর ঝোলান সোনাবাঁধান পালকীর মধ্যে বসে মুঘলদূতও এলেন ইংরেজদের গড়ে। তারপর তাঁরই সামনে সুরু হল হাজারো জেরা। প্রতিটি কালা কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করতে লাগল জমিদার স্যামুয়েল। মীর নাসিরের চিঠির মর্মার্থ পড়ে শোনান হল। তারপর জিজ্ঞাসাবাদের পালা। সবাই শুনলে। কিন্তু কেউই কিছু বলতে পারলো না। বললে, যদি কেউ সত্যি করেই সীতারাম রায়ের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে লুকিয়ে রেখে থাকে, তারা তার মধ্যে নেই। দিব্যি দিয়ে, শপথ করে কলের পুতুলের মত সবাই বলে গেল একে একে।

বললে ত, কিন্তু তারপরই সুরু হল মজাটা। মীর নাসিরের পাঠান লোকজনদের একজন হঠাৎ নাটকীয়ভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, তার মনে হয়, কোম্পানীর নফররা যা বললে, তা ঠিক নয়। সে নিজে মুর্শিদকুলির গুপ্তচর। বলাবাহুল্য, এই খাস কলকাতার মৃত্তিকায় সে বিচরণ করে থাকে, অবশ্য গুপ্তভাবে। একদা এইখানেই সে সীতারাম রায়ের পরিবারের কয়েকজনকে ধরে ফেলেছিল। তাদের সে ধরেও নিয়ে যেত হুগলীতে। কিন্তু বাদ সেধেছিল কোম্পানীর কলকাতার বাসিন্দারা। তারা বললে, এটা ত' আর মুঘল রাজত্ব নয়। এখানে চলে কোম্পানীর কানুন। কাজেই 'হুম' করে যাকে তাকে খুশি ধরে যেখানে সেখানে নিয়ে যাওয়া ত' চলবে না। কালা জমিদার আছে হ্যারী মূর। তাঁর কাছে নিয়ে যেতে হবে এইসব ধৃত ব্যক্তিদের। তিনি যা বলবেন তাই হবে। এইসব কথা বলে কলকাতার বাসিন্দারা সেইসব লোকজনকে ছিনিয়ে নিয়ে হ্যারী মূরের কাছে হাজির করে। তারপর আর সীতারাম রায়ের লোকজনদের তার হাতে দেওয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, নবাবের অন্যান্য গুপ্তচরদের বদ্ধমূল ধারণা, ওরা এখনও কলকাতাতেই আছে।

হেজেস সব শুনে বললে, তাই নাকি? ডাক হ্যারী মূরকে। হ্যারী মূর একপাশে বসেই ছিল। এগিয়ে এসে এজেহার দিলে, কথাটা সত্যি। কয়েকজন লোক গোবিন্দপুরের ঘাটে স্নান করছিল। তাদের সীতারাম রায়ের পরিবারের লোক সন্দেহ করে তার কাছে ধরে নিয়ে আসা হয়। হ্যারী মূর ত আর তখন সীতারাম রায়ের মাহাত্ম্য জানেন না। ভাবলেন, কি দরকার বাপু এইসব ঝুট-ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে? যারা তাদের ধরে এনেছিল, তাদেরই হাতে সেইসব ধৃত ব্যক্তিদের ছেড়ে দেন তিনি। ভাবখানা এই যা ভালো বোঝ কর বাপু তোমরা। আমাকে এর মধ্যে জড়িও না। হ্যারী মূর এও বললে, ধৃত ব্যক্তিরা বোধ হয় কিছু টাকা খাইয়ে সে যাত্রায় নিস্কৃতি পেয়ে থাকবে!

রামনাথ তখন গোবিন্দপুরের খাজনা আদায় করেন। ভিড়

থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, সে কি কথা হুজুর? আমি ত স্বয়ং সেই লোকেদের হুগলীর ফৌজদারের লস্করদের ঠেলে ঠেলে নিয়ে যেতে দেখেছি। সে অবিশ্যি অনেক কাল হয়ে গেল। তারপর আর তাদের সম্বন্ধে কোন কথা আমার কানে আসেনি।

কলকাতার গভর্নর রবার্ট হেজেস পড়লেন মহা ফ্যাসাদে। আচ্ছা ঝামেলা ত যা হোক। কি-করি কি-করি ভাবতে ভাবতে তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। দূতকে বললেন, ব্যাপারটা ত জটিল বলেই মনে হচ্ছে খাঁ সাহেব। এই ব্যাপারে চর লাগিয়ে তদন্ত করতে হবে। এবং সেটা সময়সাপেক্ষ। কাজেই হুগলীর ফৌজদার মীর নাসিরকে প্রীতিসম্ভাষণপূর্ণ একটি মিষ্টি চিঠি লেখে দিলেন তিনি। কোম্পানীর প্রতি মীর নাসিরের যে প্রগাঢ় প্রীতি তার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে হেজেস সাহেব লিখলেন যে মহারাজ সীতারাম রায়ের কোন লোক যদি কোনক্রমে কলকাতায় লুকিয়ে থাকে তাদের খুঁজে বার করে হুগলীতে পাঠাবার চেষ্টার কোনরকম ত্রুটি করবে না ফৌজদারের সখাপক্ষ ইংরেজ কোম্পানী। কয়েক লাইনে এইরকম একটা জোরালো আশ্বাস দিয়ে হেজেস তাঁর চিঠি শেষ করলেন। এবং সেই চিঠি হাতে দিয়েই সেবারের মত বিদায় করলেন হুগলীর মুঘল দূতকে।

কিন্তু ইংরেজরা উপযুক্ত ক্ষেত্রে শুধু কথাই বলে না। কাজ করে। তারা মুর্শিদকুলিখাঁকে চিনত। যে কোন ছলে কোম্পানীকে জব্দ করতে যে তিনি তৎপর—এই চিন্তা বিনিদ্র কেম্পানীকে তাড়া করে ফিরতে লাগল। কোনরকম চুপ করে বসে থাকা তারা সমীচীন বলে মনে করলে না। তার পর দিন গোরা জমিদার স্যামুয়েল ব্রাউনের ওপর হুকুম হল সারা শহর কলকাতার বাজারে বাজারে ঢাঁড়া পিটিয়ে দেবার। মণ্ডেবাজার। সন্তোষবাজার। নতুনবাজার। কোন বাজারই বাদ গেল না। কলকাতা-গোবিন্দপুর-সুতানুটী কোন গ্রাম-গঞ্জই ছাড় পেল না। কোম্পানীর মাইনে করা ঢুলী ঢোলসহরৎ করে

জানালে ভূষণার পরাজিত রাজা সীতারাম রায়ের আত্মীয়স্বজন পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে কলকাতায়। যে বা যাহারা তাদের ধরে দিতে পারবে তাদের নগদ একশ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। শুধু ঢাঁড়া নয়, বাজার করতে করতে কলকাতার কালা বাসিন্দারা দেখলে এই মর্মে কাগজে লিখে সেই নোটিশ শহরের বাজারে বাজারে এবং সকল প্রকাশ্য স্থানেও লটকে দেওয়া হয়েছে।

তা' না হয় হ'ল। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হল না। কোতোয়াল কলকাতায় তার চরেদের ধমকাতে লাগল! কোতোয়ালকে ধমকাতে লাগল কালা জমিদার; তাকে আবার ধমকায় গোরা জমিদার। কিন্তু কোথায় সীতারাম রায়ের লোকেরা? এদিকে দিন কাটে। সপ্তাহ কাটে। পক্ষ যায়। দেখতে দেখতে ফেব্রুয়ারী মাসটা গোটাগুটি কেটে গেল। মার্চ পড়ল। মার্চের তিন তারিখ। কোম্পানীর কাছারিতে গোরা জমিদার স্যামুয়েল ব্রাউন আলবোলায় টান দিচ্ছিলেন মৃদু মৃদু। তাকিয়ার ওপর ঝুঁকে পড়ে কোম্পানীর হিসেবের কাগজপত্র পরীক্ষা করছিলেন। এমন সময় দুটো কালোপানা লোক হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ল। ব্রাউন চমকে উঠলেন, কি ব্যাপার? একটু দূরে কালা জমিদার হ্যারী মূর তাঁর 'টৌন্ রেজিস্টারে' সেদিনের হিসেব তুলছিলেন, তিনিও ব্রাউনের চিৎকারে চমকে উঠলেন। কি ব্যাপার? লোক দুটো সাপের মত হিস্‌হিস করে বললে, খবর আছে হুজুর। একেবারে সাহেবের কানের কাছে মুখ টেনে নিয়ে বললে, জোর খবর হুজুর।

—কিসের খবর?

—সীতারাম রায়ের পরিবারের লোকেদের।

—হোয়াট? ব্রাউন ত একেবারে লাফিয়ে উঠলেন। ইদানীং স্বয়ং হেজেস সাহেব তাঁকে তাগাদা দিতে শুরু করেছিলেন। কাজেই ব্রাউন ত হাতে চাঁদ পেলেন। বললেন, ইজ ইট? লোক দুটো তখন একেবারে হেসে বিগলিত। একমুখ হেসে বললে, একেবারে পাক্কা খবর হুজুর। লোক দিন। তাদের বেঁধে নিয়ে আসি। একেবারে পিছমোড়া করে।

কৌতূহলে চকচক করে উঠল স্যামুয়েল ব্রাউনের কপিশ চোখের তারা। জিগ্যেস করলেন, কোথায় আছে তারা ?

—গোবিন্দপুর।

—কার বাড়ী ?

—সেই প্রশ্নের যে জবাব দিলে তারা তা শুনে এমনি চমকে উঠলেন কালা আর ধলা জমিদার দুজনেই যে সেই মুহূর্তে সেই ঘরে বাজ পড়লেও বোধকরি এতটা চমকে উঠতেন না তাঁরা। গুপ্তচর দুজন বললে, সীতারাম রায়ের লোকজন আছে লাট গোবিন্দপুরের পাটোয়ারী রামনাথের বাড়ী। কয়দিন আগে সেই অবশ্য বলেছিল যে দেওয়ানের লোকেরাই মহারাজ সীতারাম রায়ের পরিবারের লোকেদের ধরে নিয়ে গেছে তার চোখের সামনে। তারপরে সে আর কিছুই জানে না।

গুপ্তচরেরা ভুল খবর দেয়নি। ব্যক্তিগত সমূহ বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও রামনাথ যশোহরের তথা বাংলার শেষ স্বাধীন নৃপতিকে আশ্রয় দিতে ভয় পাননি। তাঁর নিজের বাড়ীতে রেখেছিলেন পুরুষদের। মেয়েরা ছিল অন্য এক বাড়ীতে। খবরটা পেয়েই ব্রাউন আর দেরী করলেন না। খাস ফোর্ট উইলিয়মে গভর্নরের কাছে চলে গেলেন। খবরটা তাঁকে জানালেন। হেজেস সেই গুপ্তচরদের সঙ্গে দশজন গোয়ালা আর দুজন বিশ্বস্ত গোরা কর্মচারী দিলেন। তাঁরা বীরবিক্রমে সবাইকে ধরে আনলে। পরদিন কোনরকম কালক্ষেপ না করে কোম্পানী নিজের লোকজন দিয়ে সীতারাম রায়ের আত্মীয়স্বজন, তাদের সঙ্গে মালপত্র সম্পত্তি সবকিছু হুগলী পাঠিয়ে দিলে। মীর নাসিরের খুশি আর ধরে না।

কারা আশ্রয় নিয়েছিল কলকাতায় ? যতদূর জানা যায়, মহারাজ সীতারাম রায় যখন দেখলেন যে যেসব হিন্দু নৃপতিদের ভরসায় তিনি মুঘলকে খাজনা না দেবার পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁরা সবাই তাঁকে পরিত্যাগ করে যাচ্ছে এবং কোনক্রমেই আর তাঁর স্বাধীনতা বজায়

রাখা সম্ভব নয়, তখন তিনি তাঁর তৃতীয় মহিষী, একটি শিশুকন্যা ও তাঁর দুই পুত্র কামদেব আর জয়দেবকে বজরা করে পাঠিয়ে দেন রাঢ়দেশের উদ্দেশে। তাঁরাই আশ্রয় নিয়েছিলেন কোম্পানীর রাজত্ব কলকাতায়। কলকাতার প্রথম রাষ্ট্রিক শরণার্থী তাঁরাই। আর তাঁদের আশ্রয় দিয়ে রামনাথ পাটোয়ারী স্বাধীনচিত্ত বাঙালীর মুখরক্ষা করেছিলেন। কলকাতার মুখ রেখেছিলেন। মান রেখেছিলেন। হয়ত শেষরক্ষা হয়নি, কিন্তু মুখ রক্ষা হয়েছিল। তাঁর এই আত্মোৎসর্গ এই মহৎ প্রচেষ্টা কোনক্রমেই উড়িয়ে দেবার নয়। অনেকে অবশ্য মনে করেন রামনাথ ছিলেন রাজা সীতারামের দূরসম্পর্কের আত্মীয়। হয়ত বা। কিন্তু আত্মীয়ের জন্যই কে বা এই ধরনের ঝুঁকি নেয়? নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন করে?

এবং এর জন্যে তাঁর নিগ্রহ কম হয়নি। সতেরশ' ষোল সালে বাঙলা থেকে বিলেতে পাঠান এক সংক্ষিপ্ত রিপোর্টে বলা হচ্ছে যে রামনাথ তখনও জেলে। তাঁকে কোম্পানী জরিমানা করেছে। কিন্তু রামনাথ কলকাতা কাছারির চার টাকা মাইনের গরীব গোমস্তা। জরিমানা দেবার সংস্থান কোথা তাঁর? তবে সহৃদয় বাঙালীর অভাব হয়নি সেকালের কলকাতায়। বাঙালী ব্যবসায়ীরা তাঁর জন্যে একশ' টাকা তুলে দিয়েছিলেন। তবে তাতেও কোম্পানীর রাগ কমেনি। রাষ্ট্রদ্রোহী রামনাথকে তারা ছাড়েনি। তাদের স্থির সিদ্ধান্ত ছিল জরিমানার টাকা না পেলে তারা রঘুনাথকে চাবকাতে চাবকাতে কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দেবে।

শেষবেশ রামনাথকে সেই অবমাননা সইতে হয়েছিল কিনা সে খবর জানা নেই। অবশ্য হলেও তাতে কিছু এসে যেত না। রামনাথের গৌরবের কোন হানি হত না। রামনাথ স্বাধীন বাঙালীর চিরকালের নমস্য ব্যক্তি। কলকাতার সামান্য কর্মচারী রামনাথ পাটোয়ারীর উদ্দেশে একালের বাঙালীর শতকোটি নমস্কার!

রামনাথ ছাড়া আর কোন বিশিষ্ট পাটোয়ারীর কথা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু জন কোম্পানীর কলকাতা কাছারির সুরু থেকে সারা পর্যন্ত নন্দরাম থেকে গোবিন্দরাম অবধি, পাটোয়ারীদের আনাগোনা, কাজকর্ম যে বন্ধ হয়নি, তা' বলাই বাহুল্য। তবু সি-আর উইলসন সাহেবের সংগৃহীত কাগজপত্রে আর কোন পাটোয়ারীর নাম করে উল্লেখ নেই, এটাই আশ্চর্য। মনে হয় একেবারে ছোট-খাট চাকুরে বলেই তাঁরা তত নজরে আসেননি। তাছাড়া সাহেবত আর বাঙালী কর্মচারীদের কাহিনী লিখতে বসেননি! সে যাই হোক, ঐ নিয়ে বিশেষ দুঃখেরও কোন কারণ নেই, কেননা রামনাথ একক চন্দ্রের মতই তাঁর ভাই বেরাদরদের সকল তুচ্ছতার তমোহরণ করেছেন। হাজার তারায় কি হবে?

* * *

তবে পদাধিকারের দিক দিয়ে বিচার করলে জমিদারদের পরেই কিংবা তাঁদের সঙ্গেই নাম করতে হয় কোম্পানীর দালালদের। অবশ্য খুব খুঁটিয়ে দেখলে দালালদের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরেদের মধ্যে ফেলা ঠিক নয়। কারণ এঁরা কেউই ঠিক মাস মাইনের চাকরি করেছেন বলে বোধ হয় না। কাজ এঁদের অনেকটা 'কমিশন এজেন্টের' মত। তবে এঁদেরও নিয়োগ আছে; ছাঁটাই আছে। এবং সর্বোপরি আছে কোম্পানীর সুবিশাল কর্মকাণ্ডে এঁদের অপরিহার্যতা।

তা' ছাড়া, জমিদাররা যেমন কাছারিতে চুটিয়ে রাজত্ব করেছেন, কোম্পানীর বানিজ্য-সাম্রাজ্যে—মালগুদামে, হাটে গঞ্জে, তেমনি দালালরা সব উজিরে-আজম। এঁরাই বিদেশী কোম্পানীকে নতুন রাজ্যের সুলুক সন্ধান দিয়েছেন, দাদনের রহস্য বুঝিয়েছেন, কেনাকাটায় মদত দিয়েছেন। বলতে কি, কোম্পানীর সুবিপুল সমৃদ্ধির রহস্যময় রূপকথার ইংরাজ রাজপুত্রদের তাঁরাই সব সখা সওদাগরপুত্র-মন্ত্রিপুত্রের দল। তাঁদের অকুণ্ঠ সাহায্য বিনা বেণে কোম্পানীর গোকুল অন্ধকার! এঁদের আবার দিকপাল হচ্ছেন কলকাতার শেঠেরা। তাঁদের কয়েকজনের কথা এবার আলোচনা করা হবে।

দা লা ল

জনার্দন শেঠ

বুম্‌···বুম্‌···বুম্‌ করে তোপ পড়ছিল কেল্লায়। একটার পর একটা। সতেরশ' দশ। বিশে জুলাই। বৃহস্পতিবার। ভর সন্ধ্যা। একটু আগেই শহর কলকাতার হোগলা বনে, ধানের ক্ষেতে ঝিঁ ঝিঁ ডাকা সুরু হয়ে গেছে। 'হুক্কা হুয়া' 'হুক্কা হুয়া' করে শেয়ালের দল কলকাতার গৃহস্থদের আসন্ন রাত্রির জন্য সতর্ক করে গেছে। তারপর একটানা নীরবতার মাঝে থেকে থেকে প্যাঁচার কর্কশ চিৎকার আর রাতচরা হুতুমথুমো পাখীর ডাক রাত বাড়ার কথা তারস্বরে ঘোষণা করছে।

এমনি সময় তোপ পড়ল কেল্লায়। সারা কলকাতার আমজনতা একবার চমকে উঠে আবার নিজের নিজের কাজে মন দিল। ফোর্ট উইলিয়মে কোম্পানীর নতুন গভর্নরের অভিষেক হ'ল। তোপের শব্দে কলকাতার মানুষকে তাই জানিয়ে দেওয়া হ'ল। যদিও তার বিশেষ দরকার ছিল না। কেননা, কয়েকঘণ্টা আগেই সারা শহর ভেঙে পড়েছিল চাঁদপাল ঘাটে। কলকাতার নতুন লাটসাহেবকে দেখতে। এসেছিল কলকাতা বা কলকাতার আশেপাশের প্রায় বার হাজার লোক—আট হাজার হিন্দু, দু'হাজার একশ' পঞ্চাশ জন মুসলমান এবং আঠারশ' জন খৃষ্টান।

সেই ভিড়ে গিয়েছিলেন কলকাতা গোবিন্দপুরের বিস্তৃত শেঠবাড়ীর বড়কর্তা জনার্দন শেঠ। মাথায় ছাতাবরদারদের ধরা টাউস ছাতা, পাশেই রাখা ঝালর দেওয়া পাল্কী, মাথায় বিঁড়ে পাগড়ি, কপালে তিলক, গায়ে পিরান, পড়নে ধুতি, পায়ে নাগড়া—শেঠজীর ওপর দিয়ে গেছে শ্রাবণ মাসের এই টেকৃথর রোদ। গেছেন সেই সাতসকালে।

চাঁদপাল ঘাটের ভিড়ে ঠায় নীরবে অপেক্ষা করলেন সারাদিন। তা ছাড়া করবেনই বা কি। গরজ বড় বালাই। যদিও কোম্পানীতে তাঁর দাসত্ব নয়, দালালী ; তবু মহাজন বলে ত কথা। কোম্পানীর খাস বিলেত থেকে গভর্নর আসছে এই প্রথম—তা'ছাড়া গভর্নর মানে বাঙলা দেশে কোম্পানীর রাজত্বের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। রাখিলে রাখিতে পারে মারিলে মারিতে। তাঁর মর্জির ওপরই ত সব। কাজেই শেঠকর্তা করবেন কি ? সামনে গঙ্গার গেরুয়া জলে সূর্যের ওঠানামা দেখেছেন, দেখেছেন কখনও পান্সী, কখনও জেলে ডিঙে, কখনও বা ভারী মালবোঝাই গাধাবোট—কখনও উজানে কখনও ভাঁটায়—তির্‌তির্ করে বয়ে চলেছে। মাঝিমাল্লার গলার কখনও ভাটিয়ালী, কখনও বা হালের ঝপ্ ঝপ্ শব্দের তালে তালে একটা একটানা ডাক। শেঠজী তাই শুনেছেন আর অপেক্ষা করেছেন—গভর্নরের জাহাজ কখন এসে পড়ে। লক্ষ্মণের মত ফল ধরে থাকা ছাড়া গত্যন্তর কি ? গঙ্গার বিস্তৃত বেলাভূমি শ্রাবণের শেষ সূর্যের আবেশে তেতে লাল হয়ে একসময়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। গভর্নরের জাহাজ তখনও পৌঁছাল না। কিন্তু শেঠজী নির্বিকার ভাবে প্রতীক্ষায় রইলেন।

অবশ্য তাঁর কষ্ট বোধ হয় শুধু এই অন্তহীন প্রতীক্ষা নয়। একেবারে কাবাজোব্বা বিঁড়ে পাগড়ি পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। সরকারী কাজ—কাজেই 'অফিসিয়াল ড্রেস' পড়েই যেতে হ'ল। খাস বিলেত থেকে 'এ্যাপয়ন্টমেন্ট' নিয়ে আসছে খাঁটি সাহেব। এত আর দেশী ইংরেজ নয় যে পাৎলুন পড়ে মাছ ধরবে আর ডোমিংগো এ্যাশ বিবির ভেটেরাখানায় আরক খাবে। হুল্লোড় করবে। কাজেই বেশ কেতাদুরস্ত হয়েই গিয়েছিলেন জনার্দন শেঠ।

সবই করেছিলেন জনার্দন শেঠ। কিন্তু কোথায় যেন তাল কেটে গিয়ে থাকবে। কেমন যেন খুশী মনে ফিরতে পারলেন না চাঁদপাল ঘাট থেকে। কলকাতা থেকে গোবিন্দপুরের—সারা রাস্তাটা পাল্কী-বেয়ারাদের একটানা সুরেলা চিৎকার শুনতে শুনতে বারবার এই

কথাটা মনে হয়েছে—কোথায় যেন কি গোলমাল হয়ে গেছে, কাজ-কর্মের শান্তি আর থাকবে না। কাঁটার মত এই চিন্তাটা খচ্ খচ্ করে বিঁধছে। শেঠমশায় বিষয়ী ব্যক্তি। কোম্পানীর বড় দালাল তিনি। মানুষ চড়িয়ে খান। কেমন যেন মনে হ'ল—মুখপাত বেশ সুবিধের হ'ল না।

অথচ বলতে নাই, সবই ত হ'ল। নৌকা থেকে নামবার পর গভর্নর সাহেবের সঙ্গে কলকাতার সায়েব-সুবোর পরিচয় হ'ল। সেই সঙ্গে দেশী কর্মচারীদের সঙ্গেও। জনার্দন শেঠ। জগতদাস। রামভদ্র। পুরণো গভর্নর রাসেল সাহেবই বোধকরি পরিচয় করিয়ে দিয়ে থাকবেন। হাজিরও ছিলেন মনে হয় সব্বাই। সেদিকে কোন ত্রুটি ছিল না। রাসেল সাহেব পাকা লোক! তাঁকেই সরিয়ে বিলেত থেকে গভর্নর পাঠালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টরস। রাসেলের বাড়াভাতে ছাই। কিন্তু রাসেলের মুখ দেখে কে বলবে সেই কথা। আইন-মানা জাত ইংরেজ। হাকিম নড়ে ত হুকুম নড়ে না। কাজেই কাল বিলম্ব না করে রাসেল সাহেব কোম্পানীর নতুন কর্তাকে সাদর আহ্বান জানানোর সকল আয়োজন নিখুঁত করতে উঠে পড়ে লেগে পড়লেন।

মঙ্গলবার বালেশ্বর থেকে খবর এ'ল। শেঠমশায় তাজ্জব হয়ে দেখলেন, রাসেল সাহেব কোন বিরাগ দেখালেন না। সঙ্গে সঙ্গে ভাবী গভর্নরকে স্বাগত জানাতে, অভিনন্দন জানাতে ব্রাউণ্ট সাহেবকে আগ বাড়িয়ে পাঠালেন। গভর্নরকে এগিয়ে আনতে। বুধবার কলকাতা কাউন্সিলের সব কয়টা সদস্যই বজরা ভাসিয়ে দিলে 'স্যাণ্ড হেডস্'-এর উদ্দেশে। তারপর বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে কেবল প্রতীক্ষা আর প্রতীক্ষা। একটি একটি করে লোক আসতে সুরু হ'ল দশটা থেকে। তারপর লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল চাঁদপাল ঘাট। সাহেব-মেম। বাঙালী। হিন্দু-মুসলমান। পাল্কীবেহারা। ছাতাবরদার। হুকোবরদার আর চোবদারের ভিড়। দূরে গঙ্গার কোল ঘিরে

আসন্ন রাত্রির একটা মোটা কালো পর্দা কে যেন ধীরে ধীরে ঢেকে দিচ্ছিল, এমনি সময়, কোম্পানীর নিশান-ওড়া গভর্নরের বজরা এসে ভিড়ল। একটি ছেলে, একটি মেয়ে, বোন, দুটি ঝি, একটি চাকর, একঘর আসবাবপত্র, একটন বই আর একটা হার্পসিকর্ড বাজনা নিয়ে সপরিবারে চাঁদপাল ঘাটে নামলেন গভর্নর এন্টনি ওয়েল্টডেন।

হ্যাঁ, ভিড় হয়েছিল বলতে হয়; ভিড় ঠেলেই এগোতে হয়েছিল সাহেবদের ফোর্ট-উইলিয়মের পথে: সামনে পথ দেখিয়ে রাসেল। আব্রাহাম এ্যাডামস। তাঁদের এগিয়ে দিয়ে দেশীজনেরা যে যার বাড়ী ফিরল। এবং একটু পরেই কেল্লায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়া নতুন গভর্নরের নিয়োগপত্র সীলমোহর খুলে পাঠ করা হ'ল। ফোর্ট উইলিয়মের চাবিকাঠি আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে সমর্পন করলেন জন রাসেল। কেবল একটা জিনিষ হ'লনা। সেটা ক্যাশ হস্তান্তর। বলা হ'ল, এত রাত্রে আর ক্যাশ মেলান হবে না। কাল প্রত্যুষে প্রাক্তন গভর্নর কোম্পানীর যা কিছু নগদ ক্যাশ—নতুন লাটকে পাই-পয়সা বুঝিয়ে দেবেন। আর সঙ্গে সঙ্গে বুম্‌...বুম্‌...করে তোপ পড়তে লাগল।

এবং গোবিন্দপুরে তাঁর ভিটেয় বার বার অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে লাগলেন জনার্দন শেঠ। মনে হতে লাগল এই তোপের শব্দে কলকতার সন্ধ্যার শান্তি, ঝিঁ ঝিঁর ঐকতান—যেমন বার বার ভেঙে যাচ্ছিল এই নতুন গভর্নরের আমলে তাঁরও শান্তি তেমনি বিঘ্নিত হবে।

হলও। এ্যন্টনি ওয়েল্টডেন ঝানু লোক। একদা বোম্বেটেগিরি—যাকে বলে বিনা সনদে ব্যবসা—ইণ্টারলোপারের কাজে তিনি বিশেষ রপ্ত ছিলেন। অনেক ঘাটের জল খেয়ে তবে আজ তিনি কলকাতা কাউন্সিলের বহু আকাঙ্খিত পদটি কুক্ষিগত করতে পেরেছেন। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয় এ জ্ঞান তাঁর ছিল। লণ্ডনের হেড অফিসেও তিনি সেই বিদ্যায় পাঠ নিয়ে এসেছেন। কলকাতার ব্যাপারে

অনেক কিছু তাঁকে আগেই ওয়াকিফ্‌হাল করে দেওয়া হয়েছে খাস বিলেত থেকে। এখানে এসেও দেখেন যেদিকে তাকান সেদিকেই জনার্দন শেঠ। মাল কেনো, মাল বিক্রি কর, কোম্পানীর নামে ব্যবসা কর—বেনামে ব্যবসা কর, জনার্দন শেঠ শাঁখের করাত। আসতে কাটে যেতে কাটে। দু'দিক দিয়েই কিছু হাতে আসে শেঠ মশায়ের।

গভর্নর ওয়েন্টডেন নিজে আরও পাকাপোক্ত লোক। তিনি দেশী লোককে পাকড়ালেন। লোকটির কথা আগেই বলা হয়েছে। জগত দাস। সাহেব নিজের ব্যূহ নিজে সাজাতে লাগলেন। অবশ্য জনার্দন শেঠও কম কেওকেটা নন। যতই ব্যবসা চালাক কোম্পানী, শেঠজী ছাড়া সবই খট খট লবডঙ্কা। আর সেই সব বুঝেই ত আগেকার রাসেল বা জন বিয়ার্ড জেনেশুনেও তাঁকে সহ্য করতেন। লণ্ডন থেকে বার বার চিঠি আসা সত্ত্বেও।

জনার্দন শেঠ শুধু করিৎকর্মাই নন। কলকাতার বনেদী বড়লোক। একেবারে খাস কলকাতার আদিবাসিন্দা বলতে হলে শেঠ-বসাকদের কথা বলতেই হয়। শেঠ বংশের আদিপুরুষ মুকুন্দরাম। উইলসন সাহেবের মতে অষ্টম পুরুষে এসে কেনারাম। তাঁরই তিন পুত্র—জনার্দন, বারানসী আর নন্দরাম। কলিকাতাস্থ তন্তুবায় জাতির ইতিহাস রচয়িতার মতে কিন্তু জনার্দনের পিতার নাম কিরণচন্দ্র। এবং কিরণ চন্দ্রের ছয়টি পুত্র। ওর মতে জনার্দনের স্ত্রীর নাম দ্রৌপদী। উইলসন সাহেব বলেছেন ট্রুমুমনি। এবং বৃন্দাবনে বাঙালী তীর্থ যাত্রীদের জন্য তাঁর দাক্ষিণ্য সুবিদিত। কোত্‌রুং (Katrunga) এ শেঠপত্নীর তৈরী করিয়ে দেওয়া দ্বাদশ শিবের মন্দিরের কথাও বলেছেন সাহেব।

জনার্দন শেঠ সুপুরুষ। চমৎকার গড়ন পেটন। শালপ্রাংশু মহাভুজ। তেমনি চালাক চতুর। কাজে কর্মে ছোটবেলা থেকেই ভীষণ চটপটে। ব্যবসা পত্তরে সাফা মাথা। কাজেই কোম্পানীর

দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন এ আর বিচিত্র কি ? তাছাড়া জনার্দনের রক্তে ব্যবসা। তাঁরা আগে বরানগরে তাঁতিদের দাদন দিয়ে কাপড় তৈরী করিয়ে বিদেশী বণিকদের সরবরাহ করতেন। তাই তাদের বলা হত দাদনি বণিক। মুকুন্দরাম কলকাতার কালীঘাটে এসেছিলেন সাতগাঁ থেকে। সঙ্গে এসেছিলেন বসাকদের আদিপুরুষ কালিদাস। তাঁরা সঙ্গে করে আনেন গৃহদেবতা গোবিন্দজীউকে। সেই ঠাকুরের নামেই নাকি এখনকার ফোর্ট উইলিয়মসংলগ্ন এলাকার নাম হয়ে যায় গোবিন্দপুর। ষোলশ' বত্রিশ সালে নাকি নবাব দরবার থেকে পাট্টা আনিয়ে শেঠেরা এখনকার অকটারলোনি মনুমেন্টের প্রাঙ্গনে সারি সারি তাঁত বসিয়ে ফেললেন। ব্যবসা ফালাও চলতে লাগল।

সে যাই হোক, জনার্দন শুধু পুরনো কারবারে বন্দী হয়ে থাকেন নি। কোম্পানী একটু জাঁকিয়ে বসতেই, তিনি সেখানে ঢুকে পড়লেন। তার মানে অবশ্য এ নয় তিনিই কোম্পানীর প্রথম দালাল। জনার্দনের আগে ছিলেন দীপচাঁদ ভল্লা। বিখ্যাত পাঞ্জাবী ব্যবসাদার, ক্লাইভের দোস্ত উমিচাঁদের ভাই। সেকালের কোম্পানীর কাগজপত্রে দেখা গেছে সতেরশ' চার সালের মে মাস নাগাদ দীপচাঁদকে নিয়োগ করা হয় দেশী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কোম্পানীর হয়ে কাজ কারবার দেখাশোনা করার জন্যে। মাইনে নয়, কমিশন ঠিক হ'ল নীট আমদানি মালের মূল্যের ওপর টাকায় আধ পয়সা। শুনতে বড় কম হলেও এতেও আমদানি বড় কম হত না দালালদের। এ ছাড়া দেশী ব্যবসায়ীদের কাছে সেই সমান হারে কমিশন নেবার অধিকারও দালালদের দেয় কোম্পানী।

দীপচাঁদের এই সৌভাগ্য বেশী দিন টেকেনি কেননা সতের-শ' ছয় সালের অক্টোবর মাসে তাঁর এন্তেকাল হয়। আর তাঁরই কাজটা পেলেন শেঠ বড়কর্তা জনার্দন। কাজ ত পেলেন। কিন্তু কাজটা কি ? দালালী ব্যাপারটা কি আর একটু খুলে বলা দরকার। জন কোম্পানী কলকাতা থেকে মাল কিনবে। তাদের জাহাজ এসে

ভিড়বে কলকাতার জাহাজঘাটায়। তার জন্যে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে চষে ফেলে মাল যোগাড় কর। তার গুণাগুণ সব লিস্ট করে সেগুলো প্যাক করে গরুর গাড়ী, মোষের গাড়ী করে কোম্পানীর গুদামে পাঠাও। সেখানে সাহেব গুদামবাবু আছেন, তাঁকে মাল বুঝ্ দাও। সূতো বলো। কাপড় বলো। সব ভালো করে প্যাক করে জাহাজে তুলে দেবার দায়দায়িত্ব সব দালাল মশায়ের। সূতো যেন মিহি হয়। সোরা যেন মিহি হয়। সব দেখবে দালাল।

কিন্তু শুধু হাত কি মুখে ওঠে? না, কেউ আধ পয়সা দালালীতে (গোটা তিনেক টাকা নাকি মাইনেও পেতেন জনার্দন) এত ঝক্কি-ঝামেলা পোয়াতে চায়? অন্ততঃ জনার্দন শেঠ তা' চাইতেন না। অনেকের অভিযোগ কোম্পানীর কাজের তদারকা করতে করতে বেশ একটা পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করে ফেলেছিলেন শেঠ বড়কর্তা। মাল বিক্রী করতে চাও? করো না। তবে কিনা আমি ছাড়া কোম্পানীর মাল কেনবারও আর লোক নেই বাছা। আমি অবশ্য তার জন্যে কমিশন খাব। রেটটা কি? সেটা বাবা আমিই ঠিক করে দোব। তারপর আবার কোম্পানীকে আমার দরে সেসব মালপত্র বিক্রী করব। তার পর কোম্পানীর ধার্য করা টাকায় আধপয়সা দালালী ছেড়ে দেব? এত বড় ধর্মপুত্তর যুধিষ্ঠির আমি নই বাপু! কি ব্যাপার? তুমি খাস কোম্পানীকে মাল বিক্রি করবে সরাসরি। তা কি করে হয়? আমার লেজে পা পড়লে ছোবলাব না, একি হয়? দরকার পড়লে, তোমার বাড়িতে আগুন লাগাব। তোমার মালবোঝাই গরুর গাড়ি লুঠ করাব—আরে বাপু, আত্মরক্ষাই কি শ্রেষ্ঠ ধর্ম নয়? শাস্ত্র কি বলে? এইসব অভিযোগ করেছেন সাহেবরা।

বাঙালী দালাল জনার্দনের কীর্তিকাণ্ড এইখানেই শেষ নয়। আরও আছে। সেকালে প্রায় সব সাহেবেরই নিজের ব্যবসা ছিল। তারাও মাল কিনে বিলেতে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে বেশ পয়সা কামাত। তাদেরও মাল দিতেন জনার্দন। দরটা অবশ্যই একটু চড়া। তা' তোমরা

ত জাহাজের কাপ্তেন। এ'সব তোমাদের উপরি আয়। একটু চড়া দাম দিলে ক্ষতিটা কি তোমাদের—শেঠের অকাট্য যুক্তিটা অনেকটা এইরকম।

শেঠজীর দালালীর লীলাক্ষেত্র আরও বিস্তৃত। স্বয়ং জনকোম্পানীকেই তিনি বেশ ছুয়ে নিয়েছিলেন। সেটা একটা মজার ব্যাপার। ঔরঙ্গজেব যখন দাক্ষিণাত্যে লড়াই করছিলেন, তখন তাঁর টাকার ভারী টান। তাঁর খুব বিশ্বস্ত অনুচর মুর্শিদকুলি খাঁ। খাঁসাহেব তখন বাঙলাদেশের সিক্কা টাকা ছুঁয়ে মুষে দক্ষিণদেশে পাঠাতে লাগলেন। সে সময় ইংরেজরা একরকম টাকা বানাত মাদ্রাজের কাছে আর্কটে। আর্কটের টাঁকসালে তৈরী টাকা বলে তাকে বলত আর্কটী টাকা। সেই টাকা তখন বাঙলাদেশে চলত না। তবে টাকাটা শেষবেশ মাদ্রাজে যেত বলে আর্কটী টাকা এই সুযোগে ইংরেজরা বাঙলাদেশে চালিয়ে দিলে।

কিন্তু এমন সময় একটা অঘটন হয়ে গেল। সম্রাট ঔরঙ্গজেব কবরস্থ হলেন। লড়াই ত বন্ধ হয়ে গেল। আর বন্ধ হয়ে গেল বাঙলা-দেশের বাজারে আর্কটী টাকার চলন। কেউ নিতে চায় না। নেয় ত কম দাম দেয়। ধরাটি চায়। আর মস্ত মোকা পেলেন অঢেল টাকার মালিক জনার্দন। এই বাট্টায় কারবার করে—আর্কটী টাকার এই ছরকটের সুযোগ নিয়ে জনার্দন বেশ কিছু টাকা দু হাতে কামিয়ে নিলেন।

কিন্তু এইভাবে শেঠজী শুধু পয়সাই করেন নি। পসার প্রতিপত্তিও করেছিলেন। করেছিলেন যে, তার প্রমাণ সতেরশ' নয় সালের একটি ঘটনা। শের বুলন্দখাঁ তখন সুবে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার কর্তা হয়ে আসছেন। গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে। মীর মুহম্মদ রাজা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন বালেশ্বর। পথে হুগলী। মীর মুহম্মদ রাজা—শের বুলন্দের দোস্তলোক। খাতিরের লোক। আর ইংরেজদের ওপর কম সদয় নন। এখন কে যাবে ইংরেজদের হয়ে মুঘল দরবারে দৌত্যে। এই বাঙালী দালাল জনার্দন শেঠ। মুঘল দরবারে ইংরেজদের সেই সনাতন আর্জি—বিনা শুল্কে ব্যবসা, সেটা

দেবার জন্য তদ্বির—সবই করতে বলা হ'ল জনার্দনকে। যাবার সময় তাঁর হাতে পাঁচশো টাকার একটা উপহার তুলে দেওয়া হ'ল রাজার হাতে দেবার জন্যে।

যথাসময়ে দুর্গা স্মরি' নৌকা দিল ছাড়ি। শেঠজীর বহর হুগলীর অভিমুখে যাত্রা করল। এবং দেখা গেল কাজ ভালোভাবেই সমাধা করে এসেছেন। দিন দশেক পরে যখন হুগলী থেকে ফিরে এলেন সঙ্গে করে আনলেন মীর মুহম্মদ রাজার স্বহস্তে লিখিত পত্র। রাজা সাহেব কাউন্সিলকে জানিয়েছেন কোম্পানীর কাজ তিনি নিজের কাজ বলেই মনে করেন। এবং ভবিষ্যতেও তাই করবেন।

দেখা যাচ্ছে, একাজ শুধু একবারই নয়। কয়েকবারই করেছেন। যদিও এ'সব কাজের জন্যে জন কোম্পানী গাঁটের কড়ি খরচ করে উকিল পুষত মুঘল দরবারে। সেটা সতেরশ' দশ সালের কথা। মাঝে গভর্নর ওয়েন্টডেন এলেন এবং গেলেন। শুধু জগত দাসকে নয়, দালাল জনার্দন শেঠকে প্যাঁচে ফেলার নানারকম চেষ্টা করে গেলেন। তারপর রাসেল হলেন কলকাতা কাউন্সিলের বড়কর্তা। এই সময় জিয়াউদ্দিন খাঁ হয়ে এলেন হুগলীর ফৌজদার। কিন্তু কে যায় হুগলীর নতুন ফৌজদারের কাছে ইংরেজদের হয়ে দরবার করতে। মে মাসের শেষাশেষি। ফোর্ট উইলিয়মে জোর সভা বসে গেল। জোর মিটিং। সর্বসম্মতিক্রমে সেই সভায় ঠিক হল যে এই কাজের জন্যে আর কেউ নয় স্বয়ং জনার্দন শেঠই যাবেন কোম্পানীর হয়ে ফৌজদারের কাছে তাঁদের নজরানা নিয়ে। আর সেই তক্কে বলা বাহুল্য কোম্পানীর সেই বাঞ্ছিত ফরমানের কথাটাও শেঠ হুজুর সকাশে পেশ করে আসেন যেন।

মুঘলাই কাবাজোব্বা বিঁড়ে পাগড়ি পড়ে কোম্পানীর বড় দালাল জর্নাদন শেঠ আবার হুগলী গেলেন এবং কয়েকদিন পরেই বহাল-তবিয়তে ফিরে এলেন। জিয়াউদ্দিন খুব খুশীমনেই তাঁকে গ্রহণ করেছেন। আর তাজ্জব কি বাত, স্বয়ং ফৌজদার কলকাতায় পায়ের

ধুলো দেবার বাসনাও প্রকাশ করেছেন। তবে কথা আছে। ফৌজদার আগে কখনও কলকাতা আসতে পারেন না। কোম্পানীর কাউন্সিলের কর্তাদের আগে যেতে হবে হুগলী। গললগ্নীকৃতবাস হয়ে বলে আসতে হবে, নিমন্ত্রণ করে আসতে হবে ফৌজদার সাহেবকে তবেই ত হুজুর আসবেন। কোম্পানী কাউন্সিলের দু'জন সদস্য চিট্টি আর ব্লাউন্ট তড়িঘড়ি হুগলী চলে গেলেন। আর সেপ্টেম্বর মাসে জিয়াউদ্দিন খাঁ সত্যিসত্যি এলেন কলকাতায়। এখনকার কলুটোলা স্ট্রীট আর চিৎপুরের মোড়েব বিরাট বালাখানা বাড়িতে ফৌজদার এসে উঠেছিলেন। এখনও ঐ জায়গাটাকে বালাখানা বলে। আর ওখানে বিক্রি হয় বলেই ঐ জায়গার ডাকসাইটে তামাকের নাম বালাখানার তামাক!

জনার্দন শেঠ শুধু টাকাই করেন নি। খয়রাতও করেছিলেন। বোধ হয় কবিয়েও ছিলেন। সেটা সংবেশ' এগার সালেব কথা। কলকাতায় চালের দর চড়ে গেল। দেশী লোকের ভারী কষ্ট। কোম্পানী পাঁচশ' মন চাল দান করল। দান করলেন শেঠজীরাও।

সে সময় কলকাতার রাস্তাঘাট তৈরী বা বজায় রাখার জন্যে কোম্পানা টাকাকড়ি খরচ করতে চাইত না। চাইত না এই কারণে যে তাহলে তবিল থেকে টাকা বার করতে হয়। সেটা বিলেতের একদম নিষেধ। তখন কলকাতার রহিস বাসিন্দারাই এইসব কাজ করতেন। শেঠজীকেও এই সব কাজে তৎপর হতে হয়। জনার্দন শেঠের আমলেই গোবিন্দপুরে শেঠদের বাগান তৈরী হয়। এটা ছিল একশ' দশ বিঘা মতন জমির ওপর। জনার্দনের সরিকরা ছিলেন—গোপাল, যত্নু, বারানসী ও জয়কৃষ্ণ। এর জন্য লেখালিখি করে জনার্দন কোম্পানীর কাছারিতে গিয়ে বিঘে পিছু আট আনা একুনে পঞ্চান্ন টাকা খাজনা কমিয়ে নেন। তবে এর বিনিময়ে ফোর্ট উইলিয়ম থেকে এখনকার বড়বাজার—চিৎপুর রোডের দীর্ঘ রাস্তাটা তাঁরা প্রয়োজনমত মেরামতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সে সব না হয় হ'ল। কিন্তু বঙ্গনন্দন জনার্দনের সঙ্গে বিলিতী বড়কর্তা

এণ্টনি ওয়েল্টডেনের টক্করের কি হ'ল? যাই হোক, একটা ব্যাপার খুবই পরিষ্কার। জন কোম্পানীর দালালী থেকে শেঠজীকে সরাতে পারেন নি ওয়েল্টডেন। ওয়েল্টডেন খুবই লড়ুয়ে লোক। দ্বীপময় ভারতে একবার বোম্বেটেগিরি করতে গিয়ে শুধু তাঁর টুপির জন্য তিনি জানে বেঁচে যান। কাজেই ভয় খাওয়া তাঁর ধাতে নেই। তবু দেখা গেল তিনি পারেন নি। পারেন নি বোধ হয় এই কারণে যে মাত্র সাড়ে সাত মাস বাঙলাদেশে রাজত্ব করার সময় নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়ার জন্য এতই ব্যস্ত ছিলেন যে সব নজরটা তিনি জনার্দনের পিছনে ব্যয় করতে পারেননি। বোধ হয় ক্ষুরধারবুদ্ধি জনার্দন সেটা জানতেন তাই কোনরকম বাধা দেননি। হার্পসিকর্ডের বাজনা শুনে সঙ্গে করে আনা একটন বই-এর পাতা উল্টে, বিলিতী মদের রসাস্বাদন করতে করতে এবং ছেলের একটা পাকা চাকরী করে দিয়ে ওয়েল্টডেন দিব্যি কাটাচ্ছিলেন, জনার্দন তাতে বাদ সাধেন নি। কলকাতার এই গভর্নর সম্বন্ধে অনেক কথাইত আগে বলা হয়েছে তবে অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত ইংরাজ আগন্তুক আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন তাঁর দুই খণ্ডের ভ্রমণ বিবরণে যা' বলেছেন তার কিছুটা শুনিয়ে দিলেই বোঝা যাবে ওয়েল্টডেন কি চিজ! হ্যামিলটনী কেচ্ছার মোদ্দা কথা হচ্ছে, এণ্টনি ওয়েল্টডেনই বল আর রালফ্ শেলডনই বল, সবাই চোরের রাজা—'করাপ্ট-কূল-চূড়ামণি'!

ওয়েল্টডেনের গল্পটা হচ্ছে এই। সতেরশ' দশ সালের কলকাতায় কোন দরিদ্র ইংরাজ নাবিকের স্ত্রী ছিল অনিন্দ্য সুন্দরী, আশ্চর্য রূপসী। একেবারে ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো। এবং চিরকাল যা' হয়, সেই 'বিড়ালাক্ষী বিধুমুখীর' চারিদিকে মধুভাণ্ডকে ঘিরে লোভী মৌমাছির মত বহু তরুণ প্রেমপ্রার্থী যুবকের কূজনগুঞ্জন শোনা যেত। হতভাগ্য স্বামীত পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে ঘুরে বেড়াত আর প্রোষিতভর্তৃকা তরুণী বধূটির বিরহের অবকাশ কাল এমনি বহু বিচিত্র প্রণয়লীলায় মুখর থাকত। এমনি করেই ব্যাপারটা চলত যদি না সেদিনের

কলকাতায় বৃক্ষবেষ্টিত সদর রাস্তায় এই বধূটির প্রেমিক দুই আরমানী যুবকের মধ্যে একটা হাতাহাতি হয়ে যেত। জগৎ সিংহ আর ওসমানের দ্বন্দ্ব আর কি। এক আকাশে দুই চন্দ্রের অস্তিত্ব অসম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে খিস্তি খেউড়ের বিপুল সমারোহ ত ছিলই।

এতক্ষণ গভর্নরের কোন ভূমিকা ছিল না। কিন্তু এই ছিদ্রপথে শনি মহারাজের মতই তিনি ঢুকে পড়লেন! খোলা রাস্তায় এইসব বিশ্রি কাণ্ড? সমাজধর্মের রক্ষাকর্তা তিনি, আর চুপ করে বসে থাকতে পারেন নাকি? কোতোয়াল পাঠিয়ে দু'জনকেই ডেকে এনে প্রচুর ধমকালেন। কিন্তু দ্বৈরথের এক রথী নাছোড়বান্দা। প্রতিপক্ষ বিদায় নিলে সে গভর্নরের কাছে ফিরে এসে অনুনয় করে বললে, বধূটি ছাড়া তার জীবন রাখার কোন মানেই হয় না। এবং নীতিবাগীশ ওয়েল্টডেন যত ধমকান সে ততই তার মনোবেদনার কথা বলে। এবং শেষবেশ সে মোক্ষম টোপ দিলে; গলা খাদে নামিয়ে বলে থাকবে, আপনার 'ফি' এনেছি স্যার। ব্যাস আর যায় কোথা। মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত, গভর্নর যেন আর সে মানুষই নন। শুধু জিজ্ঞাসা করে থাকবেন, হাউ মাচ? কত? আরমানী ছেলেটি সত্যিই তুখোড়। মুখে জবাব দিলে না। গুনে গুনে পাঁচ শ' টাকা গভর্নরের হাতে গুঁজে দিলে। আর ওয়েল্টডেনের সানন্দ সম্মতিসহ গরীব খৃষ্টানের পরিণীতা বধূটির ষোল আনা অধিকার লাভ করে ছোকরা হুগলী পালিয়ে গেল।

আর সেই গরীব নাবিক যখন ঘরে ফিরে এসে কলকাতা কাউন্সিলের কাছে নালিশ করলে, গভর্নর তাঁকে খ্যাক খ্যাক করে তেড়ে এলেন। অম্লানবদনে পরামর্শ দিলেন, জল ঘোলা করে লাভ নেই। বউটিকে 'ডিভোর্স' কর। এই আমাদের আদি, অকৃত্রিম একেবারে নিখাদ—গভর্নর এন্টনি ওয়েল্টডেন!

সেযাই হোক, এ'সব গল্প জনার্দন শেঠ জানতেন না তা নয়। তবে এ'সব নিয়ে ঘোঁট পাকাননি, কলকাতা কাউন্সিলে তাঁর যাতায়াত যথেষ্ঠ থাকা সত্বেও। শুধু নিজে নয়, মেয়ে-বউ এর হাত দিয়ে ঘুষ

নিয়ে টাকার যে কাঁড়ি তিনি কামিয়ে নিচ্ছিলেন, শেঠ মশায় তার প্রতিবন্ধক হননি। সেই কারণে দুই বীরপুঙ্গবের কোন 'শো ডাউন' হয়নি কলকাতায়।

তবে জনার্দন একবারে রেয়াত দেননি গভর্নর বাহাদুরকে। তাঁর বিদায় গ্রহনের পরই তাঁকে বেশ শিক্ষা দিয়ে দিয়েছিলেন। এবং ওয়েল্টডেনকে, শুধু ভাগ্যই নয়—জনার্দনও পথে বসিয়ে দিয়েছিলেন বলে মনে হয়। দেখা যাচ্ছে, তাঁর বিলাত যাত্রার ছয়মাস পরে 'ব্ল্যাক মার্চেন্ট'রা যাঁদের মুখপাত্র জনার্দন শেঠ, গভর্নরের কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা দাবী দিচ্ছেন। কোম্পানীর বড় কর্তারা সেই টাকাটা প্রত্যার্পণ করার জন্য হুকুম দিচ্ছেন ওয়েল্টডেনকে। অবশ্য শেষবেশ সে টাকাটা পেয়েছিলেন কিনা শেঠজা বলা শক্ত। তবু শেঠজার রোষ রাহুর প্রেমের মতই শেষ অবধি যে তাঁকে তাড়া করে নিয়ে গিয়েছিল, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই!

বানারসী শেঠ

অশৌচ অবস্থাতেই জনকোম্পানীর বড় দালালের চাকরীতে বহাল হয়ে গেলেন জনার্দন শেঠের মেজ ভাই বানারসী শেঠ। দাদা দেহরক্ষা করলেন ফেব্রুয়ারীর নয় তারিখে। সেবারের সেই শীতের সন্ধ্যায় শেঠ বাড়ীর ওপরই শুধু শোকের ছায়া নামলনা। সারা গোবিন্দপুরের মানুষই হায় হায় করে বুক চাপড়ে কেঁদে থাকবে। ইন্দ্রপতনই হল বুঝি আদ্যিকালের কলকাতায়। কিন্তু সেই উঠতি কলকাতার বোধ করি শোক করার সময় ছিল না। ইংরেজদের তখন দু'হাতে মুনাফা লোটবার কাল। ফসলের মরসুম। কাজেই তেরাত্তিরও পোহাল না। এগারই ফোর্ট উইলিয়ম কেল্লায় বসে কোম্পানী জনার্দনের শূন্যস্থান পূরণ করে ফেললেন। কোন রকম দেরী না করে কেল্লা থেকে পালকী এল বানারসী শেঠকে কোম্পানীর কাছারিতে ডেকে নিয়ে যেতে। কলকাতা কাউন্সিলের খাতায় দেখা যাচ্ছে—বানারসী শেঠের 'এ্যাপয়েন্টমেন্ট'টা প্রথমতঃ ছিল একেবারে 'টেম্পরারি'। সতেরশ' বার সালের এগারই ফেব্রুয়ারীর রেকর্ডে রয়েছে—অন দি নাইনথ ইনস্ট্যান্ট আওয়ার ব্রোকার (জনার্দন শেঠ) ডায়েড। দিস ইআরস বিজিনেস বিইং প্রেটি নিআর টু কনক্লুসন এণ্ড অল দি মারচেন্টস এ্যাকাউন্টস বিইং ইন হিজ ব্রাদার বানারসী শেঠস হ্যাণ্ডস্ এগ্রিড ছাট হি অ্যাকট ইন হিজ স্টেড এ্যাজ ব্রোকার ফর দিজ সিজন।' অর্থাৎ আমাদের দালাল জর্নাদন শেঠের মৃত্যু হয়েছে নয়ই। এ' বছরের ব্যবসাপত্তর এখন গুটোনর মুখে এবং ব্যবসায়ীদের কাগজ খাতাপত্র হিসেবনিকেশ যখন সবই তার ভাই বেনারসী শেঠের হাতে, তখন এই

সিদ্ধান্তই নেওয়া যাচ্ছে যে এই সালটার জন্যে তাঁকেই দালাল নিযুক্ত করা হ'ল।' খুব সম্ভব এই নিয়োগপত্র দেবার সময় কোন অনুষ্ঠান হয়নি। বোধ করি শেঠজার এটা শোকের কাল বলেই, কিংবা নিয়োগটা নিতান্তই কাঁচা বলে, একটা মুঘলাই শিরোপা, কিছু পানসুপারি দিয়ে কলকাতা ও সংলগ্ন গঞ্জের নানা মহাজনদের সামনে বারাণসী শেঠের অভিষেক অনুষ্ঠানটি স্থগিত ছিল।

তা' থাক, তবে দাদার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বেশ বহালতবিয়তেই রাজত্ব করেছিলেন বারাণসী কলকাতার হাটে-হাটে, গঞ্জ-বাজারে, মোকামে-মোকামে। তবে এটা মনে করা ভুল বারাণসী শেঠের সঙ্গে কোম্পানীর পরিচয় এই সময়েই হয়। সেটা সুরু কলকাতায় ইংরেজ কারবারের একেবারে সেই আদিকালে । তখন সেই রালফ্ শ্লেলডনের আমল। সতেরশ' তিন সাল। মে-জুন মাসের কথা। খাজনা আদায়ের ভার তখন রাভেনহিলস্ সাহেবের ওপর। সাহেবের মুৎসদ্দীর নাম মদন মিস্তির।

কি যেন কাজে এসেছিলেন কোম্পানীর কাছারিতে। হুঁকাবরদাররা তামাক দিয়ে থাকবে। বড় বড় পাখা নিয়ে হাওয়া করে থাকবে পাঙ্খাপুলাররা। কিন্তু সে দারুণ গ্রীষ্মের শ্বাস-ওঠা গরমে হাঁসফাঁস করতে লাগলেন শেঠজী। কাউন্সিলের সাহেবরা শেঠজীকে বেশ খানিকটা বসিয়ে রেখে লোকজন একটু সরিয়ে দিয়ে, একটু বা চাপা গলায় তাঁদের একটা সাক্ষাৎ সর্বনাশের কথা বলে থাকবেন। বললেন, শেঠজী, কলকাতার খাজনা ত তত উঠ্‌ছে না। অথচ আমাদের সদরদপ্তর লণ্ডনের হুকুম জানত? জমিদারী চালাবার খরচ কলকাতা কাউন্সিলকেই বহন করতে হবে। নয়তো বোর্ডের কড়া আদেশ, এই লোকসানের কারবার তুলে দাও! কাজেই উভয়সঙ্কট। কলকাতা জমিদারীর আয় না বাড়ালে ত আর গত্যন্তর নেই। কি করা যায় বলত বারাণসীবাবু? বারাণসী শেঠের ত দারুণ অবাক হবার পালা। আরে কি তাজ্জব কা বাত! বলে কি সাহেব, কলকাতা জমিদারীর

লোকসান ? তা কখনও সম্ভব নাকি ? আপনারা ঠিকমত খাজনা আদায়ই করতে পারছেন না, বা করছেন না।

কাউন্সিলের সাহেবদের কপিশ চোখে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠে থাকবে, তা' কি করে হয়, ই ক্যায়সা হোগা ? রাভেনহিলস্ সাহেব রয়েছে এই কাজে। সে কখনও গাফিলতি করতে পারে ?

বারাণসী শেঠ হাসলেন। বললেন, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। হয় কিনা হয়, তোমাদের এখুনি দেখিয়ে দিচ্ছি। কাছারির খাতাপত্র আনান। রাভেনহিলসের মুৎসদ্দী মদন মিস্তিয়ের কাছে এত্তেলা গেল। কাগজপত্র নিয়ে সেলাম করে দাঁড়াল সে কাউন্সিলে। শেঠ-জীর ত শহর কলকাতার সকল চৌহদ্দি নখদর্পণে। সেরেস্তার লাল খেড়ো-বাঁধা খাতার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন বারাণসী শেঠ। আর একের পর এক চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে লাগলেন, কেমন করে বিঘের পর বিঘে জমি, বসতবাটীর খাজনা কোম্পানী আদায়ই করছে না। কাউন্সিল সবিস্ময়ে দেখলে, একুনে কমসে কম একশ একত্রিশটি বাড়ী ও দু' শ' অষ্টআশি বিঘে জমির খাজনা আদায় হয়নি। হিসেবের কড়ি ত বাঘে খায় না। কাজেই কাউন্সিল ঘাড় হেঁট করে মেনে নিলে বারাণসী শেঠের মন্তব্য। এবং মেনে নিয়েই বসে থাকলে না। রাভেনহিলস্‌কে ডেকে পাঠালে। আর তারপর তেড়ে ধমক। ভেবেছ কি, নাকে তেল দিয়ে ঘুমুলেই কি চাকরি থাকবে নাকি ?

কাজেই দেখা যাচ্ছে, এত লোক থাকতে কলকাতার জমিদারীর ব্যাপারে যখন বারাণসী শেঠের সঙ্গেই সলাপরামর্শ করেছিল জন-কোম্পানীর কর্তারা, তখন তাঁরও কিছু মর্যাদা ছিল ইংরেজ মহলে। চাকরিটা কেবল দাদার সুবাদেই পাননি মেজ শেঠ। কিন্তু তা থাকলেও দাদার মত দালালি করতে পারেননি তিনি। তাঁর দালালি একটানা নয়, ছাড়াছাড়া, ভাঙা-ভরতি। এবং সে কাহিনী কম মজাদার নয়।

এটা সেই সতেরশ' এগার সালের গোড়ার দিকের কথা। বছর

পড়তেই জন রাসেল কোম্পানীর গভর্নরের তখ্‌তে গিয়ে বসলেন। শীতের কলকাতা বোধ করি আজকেরই মত বিষণ্ণ। ফোর্ট উইলিয়মের সামনে প্রবহমান গঙ্গায় কেমন যেন শীর্নতা। রোদের তেজ খোলস-ছাড়া সাপের মত নিরুত্তেজ। অন্ততঃ এই বিষণ্ণ ছবিই ভাসতে লাগল সদ্যনিযুক্ত গভর্নর রাসেলের মনে। বহুদিন যাবৎ কোম্পানীর একনিষ্ঠ খিদ্‌মদ্‌গারির পুরস্কার হিসাবে কলকাতায় গভর্নরের পুরস্কার তাঁর মিলেছে, কিন্তু তাতে তিনি খুশি হতে পারছিলেন কই। রোগ-শোকের কলকাতা, কলেরা, জ্বরজারির কলকাতা তাঁকে ক্ষুধার্ত শ্বাপদের মত তাড়া করে নিয়ে ফিরছিল। মশা-মাছি, বিস্তৃত জলাভূমি, বর্ষার বানভাসি, পচা মাছের রাশ আর তা' থেকে উপজাত এক অন্তহীন দুর্গন্ধ—সবকিছু মিলিয়ে যেন দিনরাত গা ঘোলাচ্ছিল রাসেল সাহেবের।

তিনিই সাদর অভ্যর্থনা করে এনেছিলেন এণ্টনি ওয়েল্টডেন সাহেবকে। আবার তিনিই মাস আটেক পরে 'শেরবোর্ণ' জাহাজে চাপিয়ে দিয়ে এলেন সেই ওয়েল্টডেনকে। মালপত্র বোঝাই করিয়ে দিলেন, আর তারপরই এসে বসলেন তাঁর নবলব্ধ গদীতে। কিন্তু কোন আনন্দের আভাষ ছিল না তাঁর রোগকাতর মুখখানায়। থাকবেই বা কি করে? সেকালের কলকাতা ত নয়, মৃত্যুপুরী! বিশেষ করে গোরাবরণ দেখলে তাদের প্রাণহননে যেন তৎপরতার অন্ত নেই এর দূষিত বাতাসের। কলকাতার 'গ্রেভইয়ার্ড'গুলো যেন তাদের কোল দিতে ব্যস্ত। এই ভিজে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া তাই একদম সহ্য হ'ত না রাসেলের। একটু ফাঁক পেলেই তিনি বেরিয়ে পড়তেন উজানে—হয় কৃষ্ণনগর, নয় আরও নীচে। গঙ্গার স্নিগ্ধ ফুরফুরে হাওয়ার বোটের মানুষগুলোর যেন ধাত ফিরত। সবাই বেশ স্বাস্তর নিঃশ্বাস ফেলতেন। ক'দিন এমনি বোটে করে' ঘুরে শরীরটা একটু সামলে উঠলে আবার কলকাতায় ফিরে আসতেন।

এমনি চলছিল গভর্নর রাসেলের। বছর দুই এমনই চলল। কিন্তু এমন সময় একটা দুর্ঘটনা এসে ঝড়ের মত সব ব্যবস্থা তছনছ করে

দিয়ে গেল। সতেরশ' তের। এপ্রিল। এমনই এক 'আউটিং'-এ রাসেলের স্ত্রী রেবেকা মারা গেলেন, চন্দননগরে। সেই বোটে করেই তাঁর নশ্বরদেহ কলকাতায় এনে সমাধিস্থ করা হ'ল শহরের কবরখানায়। কেল্লার যাজক এসে বাইবেল খুলে পড়লেন। দূরে আরমানীদের গির্জায় ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল শেষকৃত্যের—নিজের দেশের মাটি থেকে সাতসমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে বন-জঙ্গল ঢাকা বাঙলাদেশের মাটিতে সেই সোনারবরণ মেয়েটিকে চিরকালের জন্য শুইয়ে দেওয়া হ'ল। সেই শবানুগমনের সব কিছুই হ'ল ঠিক ঠিক, কিন্তু স্বয়ং গভর্নর জন রাসেল নিজেই হাজির থাকতে পারলেন না। তাঁর নিজের শরীরের এমনি সঙ্কটাবস্থা।

সে যাত্রা রাসেল সামলে উঠলেন বটে, কিন্তু তিনটি নাবালক ছেলেপিলে নিয়ে তাঁর তখন সসেমিরে অবস্থা। রাসেল বুঝলেন, এ'ভাবে বেশি দিন চলবে না। সোনার লোভে এই পোড়া দেশে পড়ে থাকলে এই প্রাণের মূল্যেই তা কিনতে হবে, তার কম দামে চলবে না। কাজেই ঐ বছরই তেসরা ডিসেম্বর কোম্পানীর কাগজপত্র, ক্যাশের টাকা আনা পাই, সব কিছু তাঁর পরবর্তী অফিসার রবার্ট হেজেসকে বুঝিয়ে দিয়ে কোম্পানীর চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দিলেন। অবশ্য পাকা লোক রাসেল। কোম্পানীর অপরাপর গভর্নরের হালহকিকত তাঁর অজানা নয়। কাজেই পদত্যাগের আগে তিনি কোম্পানীর কাছ থেকে লিখিয়ে নিলেন যে তাঁর কাছে কোম্পানীর কোন পাওনা-পত্র নেই। আর তারপর তিনি তাঁর পদত্যাগ পত্র পেশ করলেন।

এই রবার্ট হেজেস বাঙলাদেশের খুবই পরিচিত ব্যক্তি। তিনি এদেশে এসেছিলেন তাঁর কাকার সঙ্গে। বাঙলাদেশের ইংরেজ কুঠীগুলো দেখার জন্যে প্রথম যে পৃথক কাউন্সিল গঠিত হয়, উইলিয়ম হেজেস তার বড়কর্তা হয়ে এসেছিলেন। আর তাঁরই সঙ্গে এসেছিলেন রবার্ট। কাকাই তাঁকে কাজে ঢুকিয়ে দিয়ে যান। তখন সপ্তদশ শতাব্দীর নাভিশ্বাস উঠছে। শেষ হতে কয়টা বছর মাত্র বাকি। আর সেই

থেকেই এই কোম্পানীর চাকরিতে গুনটেনে পড়েছিলেন রবার্ট এবং রাসেল দেশে ফিরে গেলে সেই কলকাতা কাউন্সিলের পয়লা নম্বর 'পোস্ট'টা তাঁর বরাতেই জুটে গেল।

জন রাসেল চলে যেতেই তাঁর লোকেদের কপাল ভাঙল। ওয়েণ্টডেন আসতেই জগত দাসকে যে নাজেহাল হতে হয়েছিল, বারাণসীর দাদা জনার্দনকে যে যথেষ্ঠ নাকানিচোবানি খেতে হয়েছিল, সে খবর আমরা আগেই পেয়েছি। রবার্ট হেজেস আসতেই কপাল ভাঙল বারাণসী শেঠের। রাসেল নিজে খানিকটা ব্যবসাবাণিজ্য বুঝতেন। রবার্ট বোঝেন কোম্পানীর হুকুম। একেবারে কর্তাভজা লোক। লণ্ডনের লিডেনহল স্ট্রীট থেকে 'অরডার' এসেছে—ব্যস্ হেজেসের তাই বেদবাক্য। তার আর নড়ন চড়ন হবে না। লণ্ডন থেকে অনেক দিন যাবৎই কত্তারা তাগিদ দিচ্ছিলেন যে কলকাতার কোম্পানীর কালা দালাল বেটাকে তাড়াও। কালা জমিদারকে গলাধাক্কা দাও। এদের জন্যেই কোম্পানীর লাভের গুড়ের বেশ খানিকটা পিঁপড়েয় খেয়ে নিচ্ছে। যতটা লাভ হওয়া উচিত, হচ্ছে না। রাসেলকে বলে বলে কাজ হয় নি। কিন্তু রবার্ট হেজেস গদীতে বসেই—রাজাসনে উঠি কহিলেন বীর—দুজনকেই বিদেয় করে দাও। আর বিনা কালক্ষেপে কালা জমিদার রামভদ্র আর দালাল বারাণসী শেঠের চাকরী চলে গেল।

রামভদ্রের বিরুদ্ধে কোম্পানী একহাত নেবার চেষ্টা করেছিল। পাকেচক্রে তার কিছুই হয় নি। সে গল্পত আগেই বলা হয়েছে। বারাণসী শেঠের বিরুদ্ধে অবশ্য তেমন কোন 'অভিযানের' খবর পাওয়া যায় না। বোধকরি, তেমন কিছু করা যায়নি। করা যায়নি এই কারণে যে শেঠজাদের জাল এমনি ছড়ান থাকত যে তাতে আইনত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা অসম্ভব। লণ্ডন থেকে কোম্পানী জানাচ্ছে যে তাদের কাছে খবর এসেছে, যেসব মাল কোম্পানীর কাছে দালালি নিয়ে তারা কিনে দিয়েছে, তার অর্ধেকটা শেঠ বা শেঠ পরিবারের লোকেরাই বিক্রি করেছে। 'উই

আর টোল্ড ছাট হিজ (ব্রোকারস) ফ্যামিলি এ্যাণ্ড রিলেটিভস সোল্ড টু-থার্ডস অর এ্যাট লিস্ট হাফ দি গুডস ইয়ারলি প্রোভাইডেড'। কোম্পানীর আরও অভিযোগ—'দে মাইট হ্যাড দেয়ার ওন রেটস ফর দেয়ার গুড্‌স'। অর্থাৎ—তারা তাদের নিজেদের দরেই কোম্পানীকে মাল বিক্রি করেছে। এবং এ' ছাড়াও অভিযোগ ছিল, নতুন কোন দাদনি বনিককে তারা কোম্পানীর রাজত্বে ঢুকতে দিত না।

বলা বাহুল্য, একাজ জনার্দন শেঠও করেছিলেন। এবং দাদন দিয়ে কাপড় তৈরী করান শেঠেদের কিছু নতুন কারবার নয়। পুরুষানুক্রমিক ব্যাপার। তাঁদের শুধু ইংরেজদের দেখলেই হবে না, অধীনস্থ তাঁতিদেরও দেখতে হয়, কাজেই বারাণসী শেঠকে পাকড়াও করার মধ্যে জন কোম্পানীর একটা দৃঢ়মূল অবিশ্বাস এবং অসহায়তা ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। কোম্পানীর অভিযোগের সারবত্তা উইলসন সাহেব নিজেই নস্যাৎ করে লিখেছেন যে সতেরশ' এগার সালে তেতাল্লিশ হাজার পাউণ্ডের মাল ফ্রান্সের বাজারে বিক্রি হয় একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডে। এর চেয়ে আর কি বেশী লাভ চায় জন কোম্পানী? সাহেব বলছেন, 'দি অ্যাকিউজিসনস অব কোর্ট ওএর আনফাউণ্ডেড এণ্ড নো বেটার ম্যান কুড বি ফাউণ্ড ফরদি পোষ্ট (অব দি ব্রোকার) অর্থাৎ কোর্টের অভিযোগগুলি ছিল নিতান্তই অমূলক এবং দালালের পদের জন্যে এর চেয়ে আর ভালো লোক পাওয়া সম্ভব ছিল না।

সম্ভব যে ছিল না, ঘটনা পরম্পরায় সেটাই প্রমাণ হয়ে গেল। বারাণসীকে ছাড়িয়ে হেজেস যাকে নিয়োগ করলেন তাঁর নাম রামকৃষ্ণ খাঁ। খাঁমশায়ের কপালে এই চাকরি বেশী দিন টেকেনি। কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটল। তাঁর জায়গায় অনেক বিচার বিবেচনায় পর হরিনাথকে নিয়োগ করা হল। কিন্তু তাঁর সেবাও বেশী দিন সয়নি কোম্পানীর কপালে। কয়েক বছরের মধ্যেই আবার ডাক পড়ল সেই বহুনিন্দিত দালাল বারাণসী শেঠের। চৌদ্দই এপ্রিল। সতেরশ' উনিশ।

এবং দেখা যাচ্ছে, জ্যেষ্ঠের পদাঙ্ক অনুসরণ করে' বারাণসী শুধু কোম্পানীর দালালগিরিই করেননি, কোম্পানীর জটিল দৌত্যে গিয়েছিলেন হুগলীর ফৌজদারের দরবারে। দিল্লীর মুঘল সিংহাসন নিয়ে তখন খুবই ডামাডোল চলেছে। বাহাদুর শা' মারা গেছেন। দীর্ঘসূত্রতার দায়ে বোধ হয় আজিমুশ্বানের হাতে এসেও তখত-ই-তাউসটা জাহান্দর শার কবলে গিয়ে পড়েছে। পাটনা থেকে ফরুখশীয়র মুঘল মসনদের জন্য হাত বাড়িয়েছেন। এমন সময় হুগলীর ফৌজদারের পানসীতে করে এক গোমস্তা এল গোবিন্দপুরে। খাঁসাহেবের জানা বাড়ী। শেঠেরা অনেকবারই গেছেন হুগলী। ফৌজদারের লোকও এসেছে শেঠবাড়ী। ফৌজদারের গোমস্তাকে সাদরে আহ্বান ক'রে শেঠজা জিগ্যেস করলেন, কি খবর? খাঁ সাহেব একটা শিলকরা চিঠি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ফৌজদার সাহেব আপনাকে স্মরণ করেছেন। বারাণসী শেঠ চিঠিটা খুলে পড়লেন। তারপর বললেন, আপনি আজ যান খাঁ সাহেব। আমি কাউন্সিলকে সব জিগ্যেস করে দেখি। ওঁদের কি হুকুম হয়। জানেনত চাকরি ক'রে খেতে হয়। খাঁ সাহেব ফেরৎ গেলেন।

পরদিন যথা নিয়মে চিঠিখানা কাউন্সিলে পেশ করলেন শেঠজা। এবং দেখা গেল, কাউন্সিলও বেশ সন্দিগ্ধ। ওই ডামাডোলের বাজারে আবার কি চাল চালবে হুগলীর মুঘল ফৌজদার কে জানে। জিয়াউদ্দিন খাঁ তখন হুগলীর ফৌজদার। ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর ভাব ভালোবাসা বড় কম নয়। তবু কাউন্সিল খোলা মনে চিঠিখানা নিলে না। বললে, এত লোক থাকতে বারাণসী শেঠকেই বা ডেকে পাঠালে কেন। চিঠিতে ব্যক্তিগত ভাবে নিমন্ত্রন করা হয়েছে বারাণসী শেঠকে। তাঁকে কিছু জরুরী তথ্য জানান হবে। জন রাসেল তখন গভর্নর। তিনি বললেন, দেখ বাপু মুঘলদের মতিগতি বোঝা ভার। তারা জানে শেঠ আমাদের বড় দালাল। আমাদের কাজ-কারবারের তিনিই বড় খুঁটি। ভালো মনে তিনি হুগলী গেলেন।

আর জিয়াউদ্দিন তাঁকে আটকে রেখে যদি বলেন, এত টাকা দাও। নয়তো তাঁকে ছাড়া হবে না। তখন? অনেকেরই কথাটা মনে ধরল। তখন অনেক বিচার বিবেচনা করে ঠিক হ'ল, হুগলীর দরবারে অন্য একজন কালা কর্মচারীকে পাঠান হোক। তিনি ফিরে এসে, ব্যাপার খোলসা করে জানালে তবে শেঠমশায়কে পাঠান হবে।

দেখতে দেখতে প্রায় বছর ঘুরে গেল। জন রাসেল তখন চন্দননগরে। জিয়াউদ্দিনের আবার চিঠি এল। এবারও বারাণসী শেঠকে পাঠাতে বলা হয়েছে। দিল্লীর দরবার থেকে কিছু জরুরী সংবাদ এসেছে সেই খবরটা তিনি জানাতে চান। তাই যেন শেঠমশায়কে হুগলীতে পাঠান হয়। এবার আর না করল না কোম্পানী। একজন সহচরসহ সেদিন সন্ধ্যায় বারাণসী শেঠ কাবাজোব্বা পড়ে হুগলী চলে গেলেন। ফিরে এলেন দিন দুই পর। খবর নিয়ে এলেন, জিয়াউদ্দিন এবার বাঙলা থেকে তলপি গুটোচ্ছেন। কেননা, মুঘল সম্রাট তাঁকে করমণ্ডল উপকূলের কাছে পশ্চিম ভারতের দেওয়ানী দিয়েছেন।

ব্যাপারটা সত্যিই রহস্যময়। মনে হয়, জিয়াউদ্দিনের ব্যক্তিগত কোন লেনদেনে শেঠজীর কোন হাত ছিল। যাবার আগে সেই সব কাজ মিটানোর জন্যেই তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন যেটা ধূর্ত বারাণসী শেঠ বা হুগলীর ফৌজদার কেউই কোম্পানীর কাছে ভাঙেনি। এবং এই থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, সেকালের সারা বাঙলাদেশেই শেঠ মশায়দের প্রভাব ছিল কতটা।

তবে ব্যক্তিগত সাহায্য শেঠরা যে শুধু নবাব-তরফকেই করতেন, তা নয়। সেকালের পুরনো দলিল দস্তাবেজের সাক্ষ্যে দেখা যাচ্ছে, বিপদে-আপদে, প্রয়োজন পড়লে অনেক সাহেবকেও সাহায্য করেছেন বারাণসী। যশিয়া চিট্টি হচ্ছেন কলকাতা কাউন্সিলের মাননীয় সভ্য। তাঁর চাকরি গুদামের অধ্যক্ষগিরি এবং কলকাতার বক্সী বা খাজাঞ্চী-গিরি। ব্যাপারটা কদিন যাবৎ কানঘুষা শোনা যাচ্ছিল। এবং

শেষবেশ রাসেল সাহেব আর সেটাকে উড়িয়ে দিতে পারলেন না। এবং একটু খোঁজ খবর নিতেই দেখা গেল যা রটেছিল, তার কিছুটা নয়, সবটাই ঠিক। চিট্টি ক্যাশ ভেঙেছেন। কি সর্বনাশ! সাময়িকভাবে তাঁকে বসিয়ে স্যামুএল ব্রাঁউকে তাঁর কাজকর্ম দেখাশোনা করতে দেওয়া গেল। দেখা গেল, শুধু ক্যাশের টাকা নয় কোম্পানীর গুদামেও খাতা মোতাবেক মালপত্র নেই। সব খাতেই মাল 'শর্ট'। হিসেব ক'রে ধরা পড়ল, একা কোম্পানী তাঁর কাছে সাত হাজারের উপর টাকা পাবেন। চিট্টিকে সে কথা বলা হ'ল। চিট্টি দোষ কবুল করলেন। টাকার ব্যাপারে বললেন, আসছে মাসে মিটিয়ে দেবেন।

কিন্তু যাকে বলে 'ডিসিপ্লিনরি এ্যাকশন' তার কি হবে? জনকোম্পানীর কেতাদুরুস্ত কর্তারা খাতাপত্র হাঁটকে এই সব অপরাধে সতেরশ' দুই সালের দেওয়া কোম্পানীর একটা নির্দেশ বার করে চিট্টিকে বিদেয় করে দিলে। এবং পাওনা টাকাটার জন্যে একটা খত লিখিয়ে নিলে। বছরে শতকরা বার টাকা সুদ।

ব্যাপারটা সম্বন্ধে আরও একটু গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল, সেকালের সকল 'ফ্যাকটর'ই যা করত, চিট্টি তাই করেছিলেন। কোম্পানীর টাকায় ব্যবসা ক'রে বড়লোক হবার রঙীন স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু বিধি বাম। তাঁর ওড়াও হল না, পাখা দুটোও পুড়ে গেল। বাজারে প্রায় ষাট হাজার টাকার দেনা। সাহেবের নানা মূল্যবান জহরত ছিল। কিস্তিতে কিস্তিতে সেগুলি বিক্রী করেও দেনা মিটল না। বাড়ীঘরে টান পড়ল। তাতেও হ'ল না। তখনও দেনা বাকী। মানিকচাঁদ শা প্রায় সাত হাজার টাকা পাবেন। অথচ সাহেব বিলেত যেতে ব্যস্ত। শরীর গতিক খারাপ। যা হয় ক'রে দেশে ফিরতে পারলে বাঁচেন। কিন্তু উপায় কি? কোন জাহাজ টিকেট দেবে না।

চিট্টির এই বিপদে যে বঙ্গতনয় তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন, তাঁর নাম বারাণসী শেঠ। তিনি বললেন মানিক শাকে, টাকাটা আদায় না হয় আমি দোব। কোম্পানী যেন তাঁকে ছাড়-

পত্র মঞ্জুর করে দেয়। বলা বাহুল্য, শেঠমশায়ের কথা কলকাতা কাউন্সিল ফেলেনি, মানিকচাঁদ শা ত নয়ই।

কিন্তু শেঠমশায়ের ঝামেলা কি একটা নাকি? কলকাতায় পুরুত হরেরাম গোঁসাই কিছু সম্পত্তি রেখে কিন্তু কোন সন্ততি না রেখে মারা গেলেন সতেরশ' চোদ্দসালের জুলাই মাসে। কেমন করে জানি কথাটা কানে গিয়ে উঠল হুগলীর ফৌজদার জাফর খাঁর। সেকালে ইংরেজদের সঙ্গে কড়ার ছিল নবাবের যে এমত অবস্থায় সব সম্পত্তি পাবে নবাব। টাকা জমা হবে নবাবের খাজাঞ্চীখানায়। নবাব হুকুম দিলে গোঁসাই-এর বিধবা পত্নীকে পাঠাও ঢাকা। নয়ত কোম্পানীর মাল চালান বন্ধ। তখন অবশ্য কথায় কথায় এই ধরণের ব্যবস্থা কিছু আশ্চর্য ছিল না, কিন্তু যেটা খুবই বাধছিল, সেটা হিন্দু ঘরের বিধবা ব্রাহ্মণীর নবাব দরবারে হাজিরা দেওয়ার আদেশ। বিকল্পে একটা আশ্চর্য প্রস্তাব করা হ'ল। বারাণসী শেঠ যেন তাঁর কাছে হরেরামের গচ্ছিত টাকাটা নবাবের কাছে পাঠিয়ে দেন। খবরটা কলকাতায় এল শনিবার।

•

বারাণসী শেঠ তখন আর কোম্পানীর দালালি করেন না। তাঁর কাছে কোম্পানীর পেয়াদা গেল। শেঠমশায়ের পাল্কী 'হুমব্র হো' 'হুমব্র হো' করতে করতে ফোর্ট উইলিয়মের মধ্যে ঢুকে গেল। হন্তদন্ত হ'য়ে পাল্কী থেকে নেমে বারাণসী সোজা সাহেবদের সঙ্গে দেখা করলেন। সব শুনে বললেন, সে কি সাহেব, হরেরাম গোঁসাই-এর টাকা আমি পাব কোত্থেকে। আপনারা বরং হরেরামের ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করুন।

হেজেস বললেন, শেঠজী ত বলেই খালাস। কিন্তু এদিকে যে নবাব আমাদের ব্যবসা বন্ধ করে দেবে বলেছে, তার কি?

শেঠজী মাথা চুলকে বললেন, হুজুরের যদি হুকুম হয় আমি স্বয়ং হরেরাম গোঁসাই-এর স্ত্রীকে নিয়ে হুগলী যাব। যেদিন কর্তারা বলবেন সেদিনই যাব। এবং এসব ব্যাপারে আমিই ব্রাহ্মণীর হয়ে

জামিনও দাঁড়াচ্ছি। কিন্তু আমি টাকা দেব কেন? কোম্পানীর কর্তারা সেবারের মত সেইখানে সভা ভঙ্গ দিলেন, নিজেদের মধ্যে আলোচনার জন্যে। তাঁরা এ ব্যাপারে আরও খবরাখবর করার জন্যে অনুরোধ করলেন শেঠজীকে।

বারাণসী শেঠ খবর নিলেন এবং জানা গেল, কিছুই নয়, এটা গৃহবিবাদ। মৃত হরেরামের হুগলীস্থ দুই আত্মীয় রঘুনন্দন এবং অভিরাম লাগিয়েছে নবাব দরবারে। তাই এই সমন। রবিবার সাহেবরা কোন কাজকর্ম করেন না। কাজেই সোমবারে কাউন্সিলের সভায় শেঠেরা সবাই--বারাণসী, গোপাল, যদু এবং বিষ্ণুদাস এসে যথাসময়ে হাজির হ'ল আর গোস্বামীদের জ্ঞাতগুষ্টি—লক্ষ্মীনারায়ণ, রাজারাম, নন্দকিশোর এবং ঘনশ্যামকে সঙ্গে করে ডেকে আনলে। বারাণসী বললেন, কলকাতার গোঁসাইরা হুগলীতে চলে যান। সেখানে তাঁদের আত্মীয়দের নিয়ে নবাব দরবারে গিয়ে ব্যাপারটা রফা করে ফেলবার চেষ্টা করুন। তাঁরা যদি না পারেন, তবেই ব্রাহ্মণী যাবেন হুগলী। এবং ব্রাহ্মণীর জন্যে শেঠেরা সবাই দায়ী রইলেন। দেখা যাচ্ছে, শেঠজীর দূরদৃষ্টি কাজ দিয়েছিল। গোঁসাইরা ঘর সামলে নিলেন এবং পরের ঝামেলাও মিটে গেল।

সেকালের কোম্পানীর হিসেবের খাতায় দেখা যাচ্ছে, শেঠমশায় নিত্যব্যবহারের বিলিতী মাল বেশ পছন্দ করতেন। এবং এ থেকে অনেকের স্বভাবতই মনে হতে পারে, এককালে বাবুদের যে বিদেশী মাল কেনবার বাই ছিল, সেটা এই সময় থেকেই সুরু। বারাণসী শেঠ কোম্পানীর নিলামে একবার একশ' আটাশ খানা আর একবার চারশ' খানা বিলিতী কম্বল কিনেছিলেন। কলকাতার সাধারণ মানুষরা শুনে খুশী হবেন না দুঃখিত হবেন জানিনা, সেকালে এক একখানা কম্বলের দাম পড়েছিল চার আনার মত। কম্বল ছাড়াও, কোম্পানীর দামী কাপড় বিক্রি হ'ত। শেঠমশায় তাও কিনে রাখতেন এবং একবার তিনি নাকি বেশ খানকতক বিলিতী ছবি কিনেছিলেন!

শেঠজীর নবাব দরবারে দহরম মহরমের আর একটা গল্প শোনা যায়। কোম্পানী হুগলীতে নবাবের বিনা অনুমতিতে একটা বাড়ী করেছে—সেটা নাকি তেতলা বাড়ী। অন্যান্য মুঘল বাসিন্দাদের আব্রু নষ্ট। এমনি একটা খবর হুগলীর সংবাদদাতা মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দিলেন। আর যায় কোথা। এক হুকুমে পাটনা থেকে সোরা রপ্তানি বন্ধ করে দিলে নবাব। কোম্পানীর সোরার কারবার তখন জোর চলছিল। কি সর্বনাশ!

জন কোম্পানীর কলকাতা কাউন্সিলে সভা বসে গেল। বললে, হুগলীর দরবারে লোক পাঠাও। লোক না হয় পাঠান গেল, কিন্তু নবাব কি তার কথা শুনবে? তখন কোম্পানীর লোক গেল সেই শেঠবাড়ী। বারাণসী শেঠকে এত্তেলা দাও। তাঁকে বল, আমাদের হয়ে হুগলী যেতে। কোম্পানী বেমালুম ভুলে গেল, এই কিছুদিন আগেই অসাধু সন্দেহে বারাণসী শেঠকে তাঁরা ছাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর জায়গায় নিয়োগ করেছেন হরিনাথকে।

সে যাই হোক, বারাণসী শেঠকে নিয়েই কোম্পানীর একজন কত্তাবিত্তি ব্যক্তি হুগলী গেলেন এবং ব্যাপারটার একটা মিটমাটও হয়ে গেল। অবশ্য এই ব্যাপারে শেঠমশায়ের কৃতিত্বের স্বীকৃতি কোম্পানীর খাতায় নেই। তবু এই জটিল পরিস্থিতিতে তাঁর সার্থক ভূমিকা উড়িয়ে দেবার মত নয়, সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু বারাণসী শেঠের কর্মজীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিহাস কি? আমরা আগেই শুনেছি, জন কোম্পানীর বশম্বদ ভৃত্য রবার্ট হেজেস গদী পেয়ে প্রথমেই শেঠজীর চাকরির মাথাটা ঘ্যাচ্ করে ধড় থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এমন প্রমাণ রয়েছে যে সতেরশ' সতেরর ডিসেম্বরে নয় দিনের জ্বরে এক শনিবারের সন্ধ্যায় তাঁর দেহান্ত হবার কয়েকদিন আগেই তাঁর ব্যক্তিগত জমিজায়গা, কিছু বা ব্যবসাপত্র দেখবার জন্য নির্ভরযোগ্য যে ব্যক্তিটিকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তিনি, তাঁর নাম বারাণসী শেঠ। সাকিম গোবিন্দপুর

*　　　*　　　*

শেঠ পরিবারের কথা প্রসঙ্গে আর একজন খ্যাতকীর্তি শেঠ-মশায়ের কথা এসেই পড়ে। তিনি জনার্দনের জ্যেষ্ঠপুত্র—বৈষ্ণবচরণ। তাঁকে সেকালের কলকাতার ধনকুবের বলে মান্ত করেছেন কেউ কেউ। তাঁর ব্যবসায়িক সততার কথাও কিংবদন্তীর পর্যায়ে। তবে তিনি তাঁর বাবা-খুড়োদের মত কোম্পানীর কর্মচারীকুলকে অলঙ্কৃত করেছেন তেমন প্রমাণ নেই। এই বৈষ্ণবচরণ শেঠের 'ট্রেডমার্কে'র এমনই সুখ্যাতি যে গঙ্গাজলের ঘড়ার মুখে তাঁর শিলমোহর দেখলেই লোকে তা আদি এবং অকৃত্রিম গঙ্গাজল বলে মেনে নিত। সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে সেই জল চালান হত। ত্রৈলঙ্গ দেশে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের পূজায় ঐ জল ছাড়া অন্য কোন জল চলত না। বৈষ্ণবচরণের নামের এমনি মাহাত্ম্য!

ব্যবসায়ী হিসেবে তাঁর বাড়বাড়ন্তও খুব। দানধ্যানও ছিল সেইমত। ছিল তাঁর নামের ঘাট—ভাগীরথীর তীরে। সেই ঘাটে তাঁর মালপত্রও ওঠানামা করত। শেঠবংশের রামকৃষ্ণ ও রাসবিহারী শেঠত এতই পয়সা করেছিলেন যে উমিচাঁদের মত তাঁরা ইংরেজটোলায় বাড়ী করেছিলেন। একালের হেয়ার স্ট্রীটের কোণে তাঁদের বিরাট প্রাসাদ ছিল। পলাশীর যুদ্ধের আগে তৈরী উড সাহেবের ম্যাপে সে বাড়ী দুটোই দেখা যায়।

*　　　*　　　*

এই দালালদের মতই দক্ষতা দিয়ে আরও যাঁরা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সেই আদ্যিকালের কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছিলেন—তাঁরা 'ভকিল'। নবাবের দরবারে, সুবেদারদের সভায়, ফৌজদারদের দুয়ারে এঁরা ইংরেজ কোম্পানীর হয়ে ওকালতি করতেন। জনকোম্পানীর স্বার্থরক্ষা করতেন। তাঁদের কূটনৈতিক মণীষায় তাঁরা পাকা 'এ্যামবাসাডর'দেরও ঝক দিতেন। এবার তাঁদেরই দু' একজনের কর্মজীবনের আলোচনা করা বেমানান হবে না।

'ভকিল'

বলাবাহুল্য শুধু কালা জমিদার, পাটোয়ারী আর বেনিয়ানদের দিয়েই জন কোম্পানীর বিরাট গোলামখানার কাজ মেটেনি। বিদেশী বণিকরা এদেশে ব্যবসাবাণিজ্য সুরু করার সঙ্গে সঙ্গে এক ধরণের কর্মচারীদের প্রয়োজন বড় বেশী অনুভব করতে লাগল—যাঁরা খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত এই সুবিস্তৃত দেশের নানা রাজ দরবারে তাদের স্বার্থের কথা বলবেন। তাদের দিকটা লক্ষ্য রাখবেন। যে সব প্রয়োজনে আজকাল বিভিন্ন রাষ্ট্র দেশে দেশে 'অ্যামবাসাডর' 'ট্রেড-মিশন' পোষে, অনেকটা সেই কারণেই কিছু দেশী কর্মচারীদের মাইনে দিয়ে রাখত বিদেশী বণিকরা—ডাচ, ফরাসী, ইংরেজ কোম্পানী সবাই। তারা বড়সড় দরবারে নিজের জাতের লোক রাখত, আবার এইসব দেশী প্রতিনিধিদেরও রাখত। এঁরাই সেকালের 'ভকিল'। এবং অন্যান্য সব বেতনভুক দেশী-চাকুরেদের তুলনায় এঁদের কদর ছিল বেশী। কেননা, অবস্থাবিপাকে নবাব বাদশাদের ঝাল তো এঁদের ওপরই গিয়ে পড়ত। নুনের মর্যাদা দিয়ে মাথা নীচু করে সেইসব ঝক্কি পোয়াতেও হ'ত 'ভকিল'দের। চাকরি বড় বালাই, একালেই কি, সেকালেই বা কি!

তখনকার দিনে একটা মস্ত ঝামেলা ছিল বাঙলাদেশে। হুট্ করতেই নবাবদের নজরানা দিতে হত দিল্লীর শাহনশার কাছে। আর নবাবেরা এই টাকাটা দোহন করত সাধারণতঃ বাঁধা গরু সব বিদেশী বণিকদের কাছ থেকে। নবাবের হুকুমনামা নিয়ে লোকজন আসত বিদেশী বণিকদের কুঠিতে। সবাইকার সেই এক রা। টাকা চাই, টাকা। ইংরেজরা বরাবরই একটু একবগ্গা। এইভাবে টাকা দিতে তারা

গররাজী। কাজেই, তাদের গোমস্তা বল, উকিল বল, সব আটক। সতেরশ' একুশ সালে একবার এমনি হামলা করেছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। কাশিমবাজারে গোমস্তা কান্ত মুদীকে বেঁধে নিয়ে গেল। ওলন্দাজ উকিল একটু বেশ মান্যি লোক। তাঁকেও শাসান হ'ল। এমনি ঝামেলার চাকরি উকিলের। কিন্তু বাঙালীরা তখন এক বিপুল কর্মযজ্ঞে মেতেছে। এইসব ঝঞ্ঝাটের জন্যে পিছিয়ে আসবে এ কখনও সম্ভব?

সেকালের কোম্পানীর নথিপত্র ঘাঁটলে দেখা যায়, জন কোম্পানীর এই বিচিত্র 'সার্ভিসে' বাঙালী কর্মচারীর সংখ্যা বড় একটা কম ছিল না। মল্লিক পরিবারের অন্যতম উদ্যোগী পুরুষ সন্তোষ মল্লিক ঢাকায় 'ভকিল' ছিলেন ইংরেজদের। এ'ছাড়া বেশ কয়েকজন বাঙালী বিভিন্ন নবাবী দরবারে কোম্পানীর 'এজেন্টের' কাজ করে গেছে, একেবারে সেই আদ্যিকালে। আসলে প্রায় কুঠিয়ালই ভালো ফার্সী জানতেন না। নানা দরবারের বিচিত্র স্লুক-সন্ধান জানতেন না। কাজেই নবাবের এজলাসে তাঁদের বক্তব্য পেশ করার দরকার হ'লে করে কি? স্বভাবতঃই ঐ ভকিলদের শরণ নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর কোথায়?

কলকাতা কাউন্সিলের হিসেব-পত্তরের খাতায় প্রথম যে দেশী উকিলের কথা পাওয়া যায় তাঁর নাম লক্ষণ। এঁর নামে খরচ লেখা হয়েছিল এক টাকা। এটা মনে হয় মাইনে নয়, হাত খরচ বা বকশিশ। কেননা ঐবছরই পরের মাসে উকিলের জন্য খরচ লেখা পাঁচ টাকা। এটাই মনে হয় মাইনে। ঐ একই সময়ে রাইটারদের মাইনে ছিল তিন টাকা, কাহারদের এক টাকা। কাহাররা দারবানের কাজ করত। লাঠিও ধরত প্রয়োজনে। সহর কলকাতার প্রথম ব্ল্যাক জমিদারের মাইনে ছিল দু' টাকা। কাজেই দেখা যাচ্ছে, ব্যয়-কুণ্ঠ কোম্পানীর কাছে উকিলদের কাজের বেশ কদর ছিল। খাতির ছিল। এবং প্রয়োজন ছিল। এই খাতির শশীকলাবৎ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল —তার প্রমাণ সতেরশ' চার সালে রামচন্দ্রের চাকরি। হুগলীর

ফৌজদারের দরবারে তাঁর চাকরি হয় ঐ বছর মার্চ মাসের তেইশে। মাইনে মাসে কুড়ি টাকা। এ'ছাড়া তাঁর ঘোড়ার জন্য 'এলাউন্স' মঞ্জুর করা হয় পাঁচ টাকা। এবং ডাইনে বামে একটা করে পিওন রাখতে দেওয়া হয়—সবই কোম্পানীর খরচে।

কিন্তু হঠাৎ জনকোম্পানী এত মোটা মাইনেতে হুগলীর ফৌজ-দারের দরবারে এই উকিল নিয়োগ করতেই বা গেল কেন। এক কথায় এই প্রশ্নের জবাব—প্রতিশ্রুতি রক্ষা। কোম্পানীর কর্তারা হুগলীর ফৌজদারকে কথা দিয়ে এসেছিল। কিন্তু ধুমধাড়াক্কা হঠাৎ এমন কথাই বা কেন দিতে গেল কোম্পানী? কেন আবার—সোজা কথা, চাপে পড়ে। এবং এই চাপ—তাদেরই স্বখাত সলিল। এবং এর আদি কথা খুঁজতে গেলে কয়েকটা বছর পেরিয়ে সাতসমুদ্দুর তের নদী সাঁতরে আমাদের খাস লণ্ডন শহরে যেতে হবে।

সতেরশ' সাল আসব আসব করছে। সিংহাসনে তখন উইলিয়ম থার্ড—যাঁর নামে কলকাতায় ইংরেজ কেল্লার নাম ফোর্ট উইলিয়ম। ফ্রান্সের সঙ্গে তখন জোর লড়াই চলছে। ইংলণ্ডের তখন বিষম টাকার খাকৃতি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বললে, টাকা চাও, দিচ্ছি। সাত লক্ষ পাউণ্ড। কিন্তু একটা কাজ করতে হবে বাপু,—ভারতে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারটা পাকা করে দিতে হবে পার্লামেণ্টে পাশ করে। বিধি বাম। এই সময়েই আর একদল ছোটখাট ব্যবসাদার মিলে পাল্টা চাল চাললে। তারা বললে, তারা দেবে কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড ধার। সুদ শতকরা আট। কোম্পানীর 'মনোপলি'টা অনেকেই ভাল চোখে দেখত না। তাছাড়া ব্রিটিশ 'ক্রাউনের' তখন টাকার বড় টানাটানি, কাজেই দ্বিতীয় দলই জিতে গেল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সৃষ্টি হওয়ার প্রায় একশ' বছর পরে ভারতে বাণিজ্য করার একচেটিয়া অধিকার নিয়ে নতুন ইংরেজ কোম্পানী হল—'ইংলিশ কোম্পানী ট্রেডিং টু দি ইষ্ট ইণ্ডিজ।' ষোলশ' আটানব্বই সালের সেদিন পাঁচই সেপ্টেম্বর। খাস ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নাম হল—লণ্ডন কোম্পানী। তাকেও একে-

বারে তক্ষুনি ভাতে মারা হল না। তার মেয়াদ ঠিক হল আরো তিনটে বছর—উনত্রিশে সেপ্টেম্বর সতেরশ’ এক।

কিন্তু কোম্পানী ফাঁদা আর ব্যবসা করা তো এক কথা নয়; জাঁদরেল একটা নাম পেলে হবে কি, নতুন কোম্পানী ঠেকে শিখলে—প্রাচ্যে ব্যবসা করা সহজ বস্তু নয়। নতুন কোম্পানীর তরফ থেকে একটা প্রস্তাব এল লণ্ডন কোম্পানীর সঙ্গে মিলে মিশে ব্যবসা করার। লণ্ডন কোম্পানী তো তেতেই ছিল। তারা নতুন কোম্পানীকে সোজা হাঁকিয়ে দিলে। নতুন কোম্পানী তখন দুটো কাজ করলে। দিল্লীর দরবারে একটা দূত পাঠালে—সার্ উইলিয়ম নরিসকে। ঠিক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যেমন পাঠিয়েছিল সার্ টমাস রোকে। আর সার্ এডওয়ার্ড লিটনটন বলে জন কোম্পানীর এক ছাঁটাই কুঠিয়ালকে প্রেসিডেণ্ট করে তিনজন সভ্যের একটা কাউন্সিল পাঠালে বাংলাদেশে। লিটনটন নরম গরম করে বেশ সুরু করেছিলেন, কিন্তু তাঁর একটা ফতোয়ায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে লেগে গেল। লিটনটন বলে বসলেন—তিনি ছাড়া আর কারও এখন আর সরকারীভাবে মুঘলদের সঙ্গে আলোচনা চালান এবং কোম্পানীর নামে ‘দস্তক’ দেওয়ার অধিকার নেই। জন বিয়ার্ড তখন পুরনো কোম্পানীর কলকাতা কাউন্সিলের বড় কর্তা। তিনি পাল্টা হুকুম দিলেন—কলকাতার কাউন্সিলের এক্তিয়ারে যাঁরা বাস করছেন তাঁরা যেন কেউই লিটনটন-কে কোনরকম পাত্তা না দেন—তাঁর কথায় কর্ণপাত না করেন। ওদিকে বাদশাহ আলমগীরের দরবারে নরিস সাহেব সেজেগুজে গেলেন বটে—সমারোহেরও অভাব হল না, অভাব হল না অভ্যর্থনার, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। ফল হল না কিছু। ব্যর্থমনোরথ নরিস মুঘল আমলাতন্ত্রের অলাতচক্রে পড়ে কিছুকাল কয়েদ খাটলেন এবং কি আর করেন, অবশেষে স্বদেশের উদ্দেশে তরী ভাসিয়ে দিলেন। কিন্তু পৌঁছাতে পারলেন না। সেণ্ট হেলেনায় দেহ রাখলেন। রোগটা—আমাশা।

ডামাডোলের বাজারে সতেরশ' এক সাল প্রায় শেষ হয়ে এল। সুদূর দাক্ষিণাত্যে বসে বাদশা আলমগীর এই সময়ে একটা সাংঘাতিক হুকুম জারি করলেন। কয়েক বছর যাবৎ সুরাট থেকে মক্কার যাত্রীদের জাহাজের ওপর হর্‌বখ্‌ত একটা না একটা আক্রমণ লেগেই ছিল। এর ওপর যখন পুরনো এবং নতুন ইংরেজ কোম্পানী পরস্পর পরস্পরের ওপর জলদস্যুতার অভিযোগ নিয়ে এল সম্রাট সুযোগ হারালেন না, বললেন, এ দুই ব্যাটাদেরই হটাও। যেখানে যে কুঠিতে যা মাল আছে সব বাজেয়াপ্ত কর।

পরোয়ানা গেল সুবায় সুবায়। যতদূর মনে হয় অভিজ্ঞ কলকাতা কাউন্সিল এ খবরটা আঁচ করতে পেরেছিল। পাটনা, কাশিমবাজার আর রাজমহল কুঠী থেকে দামী দামী সব মাল আগেভাগে সরিয়ে এনে কলকাতায় জমা করা হয়েছিল। কাজেই তার গায়ে বিশেষ আঁচ লাগল না। ঝড়টা নতুন কোম্পানীর ওপর দিয়ে বয়ে গেল। বাদশার হুকুমে তাদের বাষট্টি হাজার টাকার মাল হল বাজেয়াপ্ত। নতুন কোম্পানী তো ফৌত হবার দাখিল!

কিন্তু এর ফল সবই খারাপ হল না। তা কোনদিন হয় না দুনিয়ায়। নদীর কূল একদিকে ভাঙলে গড়ে অন্যদিকে। কাজেই এই দুর্দৈবের মধ্যে একটা ভারী ভালো ফল ফললো। দুটো কোম্পানী অনেকটা বাধ্য হয়েই এক হয়ে গেল। তিনটে কাউন্সিল হল—একটা পুরনো যার বড়কর্তা বিয়ার্ড, অপরটা নতুন—যার দণ্ডমুণ্ডের মালিক লিটনটন। তৃতীয়টির নাম য়ুইনাইটেড কাউন্সিল। এর সভ্য আটজন। ঠিক হল এর দুই প্রবীণ সদস্য রবার্ট হেজেস আর রালফ শ্লেলডন—পালা করে এর প্রেসিডেন্ট হবে। সতেরশ' চার সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি এই য়ুনাইটেড কাউন্সিলের হাতে অসুস্থ বিয়ার্ড সাহেব ফোর্টের চাবিকাঠি তুলে দিলেন। তেরই মার্চ থেকে এই সংযুক্ত কাউন্সিল 'দস্তকে'র বা 'পারমিটে'র ওপর তাদের শীল-মোহর দিতে সুরু করল।

শীলমোহর তো দিতে লাগল কিন্তু তাদের চেনে কে? মানে কে? কূটনৈতিকভাবে স্বীকার করে কে? এই জরুরী কাজের জন্য হুগলীর ফৌজদারের দরবারে এই নতুন কাউন্সিলের পরিচয়-পত্র দিয়ে যাঁকে পাঠান হল—তিনিই রামচন্দ্র। তাঁকে প্রথমেই নির্দেশ দেওয়া হয়, যেন তিনি হুগলীর ফৌজদার, বক্সী এবং ওয়াকি-নবিসের কাছে ইংরেজদের কাজকর্ম দেখার জন্যে 'ভকিল' হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন—এটা সবিনয়ে জ্ঞাপন করেন এবং ফৌজদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি যদি কোম্পানীর খাস কর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষ করেন তাও জেনে কাউন্সিলকে জানিয়ে দেন।

সে যাই হোক রামচন্দ্রকে আরও বলা হল, দুটো কোম্পানীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে যেন বলা হয়—দুই কোম্পানীর প্রেসিডেন্টকে সরিয়ে এখন একটিমাত্র কোম্পানী চালু করা হয়েছে এবং সব ডিপ্লোম্যাটকেই ইস্তককাল যা করতে হয়েছে, রামচন্দ্রকেও সে কাজ করতে বলা হল—হুগলীর খবরাখবর সম্বন্ধে যেন ওয়াকিবহাল করা হয় কলকাতাকে।

যতদূর জানা যায়, কোম্পানী তাড়াতাড়ি রামচন্দ্রকে পাঠিয়ে দিলে হুগলীর ফৌজদারের দরবারে তাঁর করণীয় কি তার দীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়ে। এবং যাবার আগে দরবারের খরচের জন্যে মবলগ একশ' টাকা দিলে হাতে। এবং এক প্রসন্ন প্রভাতে ইংরেজ বজরা যথানিয়মে গিয়ে ভিড়ল হুগলীর ঘাটে। অতঃপর কালক্ষেপ না করে ঘোড়ায় চেপে হুগলীতে ফৌজদারের কাছে পরিচয়পত্র পেশ করলেন রামচন্দ্র। কিন্তু এ নিয়েও অনেক কথা শুনতে হয় তাঁকে। কেননা রামচন্দ্র নাকি হুগলীর ফৌজদারকে তাঁর পরিচয়পত্র দিয়ে নিজেকে কোম্পানীর 'ভকিল' বলেই শুধু অভিহিত করেন। কলকাতা কাউন্সিল মুখঝামটা দিয়ে বললে, তা কেন হবে, রামচন্দ্র তাঁদের 'এজেন্ট'ও বটে। পরিচয়-পত্রের এইটুকু শুধরে কাউন্সিল নতুন একটা কাজ চাপিয়ে দিল—প্রতিদিন দরবারে ফৌজদারের সঙ্গে তাঁর আলাপ আলোচনার সারমর্ম

কলকাতায় অবশ্যই লিখে পাঠাতে হবে রামচন্দ্রকে। প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে রামচন্দ্র ভালোভাবেই কাজকর্ম চালাতে লাগলেন। এবং অচিরেই তাঁর কৃতিত্ব প্রমাণ করলেন। হুগলীতে বসে তাঁর কানে এল ফৌজদার সাহেব যেন কোথায় যাবেন—তারই তোড়জোড় চলছে। ফৌজদারের নাম মীর ইব্রাহিম। রামচন্দ্র খোঁজখবর করতে লাগলেন এবং অচিরে জানতে পারলেন—তিনি যাবেন বালেশ্বর। সেখানে সুবে বাংলার দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ রয়েছেন—তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চলেছেন ইব্রাহিম। রামচন্দ্র আর বিলম্ব করলেন না। কলকাতায় জরুরী চিঠি লিখে পাঠালেন—করেছেন কি হুজুররা। শিগ্গী লোক পাঠান সেখানে।

রামচন্দ্র তাঁর ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে আরও একটা খবর পাঠিয়ে থাকবেন,—করেছেন কি, শুধু হাত কি মুখে ওঠে? মীর ইব্রাহিম খাঁকে এখনও কোন ভেট পাঠাননি? কাউন্সিলের কাউকে ইতিমধ্যে পাঠান উচিত ছিল হুগলীর দরবারে সেলাম জানাবার জন্যে। কাজটা কাঁচা হয়ে যাচ্ছে না কি?

কলকাতা কাউন্সিল রামচন্দ্রের দুটি পরামর্শই মেনে নিল। মুর্শিদকুলি খাঁর দরবারে পাঠালে তাদের জানাশুনার মধ্যে সবচেয়ে বড় ডিপ্লোম্যাট—রাজারাম মল্লিককে। আর হুগলীর ফৌজদারকে বলে পাঠাতে বললে, যে ইংরেজরা তৈরীই আছে। হুজুরের সময় হলেই ইংরেজরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ধন্য হবে। আর ইংরেজ কুঠির যে কোন দ্রব্য ফৌজদারের নজরে লাগে—তাই তাঁর শ্রীচরণে অর্পণ করে ইংরেজরা কৃতকৃতার্থ হতে চায়। অবশ্য ইংরেজরা আগে গাওনার কথা ভাবে, তবে পাওনার কথা কয়। রামচন্দ্রকে কলকাতা কাউন্সিল লিখে দিলে তিনি যেন ফৌজদারকে মুর্শিদকুলি খাঁর দরবারে ইংরেজদের হয়ে একটু গাইতে বলেন। বলেন যেন, খাঁ সাহেব, আপনার ছোটখাট দুষ্ট কর্মচারীদের হাতে ইংরেজদের ব্যবসা যে ভাবে নষ্ট হচ্ছে তা' হুজুর বন্ধ করার অবশ্যপ্রয়োজন। নয়তো

কাজ-কারবার ত যায়। সেইটার বিহিত করার জন্যে মুর্শিদকুলির দরবার থেকে যেন একটা হুকুম জারি করা হয়।

এটা ভরা গ্রীষ্মের কথা। জুন মাস। গ্রীষ্ম গেল। বর্ষার অবিশ্রান্ত ধারায় হুগলীর জলে বান ডেকে গেল। আশ্বিন মাস আসে আসে, সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ রামচন্দ্রের জবাব এসে গেল। রামচন্দ্র জানালেন যে নতুন জন কোম্পানীর যে সব মালপত্র এখনও মুঘল কোষাগারে বাজেয়াপ্ত অবস্থায় রয়েছে—সেগুলি উদ্ধার ক'রে ফয়সালা করতে হলে হুগলীর দেওয়ান থেকে মুৎসদ্দী—সবাইকেই টাকা খাওয়াতে হবে। নগদ-নারায়ণই দরবার-দেবতার একমাত্র অর্ঘ্য। মোটা মোটা ভেট দিতে হবে এখানে। আগে এরা কোম্পানীর নতুন-পুরানো দুই তরফ থেকেই মোটা টাকা পেয়ে এসেছে। সেই রূপচাঁদ ছাড়া কাজ হবে না। ফেল কড়ি মাখ তেল—তুমি কি আমার পর—এই হচ্ছে দরবারী চাল।

কলকাতা কাউন্সিলে এই নিয়ে জোর মিটিং হয়ে গেল। তাঁরাও সব পোক্ত লোক। এ দেশকে বেশ চেনেন। রামচন্দ্রের যুক্তিটা ফেলতে পারলেন না। কাজেই দেরী না করে সেই মিটিংএ বসে বসেই কর্তারা একটা বিরাট তালিকা করে ফেললেন। এবং সেই লিষ্টিতে হুগলীর ফৌজদার মীর ইব্রাহিম থেকে সুরু করে' বক্সী খোজা মহম্মদ, কাজী, দারোগা, মুৎসদ্দী রামকৃষ্ণ রায় তাদের নায়েব মুন্সী কাউকেই তাঁরা বাদ দিলেন না। সর্বসাকুল্যে প্রায় তিন হাজার টাকা ঘুষ দেবার একটা ফিরিস্তি তৈরী করে ফেললেন। এবং শুভস্য শীঘ্রং। তাই দেরী না করে' রামচন্দ্রের নির্দেশমত টাকাকড়ি নিয়ে কলকাতা কাউন্সিলের দুই কর্তা—রাসেল ও নাইটেংগল নৌকায় চেপে হুগলীর উদ্দেশে পাড়ি জমিয়ে ফেললে। নীল আকাশের বুকে তখন লঘুপক্ষ শরতের মেঘ। গঙ্গার ধারে ধারে দিগন্ত-প্রসারী বালির চড়ায় কোথাও বা কাশের বনের মেলা, কোথাও বা ছায়াঘেরা আমবাগানে দোয়েল পাপিয়ার কলকূজন,

মৌমাছির গুঞ্জন, কোথাও বা শুধু ঘাটে ঘাটে স্নানরত মেয়েদের কলকাকলি।

নৌকা একসময়ে হুগলীর ঘাটে গিয়ে বাঁধা হ'ল। মালপত্র বোঝাই নৌকাও পিছে পিছে ভিড়ল। গরুর গাড়ীতে সে সব মাল বোঝাই করে' সাহেবদের পাল্কীর পিছু পিছু ঘোড়ায় চেপে রামচন্দ্র উকিল গিয়ে হাজির হলেন মীর ইব্রাহিমের প্রাসাদে। এমন কিছু বেশি দূর নয়। গোলঘাটে ইংরেজ কুঠি থেকে এখনকার ব্যাণ্ডেলের দিকে যেতে মাঝপথে পড়ত মুঘল শাসনকর্তার সুবিস্তৃত প্রাসাদ। স্বয়ং ইব্রাহিমকে ইংরেজরা সেদিন দিয়েছিল সাতাশি গজ বিলিতী ব্রোকেড, দুটো বিলাতী ইস্পাতের তলোয়ার, একজোড়া পিস্তল, একটা বন্দুক, একটা বড় তিরিশ ইঞ্চি আয়না আর একটা ভিস্টওয়ার···সর্বসাকুল্যে এই সব জিনিষের সেকালের বাজারে দাম পড়েছিল পাঁচশ' একচল্লিশ টাকা নয় আনা। সাহেবরা তো দিয়ে থুয়ে 'হ্যাণ্ডশেক' করে চলে গেল। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল রাজা রাজী তো খোজা বেঁকে বসে। তিন জন বক্সী বলে বসল তাদের আরও কিছু চাই। বেশি নয়, এগারশ' সিক্কা টাকা। ব্যবসাপত্তরের ব্যাপারে এরাই তো সব। রাখিলে রাখিতে পারে, মারিলে মারিতে। কাজেই রামচন্দ্রকে আবার কলকাতায় লিখে পাঠাতে হ'ল। তাতে ঘটনার পুংখানুপুংখ বিবরণই দেননি শুধু পোড় খাওয়া উকিল রামচন্দ্র, বোধ হয় পরামর্শ দিয়ে থাকবেন অশুভস্য কালহরণং। কাজেই টাকাটা দেবার আশা দিয়ে কাজটা গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা যাক। এবং এবারে টাকাটা যেন চুপিচুপি দেওয়া হয়। কাক পক্ষীতে যেন টের না পায়। নয়ত ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেলে সবাই 'দেহি দেহি' রব তুলবে। কোম্পানীর বহু টাকা গলে যাবে।

এবং আরও একটা মোক্ষম পরামর্শ দিয়ে থাকবেন রামচন্দ্র—সেটাই মনে হয় তাঁর তুরুপের টেক্কা। কিছু না, সাহেবদের সঙ্গে জন দুই তিন গোরা পল্টন যেন আসে হুগলীতে। মুঘলরা যেন

বোঝে টাকা দিয়েই শান্তি কেনে না জন কোম্পানী। হকের হিসেব তারা তলোয়ারের ডগায় লিখে ফেলতে পিছপা নয়। কোম্পানীর সেই আদ্যিকালের সভাগুলির বিবরণে দেখা যাচ্ছে সতেরশ' চার সালের ত্রিশে অক্টোবর কলকাতা কাউন্সিলের মিটিং-এ এই ধরণের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করে জন কোম্পানী। এবং ঠিক হয় উইণ্ডার আর রেডশ সাহেব এই টাকা নিয়ে হুগলী যাবেন। সঙ্গে যাবে কে? ত্রিশ জন গোরা পল্টন কোমর বেঁধেছে।

রামচন্দ্রের দৌত্যের সময়ে আর একটা ঘটনার হদিশ পাওয়া যায়। হুগলীর ফৌজদারের টাকা খেয়ে একটা লোক পালিয়ে এসে আশ্রয় নিলে কলকাতায়। কোম্পানী কলকাতার বসতি বাড়াতে ব্যস্ত। কাজেই আশ্রয় দিলে তাকে। কিন্তু এর কয়দিন পরেই চিঠি এল রামচন্দ্রের। লোকটাকে অবিলম্বে হুগলীতে ফেরৎ দিতে হবে, নইলে ফৌজদারকে সামলানো দায়। কোম্পানীকে পলাতকের টাকার জন্যে দায়ী হতে হবে। কাউন্সিল লোকটাকে পাকড়ে নিজেদের পেয়াদা পাইক দিয়ে সোজা হুগলী পাঠিয়ে দিলে। অবশ্য এইভাবে বেশীদিন শান্তি বজায় থাকেনি হুগলীতে। মুর্শিদকুলির আমলে হুগলীতে নতুন ফৌজদার আসে। এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের ঝড় ঘনিয়ে ওঠে। টাকার খাঁই বাড়ে হুগলীর মুঘলমহলে। দেশী লোকেদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী হয়—ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা বন্ধ রাখ।

অবশ্য ব্যাপারটা সুরু হল খুবই সামান্য ব্যাপার নিয়ে। হুগলীর ফৌজদারের কোষখানায় জন কোম্পানী যথা নিয়মে বৎসরাধিক পেশকাশের তিনহাজার টাকা জমা দেয়। ফৌজদার টাকা জমা নিলে ঠিকই, কিন্তু রসিদ দেবার বেলায় বললে—পরে দেব। কদিন তাগাদার পর স্রেফ বলে বসলে, ওসব হবে না। টাকা ছাড়ো। এবং টাকা না পেতেই ইংরেজদের ব্যবসা বন্ধ করে দিলে। কোম্পানী দেখলে ভাল বিপদ। কিন্তু কোন কথা বললে না। দেখা গেল, সকালের সদ্য ফুটে ওঠা আলোয় কলকাতার দিকচক্রবাল সদ্য রাঙা-রাঙা

হয়ে উঠেছে, মৃদু মৃদু বাতাস বইছে, গঙ্গার বুকে একটা ইংরেজ বজরা পাল তুলে দিলে হুগলীর উদ্দেশ্যে। মাঝিরা ঝপ ঝপ করে তালে তালে বৈঠা বাইতে লাগল। আর উচ্ছল গঙ্গার জলে পড়ে সেই শব্দে কেমন যেন টেনে টেনে বলতে লাগল: হুগ্‌লি হুগ্‌লি হুগ্‌লি হুগ্‌লি। ঠিক এমনি নৌকাই গিয়েছিল কয়েকমাস আগেই। তবে এবার তাতে আর টাকা নয়। নাইটেংগেল বলে সেই সাহেব গেল আর গেল ত্রিশজন খাস গোরা পল্টন। কাজ মন্দ হ'ল না। মুঘল ফৌজদার ইংরাজদের ব্যবসার ওপর যতরকম বাধা নিষেধ তুলে নিলে। দুনিয়ার শক্তের ভক্ত কে নয়?

শুধু তাই নয়, ফৌজদার সাহেব স্বয়ং এক হপ্তার জন্যে কলকাতা ঘুরে গেলেন। থেকে গেলেন ফৌজদারী বালাখানায়। তাঁর আগেকার ফৌজদার জিয়াউদ্দিন এখানে এসেই থেকেছিলেন। তেমনি জাঁকজমক, তেমনি সমারোহ। ইংরেজরা আপ্যায়নের কসুর করলে না। তাঁর সম্মানে ফোর্ট উইলিয়মের অদূরে গঙ্গার বুকে নোঙর করা জাহাজ থেকে দুদ্দাড় তোপধ্বনি করলে—এবং তাঁর বিদায় বেলায় বহুবিধ সামগ্রীর একটা বিরাট ভেটের ছাঁদা বেঁধে দিলে।

কিন্তু এই শান্তিও বেশীদিন চলেনি। এই সময় ভারতবর্ষের রাজ-নৈতিক দৃশ্যপট দ্রুত পাল্টাতে থাকে। সতেরশ' সাত। মহীউদ্দিন মুহম্মদ আওরঙ্গজেবের দেহান্তের পর মুঘল সিংহাসন নিয়ে কামড়াকামড়ি সুরু হ'ল। দিল্লী থেকে অনেক দূরে হুগলীতেও রঙ্গমঞ্চের কুশীলবরা পাল্টে গেল। মীর ইব্রাহিমের জায়গায় নতুন ফৌজদার এলেন। ইংরেজরা তাকে সেলাম জানিয়ে এল। সওগাত দিয়ে এল। কিন্তু সবই বৃথা হ'ল। নতুন ফৌজদার ভিজলেন না। মাস দুই তিনের মধ্যেই তিনি তাঁর রাজ্যের চৌহদ্দির মধ্যে ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দিলেন। ইংরেজদের উকিলের কাজ বাড়ল। এর কারণটা কি জানতে গেল মুঘল দরবারে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কোন কাজ হ'ল না। মুর্শিদ কুলি তখন রাজমহলে। ইংরেজদের মনে বোধ করি উইলিয়ম হেজেসের

দৌত্যের ব্যর্থতার স্মৃতি মুছে যায়নি। কাজেই তারা সে পথে আর গেল না। কালক্ষেপ করতে লাগল। সুদিনের সুবাতাসের অপেক্ষা করতে লাগল। গুণ টেনে পড়ে রইল।

কিন্তু ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠল ক্রমশঃ। কেন না এই সময়েই হুগলীর ফৌজদার হুগলীর একজন ইংরেজ এবং জন কোম্পানীর কয়েকজন কালা কর্মচারীকে কয়েদ করে বসলেন। এবং শাসিয়ে বসলেন—দরকার হলে আরও লোককে বন্দী করবেন তিনি। ইংরেজরা এবার সাংঘাতিক ঘাবড়ে গেল। ভাবলে, ফৌজদার কলকাতা না আক্রমণ করে বসে। কিন্তু আখিরে তাদের ধৈর্যেরই জিত হ'ল। এই ঝামেলা আস্তে আস্তে কেটে গেল। মুর্শিদকুলি বা দিল্লীর বাদশা জানতেন এই গরু দুধ দেয়। সোনার ডিম-পাড়া হাঁসকে একেবারে মেরে ফেলা নির্বুদ্ধিতারই পরিচয়। কাজেই ইংরেজদের ব্যবসা ঝিমিয়ে পড়লেও চলতে লাগল এবং এক সময়ে বেশ জমজমাট হয়ে উঠল।

কিন্তু এই দুর্যোগের দিনে রামচন্দ্র কি কাজ করেছিলেন জন কোম্পানীতে? বলা শক্ত। সতের শ' চার সালের পর সেকালের জন কোম্পানীর হুগলীর 'ভকিলের' আর নামোল্লেখ নেই। 'আমাদের ভকিল', 'আমাদের ভকিল' এই ভাবেই বলা হয়েছে বারবার। শুধু তাই নয়। সতেরশ' ছয় সালের কাউন্সিলের মিটিং-এর এক বিবরণীতে রয়েছে—আওয়ার ভকিল এ্যাট হুগলী বিইং লেটলি ডেড, এগ্রীড—উই এন্টারটেইন শ্যামসুন্দর সিং টু এ্যাপীয়ার এ্যাজ আওয়ার ভকিল এ্যাট হুগলী। অস্যার্থ—হুগলীতে আমাদের 'ভকিল' সম্প্রতি মারা যাওয়ায় ইহা ঠিক করা হয় যে হুগলীতে শ্যামসুন্দর সিংহকে আমাদের নতুন 'ভকিল' হিসাবে নিয়োগ করা যাইতেছে। এমনিতে ত মনে হওয়া স্বাভাবিক যে রামচন্দ্রের মৃত্যুতে তাঁর জায়গায় এলেন শ্যামসুন্দর।

কিন্তু তা হয়ত নয়। সতেরশ' চৌদ্দয় এক রামচন্দ্রকে মুর্শিদাবাদে উকিল করে পাঠান হয়। এতাবৎকাল রামচন্দ্র হয়ত অন্য কোন দরবারে বহাল হয়েছিলেন কিংবা ছেড়েই দিয়েছিলেন ওকালতি। আবার নতুন

ক'রে আরম্ভ করলেন ফিরেফিট্রি। তবে তার সম্ভাবনা কম। কেননা ওকালতি থেকে সরে এলে তারপরে হুম করে একবার মুর্শিদাবাদের মত শক্ত ঠাঁই-এ তাঁকে 'ভকিল' নিয়োগ করবে ইংরেজ কোম্পানী এটা ত বিশ্বাস হয় না। তবে যাই হোক না কেন, এটা রামচন্দ্রের বড় প্রমোশন কেননা মুর্শিদাবাদই তখন বাঙলার রাজধানী। ইংরেজরা যাঁকে সবচেয়ে বেশী ভয় খেত সেই মুর্শিদ কুলি খাঁ তখন সেখানে মুঘল দেওয়ান। এই প্রমোশনের সঙ্গে মাইনে কিন্তু বিশেষ বাড়েনি। দেখা যায় সর্বসাকুল্যে এই চাকরীতে তাঁর মাইনে হয় মাসিক সত্তর টাকা। নগদ চল্লিশ। ছয় জন পালকী বেয়ারার জন্য বার টাকা, পাঁচজন প্রতিহারী সাড়ে বার টাকা, একজন মশালচী দু'টাকা ও নিম্নশ্রেণীর চাকরবাকরের জন্যে আরও সাড়ে তিন টাকা।

সতেরশ' সাতান্নর পর আমরা এক রামচন্দ্রকে আবার বাঙলার সেই যুদ্ধ-বিধ্বস্ত পটভূমিকায় বেশ বড় পার্ট করতে দেখি। সিরাজদ্দৌল্লার যত দোষই থাক, যতই উড়ুনচণ্ডে বলে তাঁকে দোষ দেওয়া যাক্, দেখা যাচ্ছে তাঁর হত্যাকাণ্ডের পর বাঙলার রাজকোষে অর্থের অভাব ছিল না। সেখানে যে কোটি কোটি টাকার রৌপ্যমুদ্রা, স্বর্ণমুদ্রা, সোনার পাত, মনিমুক্তা, অলঙ্কার-জহরৎ ছিল, সেটাতো এখন প্রবাদে দাঁড়িয়েছে।

সিরাজদ্দৌল্লার এই সব অর্থ ইংরেজরা লুঠের টাকার মতই নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। সেত পুরণো খবর। কিন্তু তার চেয়েও বড় খবর হচ্ছে, সিরাজদ্দৌল্লার নিজের কিছু গুপ্তধন ছিল। সেটা জানতেন মীরজাফর আর উমরবেগ। আরও দুজনের চোখে এই রাজকোষ লুকিয়ে রাখা যায়নি। তাঁরা হচ্ছেন ক্লাইভের মুন্সী নবকৃষ্ণ আর রামচন্দ্র। শোনা যায় যে আর পাঁচ-কান যাতে না হয়, অর্থাৎ ইংরাজরা যাতে জানতে না পারে, কেননা পারলে ত টাকাটা তাদেরই খপ্পরে পড়বে, মীরজাফর এই টাকার কিছু অংশ এঁদের দুজনকে দিয়ে তাঁদের মুখবন্ধ করেন।

এর ফলে রামচন্দ্রের কি রকম অর্থপ্রাপ্তি ঘটেছিল, তার কোন হিসেব পাওয়া যায় না। অবশ্য এই তিন রামচন্দ্র যদি একই ব্যক্তি হন তবে তাঁর সম্পত্তির বহর দেখে আঁচ করতে পারা যায় কি রকম বড় দাঁও মেরেছিলেন তিনি এই সুযোগে। তিনি মাইনে পেতেন চাকরীর সুরুতে ত টাকা কুড়ি। শেষবেশ বেড়ে হয় ষাট। আর তাঁর রেখে যাওয়া সম্পত্তির পরিমাণ অনেকটা এই রকম—নগদ টাকা বাহাত্তর লক্ষ, মণি মুক্তা বিশলক্ষ টাকা দামের, জমিদারী আঠার লক্ষ টাকার এ'ছাড়া আশিটা সোনার কলসী, তিনশ'টা রূপার।

*　　　*　　　*

এই প্রসঙ্গে আর এক সমসাময়িক রামচন্দ্রের কথা বলে এই অধ্যায় শেষ করা যেতে পারে। জানি না, ইনি আর জন কোম্পানীর উকিল রামচন্দ্র—একই ব্যক্তি কিনা। তবে ইনি সারা বাঙলাদেশে কোম্পানীর রাজত্বের সুরু হবার আগে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ান বলে নিজেকে দাবী করেছেন হুগলী জেলার সোমড়ায় (সোমড়া শবিরা বৈদ্যনিকরের ধাম—দীনবন্ধু মিত্র) তাঁর প্রাসাদ-তুল্য বাসভবনের ফটকের মর্মর ফলকে! এঁরই উপন্যাসোপম জীবনীগ্রন্থ—'চাঁদরাণী'। লেখক তাঁরই বংশধর শ্রীবিপিনমোহন সেন। রাজা বৈদ্য রামচন্দ্র সেন। তাঁর চরিতকারের মতে, নদীয়ায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজবাটীর নিকটে নেদেরপাড়ার কৃষ্ণরামের ইনি কনিষ্ঠপুত্র। এই বংশের আদিপুরুষ রামরাম। তাঁর বড়ছেলে শিবরামের ছেলে কৃষ্ণরাম।

শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ মশায়ও 'চাঁদরাণীর' ওপর ভরসা করতে পারেন নি। পারার কথাও নয়। এই বইয়ে নানা অবিশ্বাস্য কাহিনীর পরিবেশন ছাড়াও যেসব সাল-তারিখ আমদানি করা হয়েছে, সেগুলি ধোপে টেঁকে না। কেননা, এই গ্রন্থের মতে রাজা রামচন্দ্র ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে ৬৪ বছর বয়সে মারা যান। অথচ "রামচন্দ্র সেন ১১৪৯

সালে" (১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে)—অর্থাৎ মাত্র তের বছর বয়সে "বলরাম রায়ের বাটীতে উপনীত হয়েন এবং তথায় পরিখা-বেষ্টিত হর্ম্ম্য নির্মাণ করিবার উদ্যোগী হইলেন"—এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ?

'চাঁদরাণীর' লেখকের মতে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিশ তাঁকে জমিদারীর কাজে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। তার জবাবে সেন-মশায় বলেছিলেন "তাদৃশবয়সে বেতনভোগী হইয়া কার্য্য করিবার ইচ্ছা নাই।" বিপিনমোহনের হিসাবে ত রামচন্দ্রের বয়স তখন মাত্র ছাপান্ন। তাঁর মত উদ্যোগী পুরুষসিংহের এই হাতের লক্ষ্মী পায়ের ঠেলার মত বোকামি কি বিসদৃশ ঠেকে না ? না কি তাঁর বয়স তখন আরও বেশি। জীবনীকারের তারিখটা ভুল ?

রামচন্দ্র জীবনের শেষকালটা কলকাতার সিমলেয় এসে কাটান। মুর্শিদাবাদে প্রথম জীবনে ইনি আলীবর্দীর নজরে পড়েন। এবং তাই থেকেই এঁর প্রতিষ্ঠা। মহারাজ নন্দকুমারের সঙ্গেও এঁর সখ্যতা ছিল। 'চাঁদরাণী'তে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে এঁর নানা কলহের কাহিনীও রয়েছে কিন্তু সেগুলি কতটা ইতিহাসসম্মত, ঈশ্বর জানেন। অবশ্য তাঁর বইটির প্রামানিকতা সম্বন্ধে লেখক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একটা সার্টিফিকেট জোগাড় করেছেন। বলছেন: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনান্ত হইবার ৫।৬ মাস পূর্ব্বে চাঁদরাণীর প্রথমভাগ তৎ-সমীপে পঠিত হইলে তিনি এই মর্ম্মে স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে "ইহাতে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি অতিসুচারুরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে।" এই অভিমত সত্বেও বলতে বাধা নেই, রামচন্দ্র সেন সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক তথ্য এই গ্রন্থ দিতে পারেনি। কাজেই জন কোম্পানীর উকিল রামচন্দ্র সম্বন্ধে কোম্পানীর সামান্য নথিপত্রের বাইরে জোর দিয়ে কোন কথাই বলা গেল না !

* * *

এদিক দিয়ে রাজারাম মল্লিক সম্বন্ধে অনেক কথাই ঐতিহাসিক

সত্য। এবং জন কোম্পানীর উকিল মহলে তিনিই নিঃসন্দেহে সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং করিৎকর্মা ব্যক্তি। আর কলকাতার স্থাপনার ব্যাপারে তাঁর মূল্যবান ভূমিকা সম্বন্ধে ক্ষীণ যেসব তথ্যাদি পাওয়া গেছে সেগুলি যদি অন্যান্য সূত্রে প্রমাণ করা যায়, তাহলে ত কথাই নেই। এইবার তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করে এই পুঁথিতে ডোরা বাঁধা যাবে।

রাজারাম মল্লিক

এটা অনেকের কাছেই রহস্যময় ঠেকা স্বাভাবিক যে সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে আসা কুঠিয়াল জব চার্নক হঠাৎ কি মহতী দৈবী প্রতিভাবলে সামান্য একটা হাটের 'স্ট্রাটেজী' আবিষ্কার করে ফেললেন! ভাগিরথীর কূলে সেই হোগলা ঝোপ, বাঁশবন, মশা আর কলেরার লীলাক্ষেত্র কলকাতার মধ্যে যে কি সম্ভাবনা সুপ্ত রয়েছে সেটা তাঁর মত এক পড়তা বিদেশী লোকের চোখে টপ্ করে ধরা পড়ে গেল, সেটা যদি কারও মনে সন্দেহের উদ্রেক করে, যুক্তিসহ বলে না মনে হয়, তাহলে কি তাকে বড় একটা দোষ দেওয়া যায়? এটা হয়ত ঠিক যে জব চার্নকের মত লোক না থাকলে হয়ত কলকাতার দৈন্যদশা ঘুচত না। তার আঁধার ঘরে হাজার মানিক জ্বলত না। কিন্তু সাহেবের সিদ্ধান্তের পিছনে স্বাভাবিকভাবেই কোন স্থানীয় মানুষের—তাঁর অভিজ্ঞতার জারকরসে পাকা পরামর্শের, কোন ভূমিকা ছিল—যে দুয়ের মনিকাঞ্চনযোগে বাঙলাদেশের রাষ্ট্রগগনে কলকাতার মত জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল, এই ধারণাটা কি একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায়?

চার্নকনগরীর প্রতিষ্ঠায় জব চার্নকের কৃতিত্ব খর্ব করার কোন কারণ নেই। সে সময় তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে দূরে, সাগরের কাছে-পিঠে একটা জায়গার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছেন। সরকারী হুকুম ছিল, চট্টগ্রাম চলো। তা তিনি কানে নেননি। এদিক ওদিক ঘুরে, নানা ঘটনাচক্রের মধ্যে দিয়ে শেষবেশ হাটখোলায় নৌকা ভিড়িয়ে কুঠি বানালেন। তাও, মনে যাই থাক, চার্নক সহজে হুগলী ছাড়েননি। তবে ব্যাপারটা দশচক্রে এমনভাবে ঘুরে গেল যে সে জায়গা তাঁর পক্ষে

অসহনীয় হয়ে উঠল। ফৌজদার আবহুল গণির আমলে মুঘল সৈন্যের সঙ্গে একেবারে প্রত্যক্ষ একহাত লড়াই-এর পরই না তিনি হুগলীর আশা চিরতরে ছেড়ে দিলেন।

ব্যাপারটা গোড়া থেকে বলা যাক। এটা অনেকটা ইংরেজদের 'এক্সজিসটেন্সের' লড়াই। কেননা, আবহুল গণি ইংরেজদের ওপর খাপ্পা হয়ে তাদের ব্যবসা তুলে দেবার হুকুম জারি ত করেইছিলেন; উপরন্তু, হঠাৎ ঢেঁড়া পিটিয়ে জানান হল, হুগলীর বন্দর-বাজারে ইংরেজদের জিনিষপত্র বেচা পর্যন্ত বেআইনী।

জিনিষ বেচবে না ত জিনিষ বেচবে না। ব্যবসার জিনিষ—গোড়া কাপড় বেচবে না। মলমল, মিহি কাপড় বেচবে না। কিন্তু তিনজন গোরা পল্টন হুগলীর বাজারে খাবার জিনিষ কিনতে গিয়ে দেখে, দেশী দোকানদার তাও বেচবে না—এটা কি অনাসৃষ্টি, অন্যায় নয়? খুব সম্ভব এই নিয়ে কিছু কথা কাটাকাটি হয়ে থাকবে। এবং এমনি অবস্থায় হঠাৎ ফৌজদারের কোতোয়ালী থেকে লোকজন এসে সেই তিনজন গোরাকে একেবারে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে গেল। গতিক সুবিধের নয় বুঝে চার্নকের হুকুমে কিছুদিন আগে থেকেই ইংরেজ পল্টনেরা হুগলীতে এসে জড় হচ্ছিল। আর শায়েস্তা খাঁ ইংরেজদের শায়েস্তা করার জন্যে বার হাজার মুঘল ফৌজ পাঠিয়েছিলেন হুগলীর ফৌজদার গনির সাহায্যে। দু'পক্ষই ভেতরে ভেতরে তৈরী। কাজেই এই সামান্য ঘটনা উপলক্ষ করে দুম দাম লেগে গেল। এবং আশ্চর্য ব্যাপার, লড়াই হল কি না হ'ল; তোপের আগুনে দু'চারটে খড়ের বাড়ী যাই পুড়ল, আবহুল গনি তাঁর পৈত্রিক প্রাণটা বাঁচাবার তাগিদে হুগলী ছেড়ে দে দৌড়। দে দৌড়। ব্যাস, সেনাপতিই যদি পালায়, সৈন্যরা আর কোন সাধে লড়াই করবে। কাজেই সাদা পতাকা উড়ে গেল! ইংরেজদের লড়াই ফতে। এই নিয়ে চার্নকের বীরত্ব সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তীও ছড়িয়ে পড়ল। সাহেব নাকি নদীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে তলোয়ার দিয়ে

ইংরেজদের নৌকা আটকান লোহার শিকল এক কোপে কেটে ফেললেন। এমনি কত কি।

কিন্তু পাকা লোক জব চার্নক বুঝলেন, এ লড়াই না হয় জিতলাম কিন্তু এটাই শেষ লড়াই নয়। এই জয় আর কতক্ষণ? কাজেই জলের ছেলে জলেই আশ্রয় নেওয়া ভালো। ইংরেজ জাহাজ বাঙলার ব্যবসা গুটিয়ে যাত্রা করল নিরুদ্দেশের পথে। ঠিক হয়ত নিরুদ্দেশ নয়। কেননা আপাততঃ গন্তব্যস্থল বালেশ্বর বলেই রাখা হয়েছিল সবাইকে। কিন্তু চার্নকের ইচ্ছে—হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, আর কোনখানে। পাল তুলে জাহাজ চলেছে। চলেছে তো চলেছেই। ভাটপাড়া। কাঁকিনাড়া। মুলাজোড়। বাঁকি বাজার। খড়দা। সুখচর। ডাচ বরানগর। চার্নক সাহেব তাঁর মাথার চোঙামতন টুপিটা খুলে বললেন, 'হল্ট। নোঙর কর।' সামনেই সুতানুটী। হাটখোলা গঙ্গার বালুবেলায় একটা বাজার বসেছে।

কিন্তু সাহেব কি দেখে মজলেন? কি ছিল সেই বনজঙ্গল হোগলা-বন-ঘেরা ঝিঁঝিডাকা কুমারী কলকাতার মুখে যা দেখে গোরা সাহেব তার প্রেমে পড়লেন? সবটাই কাকতালীয়? একেবারে আকস্মিক? নাও হতে পারে। হতে পারে, বা হওয়া স্বাভাবিক, যে এর পিছনে কোন বঙ্গতনয়ের কোন হাত ছিল। বোধ করি সেই বঙ্গজনের নাম রাজারাম মল্লিক। আজ চার্নকের নামে গগন ফাটে। দু'শ' বছর ধরে তাঁর মাহাত্ম্যের কথা বলতে বলতে, তাঁর স্বর্ণরেখাঙ্কিত প্রশস্তি-প্রস্তাবের পাতা উল্টাতে উল্টাতে রাজারামের নাম আমরা বিস্মৃত। এ' কথা নয় মল্লিকমশায় কলকাতা বানিয়েছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনে কাঠবেড়ালীর ভূমিকাও যখন আমাদের রামায়ণকথা থেকে বাদ পড়েনি, তখন কলকাতার সৃষ্টিগাঁথা থেকে রাজারামের নাম বাদ যাবে কেন? এইচ-ই-এ কটন 'বেঙ্গল পাস্ট এণ্ড প্রেজেন্টে'র এক প্রবন্ধে লিখেছেন—'...দি বেঙ্গলি ফ্যামিলিস হুইচ হ্যাভ বিন সো ক্লোজলি এ্যাসোসিয়েটেড উইথ ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া—দি সেটস, দি

বসাকস, দি মল্লিকস,—হুজ এ্যানসেসটার রাজারাম অফ ত্রিবেণী এ্যাডভাইজড চার্নক টু ট্রান্সফার দি কম্পানি'জ ফ্যাক্টরিজ ফ্রম হুগলী টু সুতানুটী…' —অর্থাৎ ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসনের প্রবর্তনের সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট যে সব বাঙালী পরিবার—শেঠ, বসাক ও মল্লিক—তাঁদেরই পূর্বপুরুষ ত্রিবেণীর রাজারাম চার্নককে কোম্পানীর কুঠি হুগলী থেকে সুতানুটীতে সরিয়ে নিয়ে যেতে পরামর্শ দেন… (খণ্ড : চব্বিশ ; পৃষ্ঠা : আটত্রিশ)। ক্রুশ তাঁর 'এনালসের' তৃতীয় খণ্ডে এটুকু স্বীকার করেছেন—'রাজারাম হ্যাড গ্রেট নগেজ ইন দি এ্যাফেয়ার্স অব বেঙ্গল।' খোদ সাহেবরাই যখন স্বীকার করছে, আমাদের কার্পণ্য কেন? না, গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না—এও সেই লিপ্সা।

আরও কথা আছে। প্রশ্ন হচ্ছে, রাজারামই বা এরকম পরামর্শ দেবার অধিকার পেলেন কোত্থেকে? সুতানুটী সম্বন্ধে তিনি কি উৎসাহিত হয়েছিলেন শুধু জায়গাটার ব্যবসায়িক সম্ভাবনা থেকে? কেননা সামরিক স্ট্র্যাটেজী সম্বন্ধে তাঁর ওয়াকিফহাল না হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সুতানুটীর ব্যবসা সম্বন্ধে, গঞ্জ হিসেবে একদা তার বিকশিত হয়ে ওঠার সম্ভাবনাকে তিনি কি ব্যবসায়ীর দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পান এবং তাই চার্নককে সেখানে আস্তানা গাড়তে উদ্বুদ্ধ করেন? টাকা-আনা-পাই-এর হিসেবেও সেটা হতে পারে। এর পিছনে তাঁর স্বার্থবুদ্ধিও সক্রিয় থাকতে পারে। ভেবে নেওয়া যেতে পারে, মল্লিকরা আগে থেকেই এই হাটে ব্যবসা করতেন এবং মল্লিকপ্রধান রাজারাম ভেবেছিলেন ইংরেজরা এলে সেই বাণিজ্য ফলাও হয়ে উঠবে। এই ধারনা যে একেবারে অমূলক নয়, তার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত পাওয়া যায় তৃতীয়বার যখন চার্নক কলকাতায় ফিরে আসেন সেই সময়ের ডায়ারি পড়লে। ব্যাপারটা বিশদভাবে আলোচনা করা দরকার। জব চার্নকের সুতানুটীর বুকে প্রথম পদার্পণ ঘটে এক শীতের দিনে। সেই ঐতিহাসিক তারিখটি—ঊনত্রিশে ডিসেম্বর, ষোলশ' ছিয়াশি। এই সম্বন্ধে সবচেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ

রবার্ট অর্মের 'কালেকসন' যা' উইলসন সাহেব তাঁর 'ওল্ড ফোর্ট উইলিয়ম ইন বেঙ্গল' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এইবার মাস দেড়েকেরও কম সময় ইংরেজরা সুতানুটীতে থাকতে পান। কেননা জব চার্নক ইতোমধ্যেই নবাবের সঙ্গে আরও একহাত লড়ে গেছেন। পাটনায় তাঁদের হেনস্থার বদলা নিয়েছেন। মুঘলদের নিমক মহল আর শিবপুরের বা থানার দুর্গ তিনি ইতোমধ্যে অধিকার করে নিয়েছেন। ওদিকে বালেশ্বরের কাছে নবাবী জাহাজ সব লুঠপাট করে নেওয়া হয়েছে। শহরও যুনিয়ন জ্যাকের করতলগত। কাজেকাজেই জব চার্নক সমুদ্রের দিকে আরও একটু সরে গিয়ে সদ্য-অধিকৃত হিজলীতে নোঙর ফেলেছেন এবং নবাবের সঙ্গে আলাপ আলোচনাও চালাচ্ছেন।

দেখতে দেখতে বছর খানেক প্রায় কেটে গেল। 'হিজলীর পানি'তে ইংরেজদের 'যমে মানুষে টানাটানি' হতে লাগল এবং পর বছর অর্থাৎ ষোলশ' সাতাশি সালের ত্রিশে ডিসেম্বর নবাব ইংরেজদের সব কসুর মাফ করে বাণিজ্য করতে হুকুম দিলেন এবং সুতানুটীতে আবার এলেন জব চার্নক। এবারেও তাঁরা এখানে অবস্থান প্রায় বছর দুই। এই সময়ে ঢাকার নবাব শায়েস্তা খাঁ তাঁদের শরণাপন্ন। আরাকানের নবাবের সঙ্গে লড়ায়ে জলের পোকা ইংরেজদের সাহায্য তাঁর অপরিহার্য। ইংরেজরা বললে, সাহায্য চাও দেব, কিন্তু তার আগে আমাদের দুর্গ বানাতে দিতে হবে। কথাবার্তা চলছে এমন সময় লণ্ডন-প্রেরিত নাছোড়বান্দা কাপ্তেন হীথ—উনিই ইংরেজ জাহাজের কমাণ্ডার—বললেন, ধ্যুত্তারি, বাঙলার এজেন্সীই আমরা তুলে দেব। বাঁধো গাঁঠরি, চলো বালেশ্বর। সেখানকারও মালপত্র, লোকজন, ফ্যাক্টর সব নিয়ে জাহাজ মাদ্রাজ যাবে। তারিখটা আটই নভেম্বর। ষোলশ উননব্বই। এই ঘটনা চার্নকের দ্বিতীয় পর্যায়ে সুতানুটী বিহারের ওপরে যবনিকা টানল।

বাঙলার নবাব তখন ইব্রাহিম খান্। তিনি দেখলেন, ইংরেজরা

চলে গেলে, বাঙলার বাণিজ্য ত গেল। কাজেই তাদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগলেন এবং তাঁর সেই প্রচেষ্টায় কাজও হ'ল। তৃতীয় দফা পাকাপাকি ভাবে সুতানুটীতে থাকবার জন্যে 'ম্যাড্ডাপোলম' জাহাজে করে চার্নক সাঁকরাইল এলেন। সেখান থেকে কাপ্তেন ব্রুকের জাহাজে সুতানুটীতে যখন পৌছলেন বেলা তখন দুপুর। ক'দিনই ঝমাঝম বৃষ্টি পড়ছে দিবারাত্রি ধরে। চার্নক ভেবেছিলেন সুতানুটীর বালুবেলায় সেদিনই—অর্থাৎ চব্বিশে অগষ্ট ষোলশ' নব্বই খৃষ্টাব্দে পায়ের ধুলো দেবেন। কিন্তু সে দুর্যোগের আবহাওয়ায় তা' আর করলেন না—নৌকাতেই ফিরে এলেন। ঐ দিনের সুতানুটীর ডায়ারিতে কয়েকটি লাইন লেখা আছে: '...মল্লিক বরখুরদার (Mellick burcoordar) এ্যাণ্ড দি কান্ট্রি পিপল এ্যাট আওয়ার লিভিঙ দিস প্লেস বারনিং ডাউন এ্যাণ্ড ক্যারিইং এ্যাওয়ে হোয়াট দে কুড'। অর্থাৎ এই জায়গা আমরা ছেড়ে চলে যাওয়াতে মল্লিক ব্যারাকদার এবং স্থানীয় লোকেরা যা' পেরেছে নিয়ে গেছে বা পুড়িয়ে দিয়েছে। সমস্যাটা আখিরে দাঁড়াচ্ছে এই Mellick burcoordar শব্দটার অর্থ নিয়ে। এর মানে কি 'কলকাতার কথা'র লেখক প্রমথনাথ মল্লিক মশায়ের মতানুযায়ী 'ব্যারাকদার মল্লিক' না উইলসন সাহেব যা বলেছেন Malik Barkhurdar—সঠিক বলা কঠিন। যাঁরই সঙ্গে আলোচনা হয়েছে, কেউই স্থির কিছু বলেননি। তবে আপাতঃ-দৃষ্টিতে মল্লিকমশায়ের অর্থটা অসঙ্গত বলে নাকচ করা যায় না। কেননা মল্লিক যে রাজকীয় 'টাইটেল' সেটা সবাই স্বীকার করেন। আর স্টেনগ্রাসের ফার্সী-ইংরাজী অভিধান অনুযায়ী বরখুরদার শব্দের অর্থ —সমৃদ্ধিশালী, গৌরবজনক। অন্য এক প্রামাণ্য অভিধানও (রস-হেইম) সফল, সমৃদ্ধিশালী, সুখী প্রভৃতি অর্থের কথা লিখেছেন। এর কোন অভিধাই ঠিক জুতসই নয় বলেই মনে হয়। কাজেই শব্দটি ব্যারাকদারের অপভ্রষ্ট হলেও হতে পারে।

তাই যদি হয় তবে ইংরেজদের সুতানুটীতে পাকাপাকি জাঁকিয়ে

বসার আগে মল্লিকরা যে এখানে কাজকারবার করতেন এমন একটা ধারণা ভুল নাও হতে পারে।

এছাড়াও আরও একটা দিক বিচার করা প্রয়োজন। জব চার্নক এদেশে আসেন ষোলশ' বাষট্টি সালে। বাঙলাদেশে মাত্র অল্প কিছুদিন কাশিমবাজারে কাটিয়ে তিনি পাটনার কুঠিতে বদলি হয়ে যান। তারপর ফের আসেন কাশিমবাজারে। তখন সেখানে কিন্তু একেবারে বড়কর্তা। তারপর হেজেসের আমলেও তাঁকে নিয়ে নানা কেচ্ছা। হুগলীতে তিনি কোম্পানীর এজেন্ট হয়ে এলেন ষোলশ' ছিয়াশিতে। আর সেই বছরের শেষেই ত তাঁকে হুগলী ছাড়তে হয়। কাজেই মুখ্যতঃ চার্নকের কাজ কারবার ভাগীরথীর এদিকটায় নয়। এইদিকে ব্যবসায়ের নানা হাটগঞ্জের পরিচয় এত স্বল্প সময়ের মধ্যে তাঁর রপ্ত হওয়া কি সাধারণভাবে সম্ভব? কতই এ রকম মনে করা অমূলক নয় নিশ্চয়ই যে স্থানীয় কোন ঝানু ব্যবসায়ীই তাঁকে দিব্যদৃষ্টি দিয়েছিলেন।

আরও একটা কথা। চার্নক হাটখোলায় কারবার খুললেন কেন? সুতার বা কাপড়ের কারবারী হিসেবে একটু এগিয়ে গিয়েই শেঠবাগানের কাছাকাছি শেঠেদের বসান তাঁতিদের ফ্যাকটরীর কাছেই তাঁদের বসাই স্বাভাবিক ছিল। এরও পিছনে মল্লিকদের হাত ছিল—এমন একটা সন্দেহ হয় বই কি! কেননা কালিঘাট-ভবানীপুর অঞ্চলই ত তখন তুলনামূলকভাবে হাটখোলার চেয়ে অধিকতর বাড়ন্ত।

কোম্পানীর রেকর্ডে রাজারাম মল্লিককে অবশ্য জন কোম্পানীর 'ভকিলের' মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। নানা রাজদরবারে তিন জন-কোম্পানীর জবরদস্ত প্রতিনিধি। ভকিল রাজারাম মাইনে পেতেন কুড়ি টাকা। সেকালে এটা অনেক টাকা। খাস সাহেব জমিদার রালফ্ শেলডন মাইনে পেতেন এর অর্ধেকেরও কম। এ ছাড়াও রাজারামকে একটা ঘোড়ার জন্য মাসিক পাঁচ টাকা এবং ডাইনে-বামে একটা করে পিয়ন রাখবার খরচা দিত হাড়কিপ্পন জন কোম্পানী।

কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন দুটো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এক

হয়ে কাজ করার পিছনেও রাজারামের কিছু হাত ছিল। সে সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্তে আসার মত কোন কাগজপত্র পাওয়া যায় না। তবে সতেরশ' চার সালের চৌদ্দই জুনের কাউন্সিল মিটিং-এ দেখা যাচ্ছে মুর্শিদকুলি খাঁর কাছে দুই কোম্পানীর একত্র কাজ কারবার করার সিদ্ধান্তের সংবাদটা মুর্শিদাবাদে নিজে যাচ্ছেন রাজারাম মল্লিক। কোম্পানী মল্লিকমশায়কে বরাত দিচ্ছেন যে তিনি যেন দেওয়ানজীকে বুঝিয়ে বলেন যে তাঁরা এখন একত্রে কাজ করছেন। কাজেই মুঘল সম্রাট যে সালিয়ানা তিনহাজার টাকার মোট শুল্কে তাঁদের ব্যবসা চালাবার ফরমান দিয়েছিলেন, সেটাই যেন চালু থাকে। তখনকার কাগজপত্রে দেখা যায় তাদের মালপত্র ছাড় করার জন্য মুঘল দরবার থেকে যে আরও দেড়হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে, ইংরেজরা তা দিতে অস্বীকার করছে। সে সম্বন্ধেও তদবির করতে বলা হয়েছে মল্লিককে। এ ছাড়াও বলা হয়েছে মুঘলদের যেন বোঝান হয় ইংরেজদের ব্যবসা বেড়েছে বলে তাদের যে ধারণা জন্মেছে, সেটা একেবারেই ভিত্তিহীন। বরঞ্চ উল্টোটাই ঠিক। পৌতি পৌতি কর্মচারীদের অন্যায় আবদার ও বাধাদানের জন্যে তাঁদের ব্যবসাপত্তর ত ডকে উঠবার উপক্রম। কোম্পানী টাকা দেবে কোত্থেকে?

একালের মতই সেকালে শুধু হাত মুখে উঠত না। কাজেই দেওয়ানের অধীনস্থ কর্মচারীদের দেওয়ার জন্য দশ গজ খুব মিহি কাপড়, দশ গজ অরোরা কাপড়, দশ গজ সাধারণ কাপড়, এক জোড়া পিস্তল, একটা জাপানী ঢাল, চার পেটি মদ, চার রকমের বিলিতি আয়না, আর দু'জোড়া পেন্সিল-কাটা ছুরি এবং কাঁচি উপহার পাঠায় কোম্পানী রাজারাম মারফৎ। ঘরখরচার জন্য রাজারামের হাতে দেওয়া হয় চারশো টাকা নগদ।

এই দৌত্যের কি যে ফল হয়েছিল, সেকথা জানা নেই। তবে দেখা যাচ্ছে ঠিক মাস দুই পরেই, রাজারাম তখন মেদিনীপুরে; তাঁকে আবার পাঠান হচ্ছে মুর্শিদ কুলি খাঁর কাছে। খাঁসাহেব তখন বালেশ্বরে।

এবারের উদ্দেশ্য মুর্শিদ কুলি খাঁর একটা সনদ জোগাড় করা যাতে বাঙলাদেশে কোম্পানীর ব্যবসার কোন রকম প্রতিবন্ধক না হয়। কেননা, অবস্থাটা এমনই দাঁড়িয়াছে যার ফলে কোম্পানীর কারবার ত বন্ধ হয়ে যাবার দাখিল। পরিশেষে ভকিলসাহেবকে বলা হল যে দেওয়ানজী বা তাঁর অনুচরেরা যদি 'অযৌক্তিক' টাকাকড়ি চায়, তাহলে কোম্পানীকে আগে জানিয়ে তবে যেন চুক্তি করা হয়। দেখা যাচ্ছে রাজারামের নিষ্ঠা, সততা ও ব্যবসাবুদ্ধির ওপরে কাউন্সিলের অগাধ বিশ্বাস। কারণ কত টাকা যে যৌক্তিক কতটা অযৌক্তিক তা' তারা বেঁধে দেয়নি। মল্লিকমশায়ের ওপরেই আস্থা রেখেছে।

অক্টোবরের দোসরা বালেশ্বর থেকে একটা চিঠি পাঠালেন রাজারাম। তাতে জানিয়ে দিলেন যে ওলন্দাজরা টাকাকড়ি উপহার দিয়ে তাদের কাজ গুছিয়ে নিয়েছে। ইংরেজ কোম্পানী যদি তাদের নবাবী পরোয়ানা পেতে চায়, তারাও যেন সেই মহাজন পন্থাই অনুসরণ করে। কাউন্সিল থেকে তড়িঘড়ি তার জবাব চলে গেল : রাজারাম যেন খোঁজ করেন—কতটাকা লাগবে সবশুদ্ধ। এবং এও জানিয়ে দেয়, যদি নেহাৎ অন্যায় আবদার না হয়, তারাও সে দাবী পালন করবে। তবে ইংরেজরা একটা খোঁচা তোলে। তাদের পরোয়ানা যেন সুবে বাঙলার হয় অর্থাৎ পাটনা কুঠির ব্যবসা বাণিজ্যের জন্যেও ছাড়ের হুকুম এই ফরমানের যেন অবশ্যই উল্লেখ থাকে। কলকাতার কাউন্সিলের এই চিঠির জবাব এল দিন পাঁচিশেক বাদ। দেখা গেল, রাজারাম পাকা লোক। তরী প্রায় তীরে ভিড়িয়ে এনেছেন। খোদ মুর্শিদ কুলি খাঁর সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে তাঁর। মুর্শিদ বোঝেন নগদ টাকা। ও'সব বিলিতি জিনিষপত্রের ওপর তাঁর আসক্তি নেই। তিনি চান হাজার ত্রিশেক টাকা। রাজারাম বলেছেন পনের হাজার। এখন কোম্পানী যদি রাজী থাকে, রাজারাম অগ্রসর হতে পারেন। কাউন্সিল বললে, এর আর না কি। মল্লিকমশায় যখন বলেছেন। তবে হ্যাঁ। পাটনার ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখেন যেন।

সতেরশ' পাঁচ সালের বাইশে জানুয়ারি রাজারামের জবাব এল। মুর্শিদ কুলি বিশ হাজারের কমে রফা করতে গররাজী। কোম্পানী তাতেই রাজী। সনদ না হলে ট্যাঁকশাল চালাতে পারছে না। কাশিমবাজারের অমন লাভজনক কুঠিটার ঝাঁপ খুলতে পারছে না। কাজেই কাঙালী ভাত খাবি, না পাত পেড়ে বসে আছি। ইংরেজদের সেই অবস্থা। তারা রাজারামকে মুর্শিদ কুলি খাঁর বর্ধমান শিবিরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটার দ্রুত ফয়সালা করতে বললে।

মুর্শিদ কুলি খাঁ চাপ দিয়ে ত্রিশ হাজারের মতনই আদায় করেন শেষবেশ। কোম্পানীর তর সয়নি কেননা, হুগলীতে তখন তাদের পাটনা থেকে পাঠান সোরা-বোঝাই জাহাজ আটকে ছিল।

রাজারাম মস্ত বংশের ছেলে এবং কলকাতায় বিখ্যাত মল্লিক বংশের প্রতিষ্ঠাতা। পিতৃদেবের নাম কৃষ্ণদাস দেব মল্লিক। রাজারামের দুই ছেলে—দর্পনারায়ণ ও সন্তোষ। সন্তোষ মল্লিকও বাবার মতই কীর্ত্তিমান। তিনি কলকাতায় একটা বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। সেটা আর মণ্ডু বাজার কলকাতার অন্যতম দুটি প্রাচীন বাজার। ইনি যে কোম্পানীর 'ভকল' ছিলেন ঢাকায়, সে খবর ত আগেই দেওয়া হয়েছে। দর্পনারায়ণের ছেলে নয়ানচাঁদ। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় এঁর দানধ্যানের খবর আছে। গোবিন্দরামের সঙ্গে ইনিও কোম্পানীর কাছ থেকে আটত্রিশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করেন। এঁরই তৈরী করা মল্লিক ঘাট। কৃষ্ণদাস দেবের সত্যবাদিতা ঐতিহাসিকতা লাভ করেছিল বলে 'কলিকাতার কথা'র লেখক জানিয়েছেন। মুগ্ধ সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁকে দিল্লী থেকে কলকাতা ফেরার পথে 'একটি হস্তী উপহার এবং পাথেয় দশহাজার টাকা দিতে আজ্ঞা করেন।'

কেউ কেউ বলেন রাজারামের পরামর্শে কোম্পানী যে তাদের ব্যবসা হুগলী-সপ্তগ্রাম থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়—হুগলীর ফৌজদার বা দেওয়ানের সেটা অজানা থাকেনি এবং এই কারণে তাঁরা মল্লিক বংশের ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। এবং তাঁদেরই অত্যাচারে ত্রিবেণী থেকে

রাজারাম কলকাতায় চলে আসেন। চলে আসেন বড়বাজারে। সেখানে তাঁরা ছিলেন উমিচাঁদের শ্যালক হুজুরীমলের প্রিয় প্রতিবেশী। বিরাট বাড়ী। সেই যে ছড়ায় আছে—

কায়েত মরে খেয়ালে

বেনে মরে দেয়ালে'

জোলা মরে তাঁতে

কাঙালী বাঙালী মরে মাছ আর ভাতে ॥

—ছড়াটার দ্বিতীয় চরণটা নাকি মল্লিকদের কলকাতার বাড়ীর চারিদিকে ডাকাতদের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্যে খুব উঁচু দেওয়াল নির্মাণের উপলক্ষেই বানান। মল্লিকরা বড়বাজারের আদি বাসিন্দাদের অন্যতম। নয়ানচাঁদ কলকাতাতেই জন্মগ্রহণ করেন সতেরশ' তেরয়।

জন কোম্পানীর এইসব আদি বাঙালী কর্মচারীদের কারওই গোটাগুটি ইতিহাস নেই। রাজারামেরও নেই। আক্ষেপ এই, কলকাতার জন্মের সঙ্গে যাঁর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ বলে অনেকে মনে করেন, তাঁকেও কলকাতা ভুলে গেছে। নির্মমভাবে ভুলে গেছে !

পরিশিষ্ট

সেকাল বাঙলার পালপার্বণ

জন কোম্পানীর বাঙালী কর্মচারীদের কাহিনী বলতে গিয়ে মাত্র কয়েকজনের গল্পই শুধু এখানে বলা হল। হল না যাঁদের কথা, সংখ্যায় তাঁরাই বেশি। সে দুঃখ যাবার নয়। কিন্তু এটা ঠিক, সংখ্যায় কম হলেও এঁদের মধ্যে দিয়ে অষ্টাদশ শতকের চাকরিজীবী বাঙালীদের একটা প্রতিকৃতি গড়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই চেষ্টা কতটা ফলপ্রসূ, সেই বিচারের ভার রসিকমহলের ওপর দেওয়াই ভাল।

কিন্তু এঁদের নিয়ে বা বাদ দিয়ে যে সুবিস্তৃত বাঙালী সমাজ তখন বহতা রাষ্ট্রনদীর নানা ভাঙাগড়া জোড়-বিজোড়ের হিসেব না মিলিয়ে, জাতির ভাগ্যগগনে নায়ক-উপনায়কদের উত্থানপতনে সম্পূর্ণ নির্বিকারচিত্তে আপন মনে আপন মতে ভেসে চলেছিল মৃদুমন্দ বাতাসে, সঞ্চরণশীল একখানা গ্রাম্য ডিঙি নৌকার মত—তার ছবিটা কেমন? সে ছবিটা হয়ত কীটদষ্ট। সেই প্রতিমা হয়ত অনাদরে বিলুপ্তপ্রায়। কিন্তু তার ফ্রেমটা আছে, চালচিত্তিরটা আছে। তার খানিকটা নিরিখ পাওয়া যায় সেকালের পালপার্বণের খোঁজখবর করলে।

এবং ভাবতে অবাক লাগে তার মোটামুটি একটা হদিশ পাওয়া যায় এমন একজনের প্রয়াসের ফলে যাঁর কথা, যাঁর ছবি গোবিন্দরাম মিত্রের গল্প বলার সময় খুব একটা উজ্জ্বল রঙে আঁকার অবকাশ হয়নি। তাঁর নাম জন জোফানিয়া হলওয়েল। কলকাতা কাছারির দুঁদে গোরা জমিদার। সতেরশ' সাতাশে সুরু কলকাতার 'মিউনিসিপ্যালিটি'র প্রথম 'চেয়ারম্যান'। আর তাঁর সাম্রাজ্য ছিল মোটামুটি সম্রাট ফরুক-শীয়রের দেওয়া ফরমানের আটত্রিশটি গাঁ—শালকে, কাসুন্দে, ব্যাটরা,

দক্ষিণ পাইকপাড়া, হোগলকুড়ে, দক্ষিণবাড়ী, বাহির দক্ষিণবাড়ী, হাওড়া, রামকৃষ্ণপুর, চিৎপুর, উল্টাডিঙি, গোবরা, ইটালী, হিণ্ডাণী, কাঁকুড়গাছি, শুঁড়ো, বাহির শুঁড়ো, ধলন্দা, তালতলা, সাপগাছি, কলিঙ্গা, জলা কলিঙ্গা, বেলগাছিয়া, সিমলে, আর্কুলি, বাঘমারী, শোঁদলপাড়া, কুলিয়া, ট্যাংরা, শিয়ালদহ, বির্জ্জি, তোপসে, চৌরঙ্গী, চৌবাঘা, মির্জ্জাপুর, শেখপাড়া, মাকন্দা ও কামারপাড়া। মিত্তিরজার কাহিনী বলতে গিয়ে যার কথা বলেছি তিনি সংকীর্ণ ইংরেজ স্বার্থের রক্ষাকর্তা। বেনে কোম্পানীর খাস কর্মচারী। সেটা তাঁর চরিত্রের একদিক। সেখানে তিনি মিস্টার হাইড্। পরিশিষ্টের এই অধ্যায়ে হলওয়েলের মধ্যে যে ডকটর জেকিল ছিলেন, তার পরিচয় মেলে। এবং এই সঙ্গে অষ্টাদশ শতকের বাঙালী সমাজের উৎসব-ব্যসনের একটা বিস্ময়কর আলেখ্য ধরা পড়ে। ধরা পড়ে আশশাওড়া, ভাঁটফুল, কন্টিকারীর ঝোপঝাড়-ঢাকা পালপার্বণে ভরা গ্রামগুলির একান্ত নিজস্ব ঘরের ছবি।

কিন্তু সেই গ্রামবাংলার পূজার শঙ্খধ্বনি শোনার আগে একটু কামান-গর্জ্জন শোনা যাক :

'আবার আবার সেই কামান গর্জ্জন।
কাঁপাইয়া ধরাতল
বিদারিয়া রণস্থল,
উঠিল যে ভীমরব, ফাটিল গগন।'

না, পলাশীর যুদ্ধের কাহিনা এটা নয়। তবে ছবিটা একই। এটা ইংরেজ আর নবাবী সৈন্যদেরই লড়াই, তবে স্থানকাল ভিন্ন। পলাশীর আম্রবীথি নয়, খাস কলকাতায় ডালহৌসী স্কোয়ার অঞ্চলের রণস্থল। কেউ বা মিষ্টি করে বলে লালদীঘির যুদ্ধ। কালটা জুন মাস, আঠারই, শুক্রবার। সত্তেরশ' ছাপ্পান্ন। কাঠফাটা রোদ। দুম দাম করে' কামানের গোলা ফাটছে। বন্দুকের আওয়াজ হচ্ছে অনবরত। হই-হই হই-চই, আর্তনাদ, চীৎকারে লড়াই তখন জমজমাট।

ইংরেজেরা অপ্রস্তুত অবশ্য ছিল না, কিন্তু আসলে তাদের প্রস্তুত হ'বার উপায়ই ছিল না বড়। উমিচাঁদ আগেই জানত নবাব কলকাতা-আক্রমণ করবে। এবং পাঁচরকম গুপ্তচরের মুখে কানে কানে ইংরেজরাও খবরটা জেনে ফেলেছিল। কিন্তু ঐ অবধি। অনেক করেও সর্বসাকুল্যে প্রায় সওয়া পাঁচশ'র বেশি লড়ায়ের লোক জোগাড়ই করতে পারেনি তারা। তাও অনেকেরই সেই হাতে বন্দুক নিয়ে হাতেখড়ি। তা' হোক, তবু লড়াই হল। ত্রিশ হাজার নবাবী ফৌজের সঙ্গে এক মুঠো ইংরেজ সৈন্যের। তারাও 'স্ট্র্যাটেজী' ঠিক করেছে। ব্যূহ রচনা করেছে। বড় বড় বাড়ির মাথায় কামান-বন্দুক বসিয়েছে। ফোর্টের সামনে বাঁয়ে তাদের তিনটি মূল ঘাঁটি। প্রথমটা মেয়রস কোর্ট বা একালের সরুচুড়ো সেন্ট অ্যাণ্ড্রুজ গির্জার জায়গায়। পরেরটা সেন্ট অ্যানস গির্জায়, সতেরশ' সাঁইত্রিশের ঝড় যেটার ঝুঁটি ভেঙে দিয়ে যায়, আর শেষ ঘাঁটি একেবারে গড়ের চৌহদ্দির মধ্যে—উত্তরে। একেবারে বাঘের মুখে—অর্থাৎ মেয়রস কোর্টে যারা ছিল, তাদের কাপ্তেন ডেভিড্ ক্লেটন। আর তার সহকারী জোফানিয়া হলওয়েল। হলওয়েলের পরিচয় ত আগেই দেওয়া হয়েছে। তখন কলকাতার সাহেব জমিদার। কাছারির কর্তা। ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ করেন। কলকাতার চোর ডাকাতদের সামলে সুমলে রাখেন। পুলিশ-প্যায়দা দিয়ে শান্তিরক্ষা করেন সময়মত। এখন বন্দুক হাতে নিজেই লড়ায়ে নেমেছেন।

তখন টেকখর রোদ। বেলা বাড়ছে। দরদর করে ঘাম ঝরছে গোরা সেপাইদের ঘর্মা গা বেয়ে। লালবাজারে কয়েকটা ফেলে-আসা বাড়িতে আস্তানা গেড়ে নবাবী ফৌজ তেড়ে গোলাগুলি চালাচ্ছিল। তোপ দাগছিল। আর সেগুলি ভাদ্র মাসের তালের মত ধুপ ধাপ করে পড়ছিল ইংরেজ ব্যূহের ওপরে আর বলাবাহুল্য মরছিল, আহত হচ্ছিল ইংরেজ সিপাহী। এমন অবস্থায় ক্লেটন বললেন হলওয়েলকে, বাপু হে, একবার ফোর্টে যাও ত। গভর্নর ড্রেককে বলে এস, এই

ঘাঁটি রক্ষা করা যাবে না। দৌড়ে যাও। কি করব জিগ্যেস করে এস।

হলওয়েল গেলেন আর এলেন। কিন্তু তার মধ্যেই সব ফর্সা। খেল খতম্। সব ছত্রভঙ্গ। কে কার কথা শোনে। হলওয়েল চোখে সর্ষে ফুল দেখতে লাগলেন। পড়তি-ঝড়তি যাও কয়েকজন সেপাই ছিল, তারা হুদ্দাড় দৌড়ে চলল ফোর্টের মধ্যে। যঃ পলায়তে স জীবতি। গতিক খারাপ দেখে হলওয়েলও আর ভাবলেন না। কেল্লায় ঢুকে আশ্রয় নিলেন।

কিন্তু এসব খিস্সা আমাদের আলোচ্য নয়। পরের দিন শনিবারের দুর্যোগের রাতে শহর কলকাতা থেকে ইংরাজ বীরপুঙ্গবরা সবাই যখন পালাতে পারলে বাঁচে, তখন ফোর্টের মধ্যে জরুরী মিটিং-এ হলওয়েল দাবী করে বসলেন, তাঁকেই গভর্নর করতে হবে। তিনি কারও তাঁবে কাজ করতে পারবেন না। এবং অবাক কথা, যে চাকরির জন্যে কত লোকের ঝুলোঝুলি, কত না তদ্বির তদারক, সেই পোস্টটাই এক কথায় বিনা বাধায় পেয়ে গেলেন হলওয়েল। ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নর। তস্যোপরি কমাণ্ডার-ইন-চীফ। কিন্তু এ গল্পও ত আমাদের অপ্রয়োজনীয়। জানি, নবাব সিরাজদ্দৌলার ফৌজ 'যৈসি খোলা তলোয়ার, ঘড়ি ভরমে জিত লিয়া কেল্লা কলকাত্তা বাজার' আর তাদের হাতে বন্দী হয়ে গভর্নর হলওয়েল মুর্শিদাবাদে চালান হলেন। সে কাহিনীও আমাদের দরকার নেই। প্রায় মাস খানেক মুর্শিদাবাদে মীরমদনের ভাত খেয়ে সাহেব যে হঠাৎ একদা ছাড়াও পেয়ে গেলেন হাজত থেকে, সে সবই আমাদের এই বৃত্তান্তে অবান্তর।

কিন্তু মোদ্দা কথা হচ্ছে, আমাদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক হলেও আলিনগরের লড়াই-এর চেয়ে আর কি বেশি জরুরী ছিল হলওয়েল সাহেবের 'কেরিয়ার' রচনায়? এই যুদ্ধের কল্যাণেই না হলওয়েল তড়িঘড়ি কাপ্তেন হলেন। তা না হলে কি কদাপি তিনি গভর্নর

হয়ে তাঁর আখির গুছাতে পারতেন? মীরকাশিম না মীরজাফর না মীরকাশিম—ক্লাইভের এই ফাটকা খেলায় তিনি কয়েক লাখ টাকা কামাতে পারতেন? কিন্তু কি জানেন, এই লড়াইটা অনেকটা প্রবহমান নদীর মত। এক কূল গড়ে ত, আর এক কূল ভাঙে। গভর্নর হলওয়েলের লাভ হলেও ভারত সংস্কৃতিপ্রেমিক জন জোফানিয়া হলওয়েলের মস্ত একটা ক্ষতি হয়ে গেল আলিনগরের লড়ায়ে।

আর তাই নিয়েই ত এ কাহিনীর সুরু। আলিনগরের লড়াই ফতে করে নবাব মনসুর-উল-মুলুক সিরাজদ্দৌল্লা হায়াৎ জঙ্গ বাহাদুর যখন মানিকচাঁদের হাতে এই পোড়া শহরের দণ্ডমুণ্ডের ভার দিয়ে মুর্শিদাবাদের উদ্দেশে তাঁর পাল্কী ছাড়তে বললেন, তখন কি ছিল কি কলকাতার? কিছু না। শুধু এক পরাজিত পরিত্যক্ত সম্রাট-শহরের সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত এক চেহারা। অবশ্য দেশী কলকাতার কালা বাসিন্দরা অনেকেই আগে থাকতে ভোঁ দৌড়। বাকি যাও ছিল, সাহেবরা তাদের পোড়ামাটি নীতি মোতাবেক তাও আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিল। তার উপর কামানের গোলায়, নবাবী সৈন্যের মশালের আগুনে আর সাহেব কলকাতার কিই বা অবশিষ্ট থাকতে পারে। হলওয়েলের তখন ছুটো কুঠি। একটা রাসবিহারী শেঠের ভাঙা বাড়ির পাশে, অপরটা এখনকার হেয়ার ষ্ট্রীটের কাছাকাছি—গঙ্গার ধারে কোম্পানীর এক কুঠির দক্ষিণে। নবাবী ফৌজের তোপ কি আর তার বাছবিচার করেছে?

কিন্তু এই কথাটা হলওয়েল লর্ড ক্লাইভকে বোঝাতে পারেন নি। পুতুল-নবাব মীরজাফরের কাছ থেকে ক্লাইভ কলকাতা লুণ্ঠনের খেসারৎ হিসেবে যে বিরাট অঙ্কের টাকা দেঁড়েমুসে আদায় করে নেন, সেটা তিনি একাই হজম করতে পারেননি। তার ভাগবখরা হয়। হলওয়েল-প্রতিপক্ষ গোবিন্দরাম মিত্তিরের দল তাতে মোটা ভাগ বসিয়েছিল। সে গল্প ত আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু জন জোফানিয়া হলওয়েলের বরাতে তার ছিটেফোঁটাও জোটেনি। তাঁর সব দাবীই খারিজ হয়ে

গিয়েছিল। অবশ্য একটি দাবী ছাড়া। এক বিচিত্র ক্ষতির জন্য কলকাতা কাউন্সিল হলওয়েলকে দিলেন দু' হাজার আর্কটী টাকা। কিন্তু কিসের ক্ষতি? শুনতে অবাক লাগে, তবু সত্যি। কলকাতা আক্রমণের ডামাডোলে হলওয়েল হারিয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব সংগ্রহের হিন্দুধর্মের কয়েকটি বিশিষ্ট শাস্ত্রগ্রন্থ। তাদের মধ্যে দু'টি খুবই মূল্যবান। এ ছাড়াও ছিল তাঁর আঠার মাস-দীর্ঘ কঠিন পরিশ্রমে ইংরাজীতে অনুবাদ করা পুঁথি একটা।

অবশ্য কি সেই শাস্ত্রগ্রন্থ, কার সাহায্যেই বা সেটিকে ভাষান্তরিত করতে পেরেছিলেন হলওয়েল, শ' দুই বছরেরও বেশী ব্যবধানে সে খবর খুঁজে বার করা শক্ত। তবে বাঙলা দেশের সমাজ-সংস্কৃতি, তার পালপার্বণের সমারোহ নিয়ে একদা তিনি যে বেশ পড়াশুনা করেছিলেন এ' খবর মিথ্যে নয়। লালদীঘির লড়ায়ে তাঁর মূল্যবান স্মৃতি গ্রন্থ-সংগ্রহ হারিয়ে গেলেও হলওয়েল আবার নতুন করে' গবেষণা শুরু করেছিলেন, ব্যর্থতার কাছে হার মানেন নি। এবং আরও বিস্ময়ের কথা, 'ব্ল্যাক হোল ট্রাজিডি'র সৃষ্টিকর্তার লেখার মধ্যে এই দেশের সংস্কৃতির ওপর তাঁর এক প্রগাঢ় শ্রদ্ধার ভাব বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে।

অথচ মানুষটা ত আসলে ডাক্তার। এ দেশের রোগডেরির ফিরিস্তি না দিয়ে তাঁর কলমে গ্রামপ্রধান বাঙলার পুজোপার্বণ, পারণ-ব্রত-উপবাসের তথ্যবহুল বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ অবশ্যই অবাক করবে সকলকে। একুশ বছর বয়সে ডাক্তার হয়ে বেরিয়েছিলেন হলওয়েল লণ্ডনের গাইস হাসপাতাল থেকে। তারপর যা' হয় তাই। ভাতভিক্ষের তাড়নায় সাত ঘাটের জল খেয়ে সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে গিয়েছিলেন জন কোম্পানীর ঢাকা কুঠিতে। সেখান থেকে পাটনা। তারপর সর্বতীর্থসার কলকাতায়। কলকাতার রহস্যময় জ্বরে পাথুরে গির্জার পাশেই কলকাতার পুরনো প্রথম ও একমাত্র হাসপাতালের ডাক্তার উইলিয়ম লিণ্ডসের হ'ল অকালমৃত্যু। আর সেই জায়গায়

কলকাতার স্বাস্থ্যের দেখভালের দায়িত্ব নিয়ে বসলেন সার্জেন জন জোফানিয়া হলওয়েল।

কিন্তু কলকাতার হাওয়ায় তখন ধূলোর সঙ্গে টাকা উড়ে বেড়াচ্ছে না? কোম্পানীর তখন ধূলোমুঠো ধরতে কড়িমুঠো। আর ডাক্তার হলওয়েল শুধু ছুরি-কাঁচি শিশি-বোতল ধরেই বসে থাকবেন? মাস গেলে মাত্র টাকা পঞ্চাশ বাঁধা মাইনেতেই খুশী? তাই কি একটা কথার মত কথা নাকি? তার চেয়ে কোম্পানীর খাস চাকরিতে ঢুকে পড়তে পারলে কেমন হয়? তোফা। তোফা। তদ্বির তদারকে কি না হয়। উদ্যোগী পুরুষসিংহের লক্ষীলাভ ঠেকায় কে? সতেরশ' বাহান্নয় হলওয়েল হলেন কলকাতার জমিদার।

কোম্পানীর কাছারি ত নয়, আনকোরা নতুন জগৎ। ডাক্তার যদ্দিন ছিলেন, দেখতেন কলকাতার গোরাদের—জাহাজী মাঝি-মাল্লা, মাতাল, খুনে রাইটার, গুদামবাবু, কেশিয়ার, বা অবরে সবরে আলে কালে কলকাতা কাউন্সিলের মেম্বারদের। মেমসাহেবরাও হাত বাড়িয়ে থাকবেন কখনও সখনও। কলকাতার আর হাসপাতাল কই। কালা কলকাতা তখনও জড়িবুটি, পাচন-সালসা, ঝাড়ফুঁক আর জলপড়ায় বেঁচে বর্তে রয়েছে।

কাছারি বাড়িতে পা দিয়ে সেই অপরিচিত, অনালোকিত কলকাতার ওপর থেকে অজ্ঞতার পর্দাটা সরে গিয়ে থাকবে সাহেবের। এখানে বসে হুঁকো টানতে টানতে কলকাতার সাধারণ মানুষদের সঙ্গে আলাপ হয়ে থাকবে হলওয়েলের। ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-শূদ্র, কায়স্থ-বদ্যির কলকাতা। কলু কুমোর ঢুলি-কাঁসারী, জেলে-ছুতোর-কসাই-আহিরী নানা জীবিকার মানুষদের জন্যে পাড়া বা টোলা ঠিক করে দিয়েই ক্ষান্ত হননি সাহেব, বাংলার সমাজজীবনকে, তাঁর কপিশ, কৌতুহলী চোখ দিয়ে দেখে থাকবেন তার পুজা-পার্বণ বারব্রতগুলি।

আর পুজো বলতে ত দুর্গাপুজো। তাঁর কলকাতার ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণে যে দোলদুর্গোৎসবের কথা বলেছেন হলওয়েল, তাতে

স্বভাবতই দুর্গাপুজো বলতে সাহেব পঞ্চমুখ। লিখেছেন: This is the grand general feast of the gentoos, usually visited by all Europeans (by invitation) who are treated by the proprietor of the feast with fruits and flowers in season and are entertained every evening while the feast lasts, with the bands of singers and dancers. অর্থাৎ আর কি—এটাই হচ্ছে দেশী ব্যক্তিদের সবচেয়ে বড় সার্বজনীন উৎসব। সব য়ুরোপীয়রাও সাধারণতঃ আমন্ত্রিত হন এবং গৃহকর্তা ফলে ও ফুলে তাঁদের অভ্যর্থনার আয়োজন করেন। এবং উৎসবের প্রতিটি সন্ধ্যায় নাচিয়ে ও গাইয়ের দল তাঁদের মনোরঞ্জন করে থাকেন।

আঠারশ' তেইশ সালের পূজোয় কলকাতায় ছিলেন ফ্যানী পার্কস। তাঁর বর্ণনাও হলওয়েলের বিবরণের হুবহু নকল বলে মনে হবে। সেখানে পূজামণ্ডপের পাশের ঘরে য়ুরোপীয় অতিথিদের জন্তে ছিল মেসার্স গাটার অ্যাণ্ড হুপারের সরবরাহ-করা নানা সাহেবী খানা, বরফ আর প্রচুর ফরাসী মদ। আর ওদিকে—ঝাড়লণ্ঠনের উজ্জল আলোকে উদ্ভাসিত লম্বা হলঘরে পশ্চিমা বাঈজীদের নাচগান কালা ধলা—দুই জাতের বাবুরাই পরম পরিতোষে আস্বাদন করেছিল।

জনবুল কাগজের এক রিপোর্টে জানা যায়, সাহেবদের এই আমন্ত্রণ কালে কালে কমে যায় এবং সেই সঙ্গে কমে যায় সেকালের বাবুদের নাচগানের মাইফেলের জৌলুষ। তবে কি জানেন, আজ থেকে শ' দুই বছর আগে শারদ সন্ধ্যায় ঝালর-দেওয়া সোনা-রূপো নক্সাকাটা পাল্কী চেপে, আগে আগে মশালচীর দেখান আলোয় বেহারাদের 'হুমব্র হো' হুমব্র হো' শব্দে কান ঝালাপালা করতে করতে 'ভুড়ুক' 'ভুড়ুক করে' আলবোলায় টান দিয়ে সাহেবরা যখন রূপলাল মল্লিক, প্রাণকেষ্ট হালদার, কুমারটুলির গোবিন্দ মিত্তিরের বা শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেবের রাজপ্রাসাদে দুর্গাপূজার প্রতিমা-

দর্শনের নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যেতেন—হলওয়েল বা তাঁর ভাইবেরা-দাররা, তখন কি তাঁরা আজকেই মতই প্রতিমা দেখতেন? না। অবশ্যই না। এক নতুন ধরণের প্রতিমা তাঁদের জন্য অপেক্ষা করত। অন্তত জন জোফানিয়া হলওয়েল ত তাই বলেছেন। প্রতিমা সংখ্যায় ছিল সাত। প্রত্যেকের আলাদা প্রকোষ্ঠ। শুধু দুর্গা, সবাহন লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, এবং মহিষাসুর নয়, দেবী দুর্গার ডানদিকে বৃষারূঢ় শিব এবং বামে—বললে হয়ত প্রত্যয় হবে না, বানরারূঢ় রামচন্দ্র! কুমারটুলির গোবিন্দরাম মিত্রের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে তাঁর বাড়ীতে যে দুর্গাপ্রতিমার পুজা হোত তার বর্ণনায় পাওয়া যাচ্ছে: ···all the idols which were seven in number, viz—the *Doorga* standing on a lion, and an *Asoor* or demon, the *Lakshmi*, the *Surusutty*, the *Mohadeb*, the *Ganesh*, *Ram Chunder* and *Kartic*, with their respective *Bahans* or conveyances were made separate and kept apart from each other. হলওয়েলের ছবির সঙ্গে এ বর্ণনার আগাগোড়া মিল।

বৃষারূঢ় দেবাদিদেব সম্বন্ধে হলওয়েল লিখেছেন, ষাঁড়টা সাদা, পবিত্রতা ও আধিপত্যের প্রতীক। শিবের গলায় সাপ। এক হাতে ডমরু, অপর হাতে শিঙা—যা সাহেবদের ভাষায় 'মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ইন ইউজ ইন জোভ্যাল ফেষ্টিভ্যালস'। শিবেরও হলওয়েলী ব্যাখ্যা আছে: ইনি হচ্ছেন সাক্ষাৎ জ্ঞান, প্রজ্ঞা, 'উইসডম'। পাপ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধশক্তি। আর পাপ নিবৃত্ত হলেই না আনন্দ!

দুর্গাপূজায় শিবের আরাধনা আজকের চোখে বিস্ময়ের কিছু নয়। ব্যাপারটা জানা। চেনা। হয় চালচিত্রে নয় অন্য কোথাও বা একেবারে শিবদুর্গা মূর্তিতে শারদীয় পূজা তাঁর বরাদ্দ। বোধনে বিল্ববৃক্ষের রূপে আর দশমীতে রুদ্র হয়ে শিববন্দনা দুর্গাপূজার অঙ্গীভূত। কিন্তু সরস্বতীর বামে বানরারূঢ় রামচন্দ্র—তাজ্জব কাণ্ড!

শারদীয় অকালবোধনের নায়ক রামচন্দ্র। কিন্তু দুর্গা প্রতিমায় তাঁর অস্তিত্বের সমর্থনে কলকাতার গোরা জমিদার বাহাদুর বলেছেন ভিন্ন কথা। রাম সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্তা। এঁর মাথায় শিরোভূষণ। গলায় সাপ। আর চেপে রয়েছেন হনুমানের কাঁধে। হলওয়েলের মতে মহিষাসুর রাবণের অনুগামী। রাবণ সীতাকে হরণ করে। রাম তাই তাকে হত্যা করেন। আর তাঁর এই অসামাজিক শক্তির সঙ্গে লড়ায়ে মদত জুগিয়েছিল বানর—চাতুর্য, ফন্দি আর কূটকৌশলের যে প্রতিভূ। এবং এই প্রসঙ্গে সাহেব আর একটা খবর লিখেছেন। কালনার কাছে আমবোনার বনে সেকালে বাঁদরদের একটা মস্ত আড্ডা ছিল। আর রামের আখ্যান নিয়ে হত সেকালের রামযাত্রা। বাঙলায় থাকবার সময়ে যা অনেক রাত করে' তাঁর দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। সাহেব লিখেছেন এ সব পালা শেষ হত সীতার অগ্নিপরীক্ষার পর। এ খবরটা বড় একটা বাজে নয় তার সাক্ষী সেকালের সংবাদপত্র। 'বেঙ্গল পাস্ট এ্যাণ্ড প্রেজেণ্ট'-এ আব্দুল আলি সাহেব লিখেছেন :

The Doorga Puja of Bengal is the Dussehra of West and South India. In Bengal, it is associated with peace and plenty. In other parts of India, it takes the form of a military festival in commemoration of Rama's conquest of Ceylon.—অর্থাৎ বাঙলার দুর্গাপূজা পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের দশেরা। বাঙলায় এই পূজা শান্তি ও প্রাচুর্যের। ভারতের অন্য প্রান্তে এটা সামরিক উৎসবের রূপ নেয়—যেন রামের লঙ্কা জয়ের স্মারক। আঠারশ' পঁচিশে ছাপা 'নাম-জাহানমুমা' নামে এক ফার্সী সাপ্তাহিকে খবর রয়েছে—লক্ষ্ণৌ শহরে দশেরা উপলক্ষে গোমতী নদীর তীরে খুব ঘটা করে' রামলীলা যাত্রার অভিনয় হত। সিন্ধিয়ার দরবারেও দশেরার সন্ধ্যায় ছিল রামযাত্রা। ছিল শহর কলকাতাতেও। হুতোম ত রামলীলার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে বলেছেন, এটা এদেশের পরব নয়—এটি প্রলয় খোট্টাই।

সে যাই হোক, রাম-বন্দনার আর একটা ব্যাখ্যা মনে আসতে পারে। হলওয়েলের আমলেই কলকাতা একটা 'কসমপলিট্যান' শহরে পরিণত হয়েছে। রুজিরোজগারের আশায় এসেছে দূরদূরান্ত থেকে উমিচাঁদ, হুজুরীমল, দেওয়ান কাশীনাথের দল। ইংরেজরা ত আছেই। শারদায় দুর্গাপূজায় রামের আবির্ভাব কি সেই সামাজিক অবস্থার ইঙ্গিত বহন করে না?

হলওয়েল বলছেন গোঁসাই আর ভট্টাচার্যদের কথা। অঘোতরাবাদী শাস্ত্র (Aughtorrah Bhadu Shastu) বা 'এইটিন বুকস অফ ডিভাইন' (অষ্টাদশ পুরাণ ?) অনুসারে এই দেবী মাহাত্ম্য খ্যাপন করছেন তিনি। এবং সেই শাস্ত্র নির্দেশেই তিনি লিখেছেন দেবী বলে দেবী—দেবীদুর্গা দেবী শিরোমণি। সম্মানে আর মহিমায় অতুলনীয়া। এঁকে হিন্দুশাস্ত্রের সবচেয়ে বড় অ্যাকটিভ্ দেবী বলে রায় দিয়েছেন হলওয়েল। হলওয়েল ত মা কালীর কথা জানতেন, তবু এ অভিধা দুর্গাকে কেন দিলেন কে জানে? যাই হোক, দুর্গার স্বামী শিব। রুদ্র। সংহারক। সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়ের তিন আদি দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। এই তৃতীয় জনই শিব। আর তাঁরই ঘরনী দুর্গা, কখনও ভবানী, কখনও বা উভয়ই—দুর্গা-ভবানী।

কিন্তু কেন এই দেবীর আবির্ভাব? পৌরাণিক সেই নাটকীয় কাহিনী হলওয়েলের কলমেও। অবশ্য কিছু ভুলত্রুটি সমেত। ইন্দ্র এবং তাঁর অনুগামীদের ঈশ্বর দিয়েছিলেন বিশ্বের রাজপদ। কিন্তু এটা কখনও ভালো চোখে দেখেনি মহিষাসুর। লাগল লড়াই। অন্তহীন সংগ্রাম। লড়াই চলতে চলতে এসে গেল দ্বাপর। এবং ইন্দ্রের দল পরাজিত। পলায়িত। রাজত্ব এসে পড়ল মহিষাসুরের হাতে। ফলে পৃথিবীতে নেমে এল লুণ্ঠন, খুন খারাপি, বিশৃঙ্খলা। নৈরাজ্য। মানবজাতির প্রতি সমবেদনায় পলায়িত ইন্দ্র এবং দেবগণ ভক্তিসহকারে ও বিনম্রভাবে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের আদি কারণ একমেবাদ্বিতীয়ম ঈশ্বরকে বললে বিচার করতে। মহিষাসুরের সব

ক্ষমতার সংহরণ করতে। ঈশ্বর বললেন, তথাস্তু। মহিষাসুর ও তার সাঙ্গপাঙ্গ নিধনে ভবানী দুর্গা মর্তধামে অবতীর্ণ হবেন। এবং সেই পরমকারুণিকের কৃপায় এই বিশ্বের রাজপাট আবার ইন্দ্রের হাতে চলে গেল। হলওয়েল বলছেন, এইভাবেই দুর্গার মর্তে আবির্ভাব এবং পূজার শুরু। এবং এই পূজাকালে সেই চিরন্তন এককে আহ্বান করা হয় যাতে অসুরদের হাত থেকে মুক্তির কাল ত্বরান্বিত হয় পৃথিবীর।

জোফানিয়া হলওয়েল আরও বলেছেন, এহ বাহ্য। এই কাহিনী রূপক। আসলে দুর্গা ধর্মের প্রতীক। এই মূর্তি আর কিছুই নয়, ধর্মের অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার প্রতীক shewing the power and irresistable force of virtue when exerted with vigour. এই কাহিনী এই সত্যই উদ্ভাসিত করছে—যদি অনন্যচিত্তে ধর্মের ক্ষমতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে সেই দুর্বার শক্তি কি বিপুল সম্ভাবনাই না বহন করে!

অবশ্য দুর্গাপূজা, বাঙলা দেশের তেত্রিশটি পালপার্বণের মধ্যে প্রধান হলেও অন্যতম মাত্র। আরও বত্রিশটি পার্বণের কথা সবিস্তারে বলেছেন সাহেব। তাঁর জ্ঞানে হিন্দুদের বছর শুরু পয়লা এপ্রিল থেকে। বলাবাহুল্য এটা কিছু ভুল। বাঙলা বছর আরম্ভ এপ্রিলের মাঝামাঝি। বাঙলা দেশের পালপার্বণে হয় থাকে উপবাস, নয় পূজা বা ব্রত। নয়ত বা উৎসব-ভোজনপর্ব। সাহেবের বিশ্লেষণে—হিন্দুদের পার্বণ চাঁদের টানাপোড়েনে—একাদশী থেকে অমাবস্যা পূর্ণিমা, প্রথমা থেকে দশমীর বিচারে। পূজার নৈবেদ্যে যে থাকে ফল, গাছ, দোলো চিনি, নুন, ভোগ এবং বিভিন্ন ধরনের ডাল—মুগ, ছোলা, মটর ইত্যাদি—এ' সবই সাহেবের চোখ এড়ায়নি, এটাও কি কম বিস্ময়ের কথা?

এখন মাসে মাসে সেকালের ব্রত পার্বণের হলওয়েলী বিবরণ শুনুন: বৈশাখ মাস। বছর শুরু। দু'টি পর্ব।—অক্ষয় তৃতীয়া আর বৈশাখী পূর্ণিমা। অক্ষয় তৃতীয়ায় ব্রাহ্মণদের ভিক্ষা দেবার প্রথার

কথা বলছেন হলওয়েল। এটি শাস্ত্রসিদ্ধ প্রাচীন বিষ্ণু-পূজা। তবে সবচেয়ে মজার খবরটা কাসুন্দীর। হলওয়েল উবাচ—কাঁচা আম, তেঁতুল, রাই সরষে আর খাঁটি সরষের তেল দিয়ে এই শুভ অক্ষয়তৃতীয়ার দিনে বাংলাদেশে কাসুন্দী তৈরী করা হয়। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মশায় তাঁর 'বাঙলার পালপার্বণে' এই তথ্যের সমর্থন করছেন : 'বৈশাখ মাসে নূতন সরিষা ধুইয়া ঘরে তোলা ও তাহা দিয়া কাসুন্দি তৈয়ার করার উৎসব উত্তর ও পূর্ববঙ্গে প্রচলিত আছে।'

জ্যৈষ্ঠে ষষ্ঠী নিয়ে তিনটি পার্বণ। অরুণ ষষ্ঠী বা জামাই ষষ্ঠী ছাড়াও রয়েছে দশহরা বা গঙ্গাপূজা, এবং স্নানযাত্রা বা স্নানপূর্ণিমা। অরুণ ষষ্ঠী প্রাচীন স্মৃতিকারদের অরণ্য ষষ্ঠী। জামাইদের দিন হিসেবে তিথিটির মর্যাদা আজও অক্ষুন্ন। দশহরার গঙ্গাস্নানের কথাও বলেছেন হলওয়েল। জীমূতবাহন, বৃহস্পতি, শ্রীনাথ ও রঘুনন্দন—সকল বিখ্যাত স্মৃতিকারই বিধান দিয়ে গেছেন—এই তিথিতে গঙ্গাস্নানে দশবিধ পাপ মোচন হয়। স্নানযাত্রা সেকালের রথযাত্রার বিকল্প ; বোধ করি সেকালে রথের চেয়ে বড় উৎসব। কৃষ্ণ পূজার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবশ্যই অবকাশ আছে।

আষাঢ় মাসেও পরব উপবাস তিনটি। রথযাত্রা, শয়ন একাদশী এবং আষাঢ় পূর্ণিমা। এই তিনটেই জনপ্রিয় পর্ব। শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশযাত্রার মধ্যে রথযাত্রা শুধু জনপ্রিয়ই নয়, স্মার্ত রঘুনন্দনও এ' সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। শয়ন একাদশী নিরম্বু উপবাসের দিন—বিষ্ণুর অনন্তশয্যার মাহাত্ম্য প্রকাশ করে। আষাঢ় পূর্ণিমায় গঙ্গাপূজা ও দানধ্যান বিধেয়। হলওয়েলও সেকথা বলেছেন।

তেমনি উল্লেখ করেছেন শ্রাবণ মাসের শ্রাবণ দ্বাদশী, ঝুলনযাত্রা, ভাদ্রের জন্মাষ্টমী, ভাদ্রলক্ষ্মী, অনন্তচতুর্দশীব্রত এবং অরন্ধনের কথা। ঝুলনযাত্রাও কৃষ্ণের উৎসব। ভগবান বাসুদেবের আবির্ভাব উপলক্ষে জন্মাষ্টমীই কৃষ্ণউৎসবগুলির মধ্যে প্রধান। হরিভক্তিবিলাসেও এই উৎসবের উল্লেখ আছে। ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষে নির্দিষ্ট

বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীপূজা বাঙালী ঘরের একান্ত আপন পর্ব। ঘরে ঘরে গিন্নী বউরা লক্ষ্মীর ঘট সাজায়। সুন্দর করে আলপনা দেয়। আর যখন দিনের শেষে অন্ধকারের পর্দা বাদুড়ের মত গাঁয়ে গাঁয়ে ঝুলতে থাকে, তখন পাটের শাড়ি পরে তারা তাদের লক্ষ্মীর পাঁচালী নিয়ে বসে। সুর করে পাঠ করে। আর তাদের ঘিরে বসে, ভক্তিপ্লুত মনে আরও একরাশ মেয়ে-বউ এবং মনে তাই শোনে। লক্ষ্মীর পূজার পর বিষ্ণুর। অনন্ত চতুর্দশীতে। ভাদ্র সংক্রান্তিতে অরন্ধন মনসার পূজা। বাড়ি বাড়ি সেদিন উনুন জ্বলে না। সাহেব বলেছেন, সেদিন সবাই পান্তা খায়। ঠাণ্ডা খায়।

আশ্বিনে দুর্গাপূজা ও বিজয়া দশমী ছাড়া হলওয়েলের বিবরণে রয়েছে কোজাগরী পূর্ণিমার কথা। সেদিন রাত্রের লক্ষ্মীপূজায় নারকোলের জল খাওয়া হয়। স্মৃতিকাররা এই পূজা সম্বন্ধে বলেছেন :

নিশীথে বরদা লক্ষ্মী : কোজাগর্তীতি ভাষিণী।
তস্মৈ চিত্তং প্রযচ্ছামি অক্ষৈঃ ক্রীড়া করোতি যঃ॥

হলওয়েল নিশিজাগরণের কথা বলেছেন, পাশা খেলার কথা নয়। কার্তিকে কালীপূজা। কলকাতায় দু' যুগ মতন থেকে হলওয়েল যে বিশেষ করে' কালীঘাটের কালীর কথা বলবেন, আশ্চর্য কি? বলছেন—This goddess is worshipped all the night of that day universally but in a more particu'ar manner at Kaleeghat, about three miles south of Calcutta; an ancient Pagoda dedicated to her there, stands close to a small brook, which is by the Brahmins deemed to be the original course of the Ganges. অর্থাৎ সর্বত্রই এই দেবীর এই দিন সারারাত্রি ধরে পূজা হয়। তবে বিশেষভাবে হয় কালীঘাটে—কলকাতার তিন মাইল দক্ষিণে। সেখানে তাঁর এক মন্দির আছে এক ক্ষীনতোয়া নদীর ধারে। ব্রাহ্মণেরা মনে করেন—এটাই আদি গঙ্গা।

হলওয়েল বলছেন, কালীঘাটে দেবীর চোখ পড়েছিল। স্থানীয় বিশ্বাস ভিন্ন। তাঁদের মতে সুদর্শন চক্রছিন্ন সতীদেহের কনিষ্ঠ আঙুল পড়েছিল এখানে। এ ছাড়াও কার্তিকে রয়েছে রাসযাত্রা যা' নাকি প্রচুর সমারোহে পালিত হ'ত সেকালের বৃন্দাবনে। রাসের পৌরাণিক কাহিনীও রয়েছে সাহেবের 'হিস্টোরিকাল ইভেন্টস্'-এ। কৃষ্ণের জন্ম হলে গোপকুমারীরা আনন্দে উল্লসিত হয়ে নাচতে শুরু করে। কৃষ্ণ স্বয়ং সেই আনন্দোল্লাসের অংশভাক্ হ'ন এবং গোপিনীদের আকিঞ্চনে বহু হয়ে প্রত্যেকটি গোপিকার সঙ্গে নৃত্য করেন। অবশ্য কার্তিকের বড় পূজা—কার্তিকেয় পূজা। কার্তিক নাকি দেবালয় প্রহরায় নিযুক্ত। প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থে কিন্তু এই পূজার খবর নেই। তবে শূলপানির 'ব্রত-কাল বিবেকে' কার্তিকপূজার প্রাচীনতম উল্লেখ আছে।

অগ্রহায়ণে পূজাপার্বণে রয়েছে নবান্ন আর লক্ষ্মীপূজা—প্রথমটি বৃহস্পতিবারে অপরটি ও সংক্রান্তিতে। পৌষের শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী-পূজা আর অরুণোদয় সপ্তমী বা মাঘ সপ্তমী ব্রত। এই অরুণোদয় সপ্তমীর স্নানে সকল পাপ মোচন হয়। রঘুনন্দনের 'তিথ্যাদিতত্ত্বে' এই ব্রতকে বলা হয়েছে সূর্যব্রত। এই মাসে আরও রয়েছে ভীমএকাদশী এবং পৌষপূর্ণিমা। মাঘে ফাল্গুনে—শিবচতুর্দশীর ব্রত বা শিবরাত্রি। গোবিন্দ একাদশী। দোলযাত্রা। বারুণী যাত্রা। সাহেব এই শেষোক্ত পার্বণ সম্বন্ধে একটু বিশদ করেই বলেছেন: বারুণী যাত্রারই অপর নাম মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশী। সাধারণত পড়ে শনিবার। তবে কথা আছে। শতভিষা নক্ষত্রে এই বারুণী পড়লে হয় মহাবারুণী। সতেরশ' ঊনষাটের আটাশে ফেব্রুয়ারি—এমনি এক মহাবারুণী পড়েছিল বলে জানাচ্ছেন হলওয়েল। চৈত্র মাসে চৈত্রলক্ষ্মী, বাসন্তী পূজা এবং সবশেষে চড়ক। সেকালের সকল সাহেব-মেমদের মতই চড়কের বাণফোঁড়া, 'সন্ন্যাসী'দের কৃচ্ছ্রতা সাহেবকে আকৃষ্ট করেছিল। তখন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য আর কায়েতদের এই 'সন্ন্যাস' গ্রহণ ছিল নিষিদ্ধ।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বাঙালী, হিন্দুর পালপার্বণের দীর্ঘ-

তালিকায় রয়েছে আরও অনেক পার্বণ। রয়েছে রামযাত্রার কথা। এই পার্বণ অবশ্য কবেকার সাহেব মনে করতে পারেনি। তবে পার্বণটি ছিল, সন্দেহ নেই। সাহেব অন্তত তাই জোর দিয়ে লিখেছেন। মনে হয়, ওই রামযাত্রা—রামনবমীর ব্রত। বাসন্তীপূজার নবমী তিথি রামের জন্মদিন। সাহেব সেই পার্বণের কথাই মনে করে থাকবেন। তবে বিস্মৃতি সাহেবকে বহুভাবেই বিরক্ত করেছে। যেমন মহাবারুণী তিথি প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, বারুণী শব্দটির অর্থ তিনি হারিয়ে ফেলেছেন, কাজেই এ ব্যাপারে তিনি ব্যাখ্যা করতে অপারগ।

তা হোক তবু একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে সাহেবের চোখ ছিল। নিষ্ঠাও ছিল। এবং বহু সামান্য সামান্য লৌকিক পর্বও তাঁর দৃষ্টি এড়ান নি। ঢাক পিটিয়ে যে সব উৎসব হয় বাঙলা দেশে সেগুলির খবর যেমন তাঁর হিসেবে স্থান পেয়েছে তেমনি ঠাঁই পেয়েছে বাঙলার একান্ত নিভৃতে পাখি-পাখালি ডাকা ঝোপঝাড়-জঙ্গলে ঘেরা গ্রামের বুকের ছোট ছোট পার্বণ। আষাঢ় মাসে অম্বুবাচী বাঙলার নিজস্ব পার্বণ। ধরিত্রী এই সময়ে রজস্বলা হয় বলে বিশ্বাস এবং সেই কারণে ধরণী রজস্বলা নারীর মত অস্পৃশ্য। গাঁয়ের চাষী এই তিনদিন মাঠে লাঙ্গল ধরবে না। বিধবারা স্পর্শ করবে না সদ্য পাককরা খাদ্য। সাহেব লিখছেন—Umbobishee—during which space, the earth is left to her purgations, and neither plough, spade nor any other instrument of tillage, permitted to molest her .... (like) .... women under the same circumstances. এ'ছাড়াও সাহেব লিখেছেন বাঙলার একেবারে নিজস্ব পর্ব নবান্নর কথা—চাষীর ঘরে নতুন ধান উঠলে মাসের কোন শুভ বৃহস্পতিবারে যে নবান্ন হয়—বিদেশী সাহেবের চোখে তা এড়ায় নি।

এবং এর চেয়েও বড় কথা, ব্ল্যাকহোল ট্রাজিডির কুখ্যাত রচয়িতা জন জোফানিয়া হলওয়েলের ভারতীয় দর্শনের ওপর অপরিসীম গভীর শ্রদ্ধা। যারা হিন্দুদের a race of stupid and gross idolators

বলে মনে করে তাদের ধিক্কার দিয়ে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন যে মিশরীয় গ্রীক ও রোমানদের পুরান কথা ও উৎপত্তিতত্ব এমন কি পূজাপ্রকরণ ও প্রতিমার শ্রেণীভেদ স্পষ্টতই ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে ধার করা যদিও তা সাংঘাতিকভাবে বিকৃত ও খণ্ডিত। সাহেব লিখেছেন—that work opened upon me, I distiuctly saw that the mythology, as well as the cosmogony of the Egyptians, Greeks and Romans were borrowed from the doctrines of the Brahmins ···even to the copying their exteriors of worship and the distribution of their idols, though grossly mutilated and adulterated.

তবে একথা নয় যে, সাহেব বাঙালী ব্রাহ্মণ বলতেই কাঁধে তুলে নিয়ে উদ্বাহু হয়ে নেচেছেন। তিনি সেকালের বাঙালীদের সঙ্গে বেশ কয়েক বছর ঘর করেছেন। তাদের দেখেছেন। চিনেছেন। তাদের সম্বন্ধে বলেছেন:

The Gentoos in general are as degenerate, crafty, superistitious, litigious and wicked a people as any race of beings in the known world, if not eminently more so, especially the commoners of the Brahmins; and we can truly aver that during almost five years that we presided in judicial cutcherry court of Calcutta, never any murder or other atrocious crime, came before us, but it was proved in the end, a Brahmin was at the bottom of it.

অর্থাৎ সাহেব বলতে চেয়েছেন, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মতই হিন্দুরা সাধারণত হচ্ছে অধঃপতিত, ধূর্ত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, মামলাবাজ এবং দুষ্ট। কিংবা তারও কিছুটা বা বেশি। বিশেষ করে সাধারণ

ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে হলফ করে' তিনি বলতে পারেন, কলকাতা কাছারির বিচার বিভাগের প্রায় পাঁচ বছর দণ্ডমুণ্ডের মালিক থাকার সময়ে তিনি দেখেছেন, যে কোন খুনখারাপি বা ঐ জাতিয় কোন ভয়ঙ্কর অপরাধের গোড়ায় আছে কোন না কোন ব্রাহ্মণ।' মনে হয়, সাহেব বলতে চেয়েছেন উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের কথা। গোবিন্দরাম মিত্র প্রমুখদের হাতে নাজেহাল কলকাতার সাহেব জমিদার হলওয়েলের এই আর্তোক্তির মধ্যে সবটাই হয়ত বাস্তব অভিজ্ঞতা নয় কিছু বা জ্বালা কিছু বা ক্ষোভ এসে মিশেছে। কিন্তু দার্শনিক হলওয়েল পরক্ষণেই কথা কয়ে উঠেছেন:

But then the remnant of the Brahmins who seclude themselves from the communications of the busy world in a philosophic and religious retirement and strictly persue the tenets and true spirit of the Chartah Bhade of Bramah, we may with equal truth and justice pronounce, are the purest models of genuine piety that now exist or can be found on the face of the earth. অর্থাৎ—কিন্তু ব্রাহ্মণদের এক ছিটেফোঁটা অংশ এই ব্যস্ত পৃথিবীর কোলাহল পিছনে ফেলে দর্শন ও ধর্মের গভীরতায় সমাহিত থাকেন এবং নিষ্ঠাসহকারে চতুর্বেদ ব্রাহ্মণের মৌলতত্ত্ব ও মীমাংসা পালন করে চলেছেন, যাঁদের সম্বন্ধে আমরা সত্য ও ন্যায়তঃ ঘোষণা করতে পারি পৃথিবীর বুকে তাঁরাই হচ্ছেন ধর্মানুরাগের পবিত্রতম নিদর্শন।

মনে হয়, তাঁর দীর্ঘ ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতায়, জন জেফানিয়া হলওয়েল শুধু কলকাতার তিক্ততম মানুষগুলি দেখেননি সেই অবক্ষয়ের অন্তরালে বাঙালা তেঁতুলবটের কোলে বুনো রামনাথের মত মানুষগুলিকে বা ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মত কাউকেও দেখেছিলেন। দেখা পেয়েছিলেন, বাঙলা দেশের বুকে সেইসব ঋষিকল্প পণ্ডিত

মানুষদের যাঁরা কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ সরল দিনচর্যার মধ্য দিয়ে ইতস্ততঃ ছড়ান টোল, পাঠশালা ও চণ্ডীমণ্ডপে বসে নব নব চিন্তাধারায় বাঙলার দার্শনিক জীবনের ক্ষীণ লুপ্তপ্রায় ধারাটিকে তখনও প্রবাহিত করে নিয়ে চলেছিলেন।

আক্ষেপের কথা, সেই সব পণ্ডিতদের কোন পরিচয় নেই হলওয়েলের বৃত্তান্তে। না আছে সেইসব জ্ঞানতপস্বীদের কথা যাঁরা হলওয়েলকে ভারতবর্ষের এই স্মৃতি গ্রন্থের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, অঘোতরাবাদী শাস্ত্র (রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্বম্ ?) সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করে শুনিয়েছিলেন। তবে তাঁদের প্রভাব গ্রন্থের শেষ পর্যন্ত রয়েছে। কেননা শ্রীমতী ফ্যানী পার্কস যেমন 'শ্রীগণেশ'-কে 'সেলাম' 'সেলাম' বলে বন্দনা করে তাঁর গ্রন্থ শুরু করেছিলেন, হলওয়েল তেমনি তাঁর গ্রন্থের শেষে দেশী প্রথা অনুযায়ী কিছুক্ষণের জন্য অন্ততঃ কলম, কালি ও কাগজ বিদ্যাদায়িনী দেবী সরস্বতীকে অর্পণ করে গ্রন্থ সমাপন করেছেন—"And now, my friends, with your permission, adopt one custom of the Gentoos, and make an offering for sometime at least, of our pen, ink and paper to the goddess Sursuttee."

গজদন্ত মিনারের নিভৃত-নিকুঞ্জে বসে তথাকথিত ভারতবিদ্যাচর্চায় লিপ্ত ছিলেন না হলওয়েল। মনে হয়, রোদ-বৃষ্টি ঝড়-জল ধুলো-কাদা আলো-অন্ধকার বাঁশ আর হোগলা-বন ভনভনে ডাঁস আর গুনগুনে মশার মধ্যে বসে বাঙালা দেশের সঙ্গে শুভদৃষ্টি হয়েছিল তাঁর। এবং সে পরিচয় একদিন বুঝি বা প্রণয়ের আলোকে উদ্ভাসিত হয়েও উঠেছিল। তাই তাঁর সুবৃহৎ তিন খণ্ড গ্রন্থ—'ইনটারেস্টিং হিস্টোরিক্যাল ইভেন্টস'…এর পাতায় আচার-বিচার ষষ্ঠী-অরন্ধন পাল পার্বণের বাঙলার প্রতি শ্রদ্ধা বা ভালোবাসার অভাব হয়নি। অভাব হয়নি মমতার। আর তাই এর মধ্যে কলকাতার সকল কোলাহল কর্ম্ম-ব্যস্ততার অন্তরালে প্রবাহমান সেকালের বাঙালী সমাজের নিজস্ব শ্রীময়ী রূপটি এভাবে এমন প্রাণবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে।

[অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও উৎসাহী গবেষকদের সুবিধার জন্য নন্দরাম সেনের মূল জীবনীকাব্যটির প্রয়োজনীয় অংশ এখানে ছাপা হ'ল। পুস্তকের একটি খণ্ডিত কপি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে।]

[আখ্যাপত্র]

শ্রীনন্দরাম সেনের জীবনোপাখ্যান

তদ্বংশীয়

শ্রীজয়ন্তীচন্দ্র সেন দাস

বিরচিত।

সাকিন কলিকাতা সোভাবাজার।

এই পুস্তকের "কাপিরাইট্" আমি সহর কলিকাতা ভবানীপুর, ও হুগলী সাকিনের সর্ব সাধারণ যন্ত্রাধ্যক্ষগণকে বিনা মূল্যে প্রদান করিলাম, কেবল মুদ্রিত করণেচ্ছুকেরা আমাকে কিম্বা আমার উত্তরাধিকারীগণ শ্রীসরচ্চন্দ্র, শ্রীমন্মথচন্দ্র, শ্রীপ্রমথচন্দ্র ও শ্রীচলচ্চন্দ্র সেন দাস এহারদিগকে ২৫ পঁচিশ খানা পুস্তক পাঠাইবে।

কলিকাতা।

সুচারু যন্ত্রে, শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক বাহির মৃজাপুর ১৩ সঙ্খ্যক ভবনে মুদ্রিত হইল।*

সন ১২৭৩ সাল।

---

* এই ছাপাখানা থেকেই মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিখ্যাত 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'ও মুদ্রিত হয় ১৮৬১ সালে।

নির্ঘণ্ট পত্র

শ্রীনন্দরাম সেনের জীবনোপাখ্যান।

অথ সেনজীর কীর্ত্তির বর্ণনা ... ১
,, সেনজীর শিবাবলি ব্রতাদি এবং ভাটপাড়া গুরুলব্ধ ইত্যাদি ২
,, সেনজীর মাতার জল সংক্রান্তি ব্রত পালন মানসে দ্বাদশ সরোবর খনন ও স্বপ্নের মাহাত্ম্য ... ৩
,, এলোবারাশত ইত্যাদি অষ্টম জলাশয় ... ৬
,, সেনজীর পঞ্চ অবধৌতিক মুদ্রায় লক্ষ্মী পূজা বিবরণ ও একাদশ জলাশয় সম্পূর্ণ ... ৮
,, সেনজীর প্রতি ভগবতীর স্বপ্ন ও শনি হৈতে রক্ষা ৯
,, সেনজীর শনি প্রবেশ ১০
,, সেনজীর বাটীতে লক্ষ্মীর আগমন ও স্থিতি ... ১১
,, সেনজীর সোভাবাজার বাটী পরিত্যাগ ... ১২
,, সেনজীর বাটীতে দস্যুর আক্রমণ ও মহাদেবের মাহাত্ম্য প্রকাশ ... ১২
,, সেনজীর হিজলি মোকামে অবস্থিতি ও মাতার ব্রতপালন দ্বাদশ জলাশয় খনন ... ১৪
,, সেনজীর হিজলী বাটী পরিত্যাগ ও সোভাবাজারে পুনরাগমন ... ১৪
,, সেনজীর মাতার ব্রতপালনে দ্বাদশ পুষ্করণী উৎসর্গ ও রথ প্রতিষ্ঠা ও ব্রাহ্মণকে ভূমি বাটী দান ... ১৬
,, সেনজীর পিতৃ দৌহিত্র ও চারিকন্যার বিবরণ ... ১৭
,, সেনজীকে ব্রহ্মশাপ ও তদ্বংশে তাহার ফল ... ১৮

,, মহাদেবের মন্দিরে অবস্থিতি ও মোহন্তর আদেশে ও
কর্ম্মের প্রমাণ ... ১৯
,, সেনজীর প্রতি সত্যনারায়ণের ফকিরের শাপ এবং তাঁহার ও
তদ্বংশের উপর শাপের ক্রমশঃ ফল প্রাপ্ত ... ২১
,, সেনজীর হস্ত হইতে পঞ্চমুদ্রার অন্তর্ধান ও তদপঞ্চম
পুরুষে পঞ্চম মুদ্রা মাত্র প্রাপ্ত ... ২২
,, সেনজীর ভবনে লক্ষ্মীর পুনরাগমন, তাঁহার পুত্রশোক ও
পরলোক যাত্রা ... ২৫

—

"শ্রীনন্দরাম সেনের জীবনোপাখ্যান

পয়ার

প্রসিদ্ধ সকলে জ্ঞাত কলিকাতা ধাম। শোভাবাজারের কুল সেন বংশ নাম॥ দীর্ঘ গঙ্গা নামে স্থান সেন কুলোদ্ভব। তদ্‌পূর্বের বার্ত্তা জানা নাহিক সম্ভব॥ সুতানুটি গোবিন্দাদি পুর বলি খ্যাত। এবে কলিকাতা যথা সেস্থান বিখ্যাত॥ ইংলণ্ডীয় অধিকার বহু পূর্ব কথা। প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছি যথা॥ সুতানুটি পরগণার স্থিত মধ্য স্থান। বলিয়া এখন শোভাবাজার বাখান॥ এলেন পুরুষ মহা দীর্ঘ গঙ্গা হৈতে। জঙ্গল কাটিয়া বাস এখানে করিতে॥ মুরশিদাবাদে কর্ম্ম করিতেন তিনি। শুনিয়াছি লোক মুখে স্থির নাহি জানি॥ ধনেতে কুবের তুল্য ধর্ম্মে যুধিষ্টির। দ্বিজ পরায়ন অতি বুদ্ধিতে সুধীর॥ দেওয়ান বালয়া খ্যাত সেন নন্দরাম। আদি পুরুষের মন জান এই নাম॥ আবার জঙ্গ বুরি করেন এখানে। কত কীর্ত্তি করিলেন বহুবিধ স্থানে॥ আমি বা লিখিব কত সকল না জানি। স্থানে ২ চিহ্ন দেখে ধন্য বলে মানি॥ জয়ন্তী করিছে তাঁর কীর্ত্তির বর্ণন। মনযোগ শুন যার ধর্মে থাকে মন॥"

"অথ সেনজীর কীর্ত্তির বর্ণন

প্রায় অর্ধ শোভাবাজারের দিব্য স্থান। পট্টক করিয়া লন তিনি বুদ্ধিমান॥ মধ্যে পথ রাখি পুরী প্রকাশ পাইল। হাল নন্দরাম সেন ইষ্ট্রিট হইল॥ বৃহৎ দেবায়তন সর্ব্ব সম্মুখেতে। রামেশ্বর লিঙ্গ হয় স্থাপন তাহাতে॥ অপূর্ব্ব মন্দির অদ্য তক সম ভাবে। কিছুই বিনষ্ট

নাহি অপূর্ব্ব প্রভাবে ॥ বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইল সেই দেবায়তন।১ অদ্যকালাবধি ইহা লোকেতে বর্ণন ॥ তৎপরে নিম্মিত হয় দিব্য বিপ্রবাটী। সর্ব্বদেব অভিষিক্ত তথা পরিপাটী ॥ (পৃষ্ঠা ২)

তদুপরে গঙ্গাতীরে ঘাটের নির্ম্মাণ। হাটখোলা গোলাবাটী তাহার বাখান ॥ শিবাবলি বাটী পরে করেন মহান। সর্ব্বান্তে বসত বাটী দীর্ঘল প্রমাণ ॥ সপ্তবিঘা ভূমি মধ্যে বাস্তু অট্টালিকা। বিভিন্ন আবাস স্থানে২ প্রকাশিকা ॥ গুরু পুরোহিত স্থান নাহি কিছু ভ্রম। অশ্বশালা হয় মাত্র গাভির আশ্রম ॥ শোভাবাজারেরবাসি জয়ন্তী চন্দ্র সেনে। পূর্বপুরুষের কীর্ত্তি পয়ারেতে ভণে ॥"

"অথ সেনজীর শিবাবলি ব্রতাদি এবং ভাটপাড়া গুরু লক্ষ ইত্যাদি।

নিত্য সেবা স্থির হয় সকল দেবের। শিবাবলি ব্রত হয় সঞ্চার পুণ্যের ॥
পাচক ব্রাহ্মণ নিত্য করিত রন্ধন। অন্ন পরমান্ন আর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ॥
নিত্য নিত্য নব পাত্রে রন্ধন হইত। নব সুর্প সাজাইয়া প্রত্যহ রাখিত ॥
সন্ধ্যা পরে লক্ষ২ শিবা উপস্থিত। প্রত্যেকেতে আলাহিদা খায় পরিমিত ॥
সর্ব্ব রাত্রি বাটীমধ্যে থাকিত শুইয়া। প্রাতেতে মঙ্গলধ্বনি সকলে করিয়া ॥
অরণ্যে যাইত চলি দিবা আগমনে। পুনঃসন্ধ্যাকালে পৌঁছে খাইতে সেখানে ॥

---

১ এই মন্দিরটি সম্বন্ধেই ডেভিড্ ম্যাক্‌কাচন তাঁর 'টেম্পলস্ অফ ক্যালকাটা' প্রবন্ধে বলেছেন—'Another large *at-chala* temple is that of Rameshwer Shib at No, 51 Nandaram Street, off the Chitpur Road...The temple measures 37½ by 31 feet, and enshrines a massive *lingam* some five feet high ; সাহেব আরও বলেছেন মন্দিরের পুরণো ফলকে নির্মাণ তারিখ ১৮৫৪ সাল। নূতনে ১৬৫৪ (?)।

এইরূপ নিত্য হয় শিবাবলি ব্রত। কিবা ধর্ম্ম ছিল তাঁর কহিব বা কত ॥
গাভিশালা যাইতেন প্রত্যহ আপনি। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন দেব স্থান যিনি[২] ॥
শর্করা পানীয় করে গাভীগণ পান। সেবক গাভীর কাছে সদা বর্ত্তমান ॥
শিব বিগ্র যত দেব নিত্য সেবা হয়। আপনি থাকেন নিত্য সেসব আলয় ॥
নিত্য সেবা পরে হয় ব্রাহ্মণ ভোজন। ততপরে হইত অন্তঃপুরেতে গমন ॥
ছিলেন জননী তাঁর বৃদ্ধা অতিশয়। যেন অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি সব ধর্ম্মময় ॥
মাতার পাদক জল করিতেন পান। আপন আহার পরে করেন মহান্ ॥
কর্ম্মগুণে ধর্ম্ম যদি হইল প্রমাণ। নাম ধাম পুণ্য যশ ঘোষে স্থানে স্থান ॥
ভাটপাড়া দেবতুল্য গুরুর বাখান। ধর্ম্ম ভক্তি শুনি তিনি আসি অধিষ্ঠান ॥
বিশ্বত্রাতা জন্য নাম বিশ্বনাথ তাঁর। তর্কের বাগীশ তাহে নামে অলঙ্কার ॥
প্রথমে পরীক্ষা করি ধর্ম্মে পুণ্যে মতি। প্রসন্ন হইয়া মন্ত্র দেন মহামতি ॥
ভাটপাড়া দেবগণে শুদ্র শিষ্য নাই। ভক্তি দেখি বিচলিত হলেন গোঁসাই ॥
ত্যজিতে এমত ভক্ত নাহি স্মরে মন। তাহে সে পুরুষ মহা বন্দেন চরণ ॥ (পৃষ্ঠা ৩)
প্রসন্ন হইয়া তবে শিষ্য কন তাঁরে। আশীর্ব্বাদ নিস্মরিল মুখেতে সত্বরে ॥
চিরবধি তব পুণ্য ঘুষিবে সংসারে। নির্ণাম নাহিক হবে জগত ভিতরে ॥
ধর্ম্মের সংসার তব প্রকৃত হইবে। তব বংশে অধর্ম্মের বৃদ্ধি না রহিবে ॥
দুষ্কর্ম্মি পাপি যে হবে তোমার বংশেতে। শিঘ্র তার বংশলোপ হইবে কালেতে ॥
ইথে কিছু মনদুঃখ কভু না করিবে। পাপিরে রাখিলে বৃদ্ধি পাপের হইবে ॥

২ যিনি—জিনি (জয় করিয়া)

তাহাতে পুণ্যের বংশ খ্যাত নাহি হয়। পাপি যত শিগ্র ক্ষয় উত্তম নিশ্চয় ॥

শুনিয়া গুরুর কথা ভাবিত অন্তর। কৃতাঞ্জলি পুটে জিজ্ঞাসিলেন সত্বর ॥

কহিলেন বংশে মম পাপ স্পর্শ হৈলে। অবশ্য হইবে তার বংশ লোপ কালে ॥

কিন্তুএক কথা এবে করি নিবেদন। ক্রমে কলি বৃদ্ধি হয় জানে সর্ব্বজন ॥

পাপে মুগ্ধ প্রায় হৈবে যত জন্মে নর। গুরুদেব হৈবে কিসে বংশ রক্ষা মোর ॥

পাপকর্ম্মে দেব যদি বংশ নাশ পায়। নির্ণাম হইব আমি কি হবে উপায় ॥

সন্তুষ্ট হলেন গুরু শুনিয়া বচন। আশ্বাস দিলেন তাঁরে সহাস্য বদন ॥

আশীষ করিনু এবে ওহে নন্দরাম। কোন কালে তুমি নাহি হইবে নির্ণাম ॥

ক্ষণমাত্র ধর্ম্মলোপ তোমার সংসারে। কভু নাহি হৈবেক ইহা জানিহ অন্তরে ॥

সর্ব্বকালে কোন জন ধর্ম্মে কর্ম্মে রত। জন্মিবে তোমার বংশে জানিহ নিশ্চিত ॥ সেনজী আশীষ লব্ধে জয়ন্তীর মন। গুরু ধ্যান গুরু জ্ঞান গুরু আকিঞ্চন ॥”

“অথ সেনজীর মাতার জলসংক্রান্তি ব্রত পালন মানসে দ্বাদশ সরোবর খনন ও স্বপ্নের মাহাত্ম্য।

অপর শুনহ বার্ত্তা ধর্ম্মনিষ্ঠ জন। পুণ্য মাহা বৈশাখের দিন আগমন ॥

বৃদ্ধমাতা মন ইচ্ছা ব্রতের পালন। জলসংক্রান্তির ব্রত জানে সাধারণ ॥

সেই দিনাবধি গণ্য এক বর্ষ রয়। ব্রতের পালন করা হইল নিশ্চয় ॥

মাতা পুত্রে হইলেক কথোপকথন। আবশ্যক দ্রব্য আদি লিখেন তখন ॥

হইবে দ্বাদশ কুম্ভ বারী পূর্ণ দান। যে রূপ হইবে কুম্ভ শাস্ত্রের প্রমাণ।
এইমাত্র জানে সবে ব্রতের বিধান। স্বর্ণ রূপ্য পিত্তল কি মৃত্তিকা গঠন॥
মাতা কন শুন পুত্র হইবে দিবারে। ধাতু কি মৃত্তিকা কুম্ভ ক্ষমতা বিচারে॥
মাতৃ কথা শুনি যান বাহির মণ্ডল। ডাকি পুরোহিত সভ্য দ্বিজ যে সকল॥ (পৃষ্ঠা ৪)
জিজ্ঞাসা করেন তবে সেন মহাশয়। ধাতু কুম্ভ হৈতে শ্রেষ্ঠ দান কিবা হয়
ব্রাহ্মণ মণ্ডলী শুনি চমৎকৃত হন। স্বর্ণকুম্ভ হৈতে শ্রেষ্ঠ দানে দেখি মন॥
কেহ হেন প্রশ্ন কোন কালে নাহি কয়। বৃথা তত্ত্ব জিজ্ঞাসেন সেন মহাশয়॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁরা দিলেন উত্তর। দ্বাদশ কুম্ভের দান করিনু গোচর॥
স্বর্ণ কুম্ভ হৈতে শ্রেষ্ঠ যদি হে মনন। পুষ্করিণী কিম্বা কূপ করাহ খনন॥
জানিহ দ্বাদশ তাহা হৈবে গণনায়। স্থানে স্থানে জল কষ্ট হইবে যথায়॥
বাছিয়া বাছিয়া স্থান হৈবে নিরুপিত। তবেসে পালন ব্রত হয় যথোচিত॥
শুনিয়া চিন্তিত অতি পুরুষ প্রধান। একবর্ষ কালমাত্র মধ্যে ব্যবধান॥
এত পুষ্করিণী শিঘ্র হইবে কেমনে। একস্থানে নহে পুনঃ হৈবে স্থানে ২॥
জল কষ্ট বিনা স্থান হইবার নয়। মাতার উৎসর্গ জন্য যাইবারে হয়॥
পুষ্করিণী হৈবে সব দূর দেশান্তরে। ব্রতাদনে কি রূপেতে পারে হইবারে॥
ব্রতের পালনে উৎসর্গ এককালে। সর্ব্ব জলাশয় হৈবে বিধিমতে বলে॥
বিষম সমস্যা শুনি হৃদয়ে চিন্তিয়া। সে মহাপুরুষ তবে নির্জ্জনে বসিয়া॥
ছাড়েন আহার নিদ্রা চিন্তেন উপায়। কেবল গুরুর ধ্যান বসিয়া তথায়॥
সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধ হয় গুরু সেবা বলে। ভক্ত বিনা গুরু মর্ম্ম না জানে সকলে॥

তিন দিন তিন রাত্রি বসি যোগাসনে। কিরূপে কামনা পূর্ণ ধ্যান চিন্তামনে ॥
বসি বসি নিদ্রা যান সেই চিন্তা সার। পশ্চাৎ হইল তাঁর চিন্তার উদ্ধার ॥
জপ স্থান নিশিযোগে পূর্ণ গুরুময়। আপনা আপনি হন প্রফুল্ল হৃদয় ॥
আরো হয় সুঘটনা অল্প নিদ্রাকালে। স্বপনে দেখেন যেন কেহ তাঁরে বলে ॥
অভীষ্ঠ ঠাকুর রূপ সম্মুখে বসিয়া। আরম্ভ করেন কথা বহু আশ্বাসিয়া ॥
উদযোগ করহ পুণ্য কর্ম্ম একভাবে। সময়ে ইচ্ছানুরূপ সম্পূর্ণ হইবে ॥
এককালে সর্ব্ব সরোবরের উৎসর্গে। চিন্তা কি করহ তাহা কর মন সুখে ॥
এক কিম্বা দুই কর দীর্ঘ সরোবর। দেবের প্রতিষ্ঠা তটে করিয়া সত্বর ॥
সর্ব্ব সরোবর জল আনি এক স্থান। উৎসর্গ সলিল সর্ব্ব একত্রে প্রমাণ ॥
এক দীর্ঘ সরোবর তটেতে বসিয়া। যথা পূর্ব্বে দেবস্থিত আছেত হইয়া ॥
ব্রত দিনে জলদান করাও সেখানে। সময় পাইলে যাত্রা যাবে অন্যস্থানে ॥
এইরূপে ব্রতকাল মধ্যে যত হয়। করুন উৎসর্গ যত পারেন নিশ্চয় ॥
ব্রতের পালন ইথে সম্পূর্ণ হইবে। পশ্চাৎ সময়ে যাত্রা তাঁরে করাইবে ॥
(পৃষ্ঠা ৫)

সর্ব্ব পুষ্করিণী তটে গিয়া অতঃপরে। প্রত্যেক উৎসর্গ হবে কত দিনান্তরে ॥
এই যে নিয়ম শুনি স্থির করি মন। আরম্ভ করহ এবে উদ্যোগ খনন ॥
বর্ষ মধ্যে মনোভীষ্ট সফল হইবে। সর্ব্ব পুষ্করিণী সাঙ্গ হইতে পারিবে ॥
স্বপ্ন দেখি মহানন্দ হলেন মনেতে। সত্যধর্ম ফল দৃষ্ট এ কলি যুগেতে ॥
শিক্ষা লই সর্ব্ব নর ছল কর বৃথা। কলিযুগে ধর্ম্ম নাই পামরের কথা ॥
সর্ব্বকালে ধার্ম্মিকের হইবেক জয়। পরীক্ষা কারক মাত্র কলি মহাশয় ॥
(পৃষ্ঠা ৬)

* * * *

কিঞ্চিৎ কহিনু কলি ধর্ম্ম বিবরণ। সেনজীর কথা কহি করহ শ্রবণ ॥
গুরুর প্রসাদে মনে সন্তোষ জন্মিলা। পর্য্যটন যাত্রা জন্য উদ্‌যোগ হইলা ॥
মহা পুণ্য সেনজীর প্রচার জগতে। জয়ন্তী কিঞ্চিৎ বর্ণে রচি পয়ারেতে ॥

"অথ এলোবারাশত ইত্যাদি অষ্টম জলাশয়।

প্রথমে বন্দিয়া মাতার চরণ। জলকষ্ট স্থান করিবারে অন্বেষণ॥

গাড়ি ঘোড়া নাহি ছিল ডুলি মাত্র সার। বহিত ধনাঢ্য লোকে দেশস্থ কাহার॥ বহুবিধ লোক সঙ্গে হলেন বাহির। উত্তর দিকেতে যান সুবুদ্ধি সুধীর॥

যাইতে যাইতে পৌছিলেন সেই স্থান। এলো বারাশত বলি যাহার বাখান॥

ঘর বাটী তথা কিছু না ছিল প্রকাশ। নাহি দেখিলেন কোন মনুষ্যের বাস॥

দুইটি স্ত্রীলোক তথা যাইছে পথেতে। কোন্দল করয়ে দোঁহে কলসি কক্ষেতে॥

একজন কহে অন্যে জানিলাম তোরে। অবিশ্বাসী হৈলি তুই নিজ ব্যবহারে॥

বারি জন্য যবে তুই হইলি সংশয়। মম কাছে বিংশ মালা তোর ঋণ হয়॥

মাহার অধিক হৈল কিছু না ভাবিলি। অদ্যাবধি মম বারি ফিরায়ে না দিলি॥

সঙ্কটে পড়িল ঋণি অন্য ছিল বলি। আঘাত করিতে আইসে দেয় গালাগালি॥

ডুলি হৈতে নামিলেন সেন মহাশয়। কোন্দল কারণ শুনি মনেতে বিস্ময়॥

জিজ্ঞাসেন মিষ্ট ভাষে তিনি উভয়েরে। হেন অকৌশল কেন অল্পবারি তরে॥

কহিতে লাগিল তাঁরে যেই দিল ধার। দীন যে দরিদ্র মোরা নির্ব্বাহি সংসার॥

আমাদের জলকষ্ট হয়েছে প্রচুর। জলাশয় বাস হৈতে হয় বহুদূর॥

এক দুই দিনান্তরে বাহির হইয়া। কুম্ভে জল মোরা রাখি ঘরেতে আনিয়া॥

শরীর পটুতা ভিন্ন আনা নাহি হয়। মোদের বিষম হয় জলের সঞ্চয়॥
এমত অনেক দিন ঘটনা উদয়। বিংশমালা জলে বহু প্রাণ রক্ষা পায়॥
শুনিয়া এ স্ত্রীলোক মুখে আশ্চর্য্য ভারতী। জলকষ্ট স্থান পেয়ে হৃষ্ট মহামতি॥
তথা হৈতে গ্রাম দেখি অনেক অন্তর। সে মহাপুরুষ যান তাহার ভিতর॥

(পৃষ্ঠা ৭)

ব্রাহ্মণ মণ্ডলী বহু সঙ্গেতে লইয়া। পুনঃ সেই কোন্দলের স্থানেতে পৌঁছিয়া॥
মধ্যপিত স্থান সেই জানিয়া প্রমাণ। সুস্থির হইল সেই জলাশয় স্থান॥
পত্র লিখিলেন তবে বর্ধমান ভূপে। পেলেন ভূমির পাট্টা যথা বিধিরূপে॥
তথা বহু ভূমি যদি হইল আয়ত্ত্ব। আপন অভীষ্ট কর্ম্মে হলেন প্রবৃত্ত॥
অবস্থান হয় তথা পরম আহ্লাদ। কিয়দংশ সেই ভূমি করেন আবাদ॥
বহুবিধ দ্বিজগণ পরিবার সনে। আপন ব্যয়েতে বাস করান সেখানে॥
রোপেন অশ্বত্থ বৃক্ষ যথা প্রকরণ। প্রতিষ্ঠা তাহার তলে দেব পঞ্চানন॥
আবাস করিয়া স্থির নিত্য যে পূজার। পালামতে দ্বিজে দিয়া পূজনের ভার॥
পঞ্চানন সমুখেতে হয় পুষ্করিণী। দীর্ঘল প্রমাণ লোকে বারিপ্রদায়িণী॥
হইল বাইশ বিঘা জলকর স্থান। তার যোগ্য পাড় হয় বুঝহ প্রমাণ॥
ভগ্নাবস্থা পুষ্করিণী আছে বর্ত্তমান। সেন পুষ্করিণি বলি খ্যাত সেই স্থান॥
ব্রাহ্মণ মণ্ডলী জিম্মা কার জলাশয়। পর্য্যটনে যান পুনঃ সেন মহাশয়॥
জলকষ্ট মাত্র স্থান তাঁর অন্বেষণ। ঈশ্বর পৌঁছান তাঁরে যথা ছিল মন॥
এলো বারাশত হৈতে পূর্বোত্তর কোণে। উপস্থিত হইলেন সাইমানা স্থানে॥
বহু জল কষ্ট তথা সকলে কহিল। দীর্ঘ জলাশয় তথা খনন হইল॥

---

৩ বারতা—খবর।

হইল চব্বিষ বিঘা তার জলকর। পাহাড়[৪] তাহার উচ্চ বিস্তীর্ণ বিস্তার॥ অদ্যাবধি ত্বরাবস্থা তাহা বর্ত্তমান। কলসিভাঙ্গা পুষ্করিণী তাহার বাখান॥ বড় বড় মৎস সেই জলাশয়ে আছে। কলসি ডুবায় যদি সলিলের মাঝে॥ ঝাপটা মারিয়া মৎস কলসি ভাঙ্গয়। বারি জন্য জায় যারা মনেতে বিস্ময়॥ আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটে জলাশয়কূলে। তাহে না নামিয়া জল নালাকাটি তোলে॥ অন্য চারি জলাশয় না পাই উদ্দেশ। কোথায় খনন হয় নাহি জানি দেশ॥ দীর্ঘ গঙ্গা কুলোদ্ভব স্থানে উপস্থিত। সপ্ত জলাশয় হয় যেরূপ বিহিত॥ সেনজী পৌছেন গিয়া গোপাল নগর। অষ্টম পুষ্কর্ণি তথা হয় বৃহত্তর॥ ব্রাহ্মণ মণ্ডলী বাস মহারম্য স্থান। অষ্ট জলাশয় তথা অপূর্ব্ব বাখান॥ গোপাল নগর ধাম সকলে জানিত। সেনজীর পুরোহিত বাসগ্রাম খ্যাত॥

হইল স্ত্রীলোক দ্বারা উৎসর্গ নিশ্চিত। সেন বধূ পুষ্করিণী বলিয়া বিদিত॥ অষ্টম পুষ্কর্ণি হয় শুদ্ধ জলাশয়। শ্রবণ হয়েছে যথা জয়ন্তীচন্দ্র কয়॥"

(পৃষ্ঠা ৮)

"অথ সেনজীর পঞ্চ অবধৌতিক মুদ্রায় লক্ষ্মী পূজা বিবরণ ও একাদশ জলায় সম্পূর্ণ

যখন অষ্টম বারি ধারিণী হইল। গ্রাহস্থিক লক্ষ্মী পূজা মনেতে পড়িল॥
ভাদ্রমাহা সন্নিকট হয় উপস্থিত। বাটীতে পৌছেন তিনি অতি ত্বরান্বিত॥
দৈব প্রাপ্য লক্ষ্মী ছিল অপূর্ব্ব মোহর। গণনায় পঞ্চমুদ্রা কৌটার ভিতর॥

পঞ্চ যে ভৌতিক আত্মা সে পাঁচ স্বরূপ। জীবন সংহার নাহি বড় অপরূপ॥ যেই ব্যক্তি এই পঞ্চ লভিতে পারিল। শমণ ভবন সেই নিশ্চিত ত্যজিল॥

৪ পাহাড়—পার—তীর

হেন পঞ্চ রত্ন পান সেন নন্দরাম। ধর্ম্মের আধার তাঁর চরণে প্রণাম॥
সাধারণ পুণ্য নহে এরত্ন লভিতে। সর্ব্বদা রাখেন তাহা আহ্নিক ঘরেতে॥
দেয়াল ঘরের সেই অদ্যাবধি আছে। এক পার্শ্বে পুরাতন বাটীতে রহিছে॥
কলিতে এ মহারত্ন যারে অধিষ্ঠান। নির্ণাম নাহিক হয় নাম বর্ত্তমান॥
অচল ঐশ্বর্য্য থাকে পরম ভাগ্যেতে। বংশ তাঁর সদাকাল থাকয়ে সুখেতে॥
পঞ্চ অবধৌতিক মুদ্রা এরূপ গঠন। ভিন্ন ভিন্ন কালে অবতার নারায়ণ॥
তাঁহার প্রত্যেক মূর্ত্তি প্রত্যেক মুদ্রাতে। দেখিবে সকলে তার একই পৃষ্ঠাতে॥
মৎস কূর্ম্ম জান সবে নৃসিংহ বরাহ। রামচন্দ্র এই পঞ্চ অবতার দেহ॥
অন্য পৃষ্ঠে মুদ্রাঙ্কিত থাকেসে মুদ্রার। প্রথম চারিতে মাত্র মায়ার আকার॥
পঞ্চমেতে দৃষ্টি হৈবে মানব দেহেতে। প্রকাশ লক্ষ্মীর রূপে সীতা আকারেতে॥
আদ্য চারি অবতার যোগতত্ত্বজ্ঞান। সাধারণে বুঝে কিসে সকলি অজ্ঞান॥
এই জন্য নারায়ন রামরূপ ধরে। প্রকাশ সংসারে হয়ে মানব আকারে॥
লক্ষ্মীসহ ভূমণ্ডলে হন অবতার। জনক রাজার কন্যা সীতার প্রচার॥
আত্ম বিস্মরণ হয়ে মানবের মত। মানবের সঙ্গে হয়ে জগতে মিশ্রিত॥
সময়েং কর্ম্ম ধর্ম্ম দেখাইয়া। তাহাতে বিশ্বাস মনে সবে জন্মাইয়া॥
শ্রীসীতা নবমী ব্রত আদ্য লক্ষ্মী পূজা। প্রচার হইল নরে পূজে সর্ব্ব প্রজা॥
মাহাত্ম্য লক্ষ্মীর পূজা কাহমু কিঞ্চিৎ। সর্ব্ব ঘরে প্রথা আছে নহে অবিদিত॥

ভাদ্রমাসে লক্ষ্মী পূজা হয় সমাপন। চারি জলাশয় বাকি করিতে খনন ॥
বিবেচিয়া মন মধ্যে করেন সুস্থির। নিজ পুরে হৈল নহে যুক্তির বাহির ॥
ব্রাহ্মণের ব্যবহার হৈলে জলাশয়। শাস্ত্রবৎ হইবেক অবশ্য নিশ্চয় ॥

(পৃষ্ঠা ৯)

শিবস্থান মন্দিরের দক্ষিণ দিকেতে। বিপ্র বাটী পূর্ব্বে অংশে বহু অদূরেতে ॥
রাশলীলা জন্য বিপ্র দেবের কারন। তথায় হইল নব পুষ্করিণী খনন ॥
শিবাবলি বাটী মধ্যে দশ জলাশয়। উত্তর পশ্চিম কোণে একাদশ হয় ॥
তাঁহার পুণ্যের কথা বর্ণিতে অপার। জয়ন্তী প্রকাশ করে ভণিয়া পয়ার ॥”

“অথ সেনজীর প্রতি ভগবতীর স্বপ্ন ও শনি হৈতে রক্ষা।

একাদশ হৈল তবে একমাত্র রয়। শারদীয় পূজা কাল উপস্থিত হয় ॥
চঞ্চলা যে লক্ষ্মীমাতা শাস্ত্রে যানা যায়। ধার্ম্মিকে দেখান ত্রাস ধর্ম্ম পরীক্ষায় ॥
পতিত শনির গ্রহ উক্ত মহা সেনে। কত অমঙ্গল ঘটে শুন সর্ব্ব জনে ॥
বাকী এক পুষ্করিণী মাত্র কাটিবারে। শনির মায়াতে পূর্ণ নারে হইবারে ॥
বহু বিভীষিকা দেখি সকলে সংশয়। সে পুরুষে স্থিত তবু স্থির বুদ্ধিময় ॥
শারদীয় পূজা কালে প্রতিমা হইল। ত্রিচূড়া শোভিত উর্দ্ধে প্রকাশ রহিল ॥
ষষ্ঠী কল্প প্রতিমার হইল যে দিনে। সে রাত্রি পুরুষ মহা দেখেন স্বপনে ॥

ভগবতী অধিষ্ঠান তাঁর শিরোপরে। বাৎসল্য ভাবেতে কথা কহেন তাঁহারে ॥

হইল শনির কোপ হও সাবধান। ত্রুটিলেশ[৫] হৈলে শনি হৈবে অধিষ্ঠান ॥

প্রতিমা দেখিতে আসিবেক যত জন। পূজার মণ্ডল দেখি বড় সুশোভন ॥

প্রতিমা দেখিতে মন না হবে কাহার। পূজা বাটী দেখিবেক অতি চমৎকার ॥

এই ছিদ্রে শনি কোপে আশঙ্ক্যা পড়িতে। উচিত হইল তব সাবধান হৈতে ॥

সে মহাপুরুষ তবে জাগিয়া উঠিয়া। বৃহৎ পূজার বাটী বস্ত্রেতে ঘেরিয়া ॥

সর্ব্ব সুশোভন করিলেন আচছাদন। দেবী প্রতিমূর্ত্তি মাত্র রহে সন্দর্শন ॥

বুদ্ধির কৌশল তাঁর কহিব বা কত। জয়ন্তী বর্ণন করে যথা সাধ্যমত ॥"

(পৃষ্ঠা ১০)

"অথ সেনজীর শনির প্রবেশ।

হইল সপ্তমী পূজা যথা বিধিমতে। বলির ব্যাঘাত্ ঘটে শনির খেলাতে ॥

মসিবর্ণ ছাগ ছিল বলির কারণ। শনির আবাস দিব্য জানে সর্ব্ব জন ॥

ছিদ্র প্রত্যক্ষেন মাত্র শনি মহাশয়। পাইলে আপন লীলা পূর্ণ সমুদয় ॥

উৎসর্গ করিল ছাগ বলি দিবা তবে। দৈবাৎ সেনজী যান ভিতর মন্দিরে ॥

খর্পরের পাত্র কেহ তথা ন আনিল। এই ক্ষুদ্র ভ্রমমাত্র সকলে ঘটিল ॥

৫ ত্রুটিলেশ—সামান্য একটু অপরাধ

শনির আবিষ্ট হয়ে সে ছাগ রূপেতে। দৌড়িয়া পৌছিল সেনজীর নিকটেতে ॥

কাঁপিতেং তাঁর ক্রোড়েতে উঠিল। প্রাণীহত্যা পাপ জ্ঞানে দয়া উপজিল ॥

যতনে সেনজী তারে রাখিয়া ক্রোড়েতে। আজ্ঞা দেন সেবকেরে তাহারে পোষিতে ॥

প্রাণি বলি দান ক্ষান্ত হয় তদবধি। পূজায় ফলের বলি হয় নিরবধি ॥

শনি যে আবিষ্ট ছিল সেই সে দেহেতে। সেনজীর কিছু জ্ঞান না উঠে মনেতে ॥

পরম সাদরে শনি রহে আবাসেতে। হানি না করিতে পারে তাঁহার ধর্ম্মেতে ॥

শনির মাহাত্ম্য কভু নাহি হয় আন। অবশ্য অস্থির করেন শাস্ত্রের প্রমাণ ॥

বহু ক্লেশ নাহি দেন যাহারে সদয়। বহু দুঃখ দত্তাবটে হইলে নির্দ্দয় ॥

এতাবৎ কথা শুনি উঠে সম্ভাবনা। শাক্ত কি বৈষ্ণব তিনি তাহার ভাবনা ॥

শিবাবলি ব্রত ছিল আর বলিদান। সেনজী ছিলেন শাক্ত ইহাতে প্রমাণ ॥

বিগ্রাদির রাশলীলা হইত বাটীতে। তজ্জন্য বৈষ্ণব বোধে কহে অনেকেতে ॥

ফলত ছিলেন তিনি শাক্ত যে প্রধান। যথার্থ এবাক্য বটে তাহে নাহি আন ॥

শাক্তের বাটীতে বিগ্র স্থাপন রহিবে। শাস্ত্র ভিন্ন যুক্তি নহে সকলে জানিবে ॥

কালীমন্ত্রে উপাসক তিনি পুণ্যশালী। অদ্যাবধি বংশাবলি সেরূপ প্রণালি ॥

অল্পেং রবিসুত আরম্ভেন হানি। অদ্ভুত শনির লীলা অপূর্ব্ব বাখানি ॥

গাভীগণ হাম্বারব ছাড়ে গাভীশালে। আহারেতে তৃপ্ত নয় বিপাক কপালে ॥

সে মহা পুরুষ ক্রমে হন বন্ধু-হীন। ব্যাঘাৎ সকল কর্ম্মে বুঝেন প্রবীন ॥

বিপদ ঘটনা চিহ্ন দেখেন স্বপনে। কম্পে কলেবর সদা ত্রাস উঠে মনে ॥

অল্পদিন এই রূপ ভাবেতে কাটিল। শুনহ শনির কর্ম্ম কিরূপ ঘটিল ॥

সম্পত্তি বিনাশ আর ধন হৈবে ক্ষয়। সঙ্কটে ফেলেন তাঁরে শনি মহাশয় ॥ [পৃষ্ঠা-১১]

কোথা হৈতে মহারাষ্ট্র জাতীয় বিশেষ। দোর্দণ্ড প্রতাপশালী বাস পূর্ব্ব দেশ ॥

দঙ্গল বাঁধিয়া এক অধ্যক্ষ লইয়া। লুট করে দেশে দেশে বেড়ায় ভ্রমিয়া ॥

আসি উপস্থিত হয় গোবিন্দপুরেতে। তন্নিকটে সুতানুটি পারিল জানিতে ॥

বড় অট্টালিকা তথা বড় দেবায়তন। শুনিল তথায় বাস মনুষ্য প্রধান ॥

শক্তি স্থির করে তারা দিন চারি পরে। আক্রমণ লুট করি নন্দরাম পুরে ॥

দেশেতে ধনাঢ্য কেহ না ছিল তখন। রক্ষা হইবেন কিসে সংশয় জীবন ॥

চারি পুত্র সহ নিজে কম্পবান্ কায়। ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু না পান উপায় ॥

আত্ম আর পরিবার প্রাণ রক্ষা সার। সম্পত্তি ধনের রক্ষা না করি বিচার ॥

বিপদ আশঙ্কা হয় নিকটে থাকিতে। আপন বংশের প্রাণ সংশয় জ্ঞানেতে ॥

কিম্মতীয়[৬] দ্রব্য যাহা বৃহৎ আকার। বাটীতে প্রোথীত রাখা করেন বিচার॥

স্বর্ণ রূপ্য মুদ্রা আদি যত অলঙ্কার। সঙ্গেতে লয়েন সবে যে ছিল যাহার॥

সুতানুটি গ্রামবাসী আর যত জনে। পলাইয়া গেছে সবে দস্যু আগমনে॥

খনন করিয়া বাটী সর্ব্ব স্থানে স্থান। দ্রব্যাদি প্রোথীত রাখিছেন পুণ্যবান্॥

হেনকালে হয় এক অপূর্ব্ব ঘটনা। জয়ন্তী বর্ণন করে শুন পুণ্যজনা॥"

"অথ সেনজীর বাটীতে লক্ষ্মীর আগমন ও স্থিতি

এক বৃদ্ধা উপস্থিত বাটীর ভিতর। দেখিয়া স্ত্রীলোক বর্গ সভয় অন্তর॥

যষ্টি হাতে শিরে ভেবু অঙ্গে পাকা বেশ। পরিচছন্ন দেবরূপা জাত শুভ্রবেশ॥

সেনজী দ্বারিরে কন ক্রোধিত অন্তরে। কেমনে আইল বৃদ্ধা বাটীর ভিতরে॥

দ্বারপাল বলে প্রভু কিছুই না জানি। দ্বার পথ দিয়া কেহ না জায় এখনি॥

শুনিয়া আশ্চর্য্য কথা হন চমকিত। স্ত্রীলোকেরে জিজ্ঞাসেন যাইয়া ত্বরিত॥

কে আপনি আইলেন হঠাৎ এখানে। কোথা হৈতে আগমন কিবা ইচ্ছামনে॥

স্ত্রীলোক উত্তর দেন সেনজীর প্রতি। কিসে ব্যস্ত আছ কহ আপন ভারতি॥

---

৬ কিম্মতীয়—দামী, মূল্যবান [কিমৎ, আরবী শব্দ]

পূর্ণিমার তিথি অদ্য মোর উপবাস। শ্রান্ত হইলাম পথে রৌদ্রের প্রকাশ ॥
দেখিলাম অট্টালিকা পরম সুন্দর। বিশ্রাম করিব হেথা হরিষ অন্তর ॥
কল্য প্রাতে পূর্ণিমার করিব পালন। ইচ্ছামতে কিয়দ্দিন থাকিতে মনন ॥
শুনিয়া স্ত্রীলোক বাক্য সেন মহাশয়। উত্তর দিলেন কিন্তু মনেতে সভয় ॥
খ্যাতবর্গী দস্যুগণ লুটিবেক বাটী। অদ্য হেথা হৈতে মোরা সবে যাব উঠি ॥
এক প্রাণি না রহিবে দুর্গম স্থানেতে। এসব সম্পত্তি ত্যাগ করি সকলেতে ॥
যে কোন নির্গম দেশ থাকে স্থানান্তরে। নির্জনে থাকিব যথা প্রাণ রক্ষা করে ॥
এই দস্যুগণ যথা নারে যাইবারে। রহিব এমত স্থানে হরিষ অন্তরে ॥
এখানে আসিতে যাহে আর নাহি হয়। তথায় ব্যবস্থা হেন করিব নিশ্চয় ॥
লক্ষ্মীমাতা বৃদ্ধারূপা নাহিক সন্দেহ। বুঝেন সেনজীমাত্র নাহি বুঝে কেহ ॥
কহিলেন বৃদ্ধমাতা শুন পুণ্যবান। যথা ইচ্ছা যাহ মোরে হেতা দিয়া স্থান ॥
আমার পারণ তরে রাখি উপহার। এস্থান ত্যজিতে তবে করহ বিচার ॥
পুনঃ না আইস ফিরি তুমি যত দিনে। তত দিন অবস্থিতি করিব এখানে ॥
সেনজী বলেন মাতা একোন বিধান। মোর বংশে কেহ নাহি আসিবে এস্থান ॥
বলিলেন বৃদ্ধমাতা কেন উতরোল। এসকল দেখিমাত্র শনির বিহেবাল ॥
কর্ম্মবশে এই স্থানে আসিতে হইবে। যাহা কহিলাম আমি নিশ্চয় জানিবে ॥

রাখিয়া তাঁহার জন্য বহু উপহার। শুভ্র পূজা ঘরে দেন শয়ন আগার ॥
লক্ষ্মীরে স্থাপন করি চলেন তখন। জয়ন্তী কহিচে করি পয়ারে রচন ॥"

"অথ সেনজীর ৺ রামেশ্বরের স্তুতি

মন্দিরে তৎপরে গিয়া উপস্থিত হন। রামেশ্বরে গলবস্ত্রে করেন স্তবন ॥
পারত্রীক প্রত্যাশাতে লিঙ্গের স্থাপন। হইবেন চিরস্থায়ী ছিল যে মনন ॥
সেতুবন্ধ রামেশ্বর স্থান যে দুর্গম। সর্ব্ব নর যাইবারে না হয় সুগম ॥
আপনার পূজা ধ্যান এখানে করিবে। দুর্গম সংসার পাপে মোচন পাইবে ॥
কাশীধাম সর্ব্বনর যাইতে না পারে। এস্থানে পূজনে মুক্তি পাইবে সত্বরে ॥
সে সকল ভ্রম মোর বুঝিনু এখন। অধম পামর নীচ আমি হেয় জন ॥
এতাধিক কর্ম্ম করা পরম গর্ব্বিত। না বুঝিয়া করিয়াছি অতি অনুচিত ॥
দুরাশয় উঠে প্রভু ক্ষমা কর মোরে। প্রাণ ভয়ে যাই চলে রাখিয়া তোমারে ॥
এই চিন্তা রহে প্রভু যবনে স্পর্শিবে। হিন্দু ধর্ম্ম অবিশ্বাস সকলে করিবে ॥
জাগ্রত হইয়া রক্ষা মন্দিরের দ্বার। যবন পৌছিলে যেন লাগে চমৎকার ॥
স্বর্ণ পৈতা রহে অর্ধচন্দ্র রত্নময়। এই লোভে ভিতরেতে সান্ধাবে৭ নিশ্চয় ॥ [পৃষ্ঠা-১৩]
স্বর্ণরূপ্য তৈজসাদি যা কিছু পূজার। সাজাইয়া রাখি যাই সাক্ষাতে তোমার ॥

৭ সান্ধাবে—প্রবেশ করিবে।

যাহা জ্ঞান করিও সে আমি কিবা। বিদায় জন্মের মত হইলাম আমি ॥
মন্দির হইতে তবে এলেন সত্বরে। জয়ন্তী আখ্যান তাঁর করিছে পয়ার ॥"

"অথ সেনজীর সোভাবাজার বাটী ত্যাগ।

শিবের চরণ বন্দি ভাবিয়া অপার। কান্দিয়া ছাড়েন বাস সহ পরিবার ॥
ভয়ঙ্কর নিশাযোগে ভাবনা অপার। বহু কষ্টে সর্ব্ব সহ হন গঙ্গাপার ॥
রাত্রি পর্য্যটন ক্লেশ সহ্য যে করিয়া। প্রাণ ভয় বহুদূরে যান পলাইয়া ॥
প্রভাত হইল তীরে নিশা অবসান। পরিবার সহ এক স্থানে অবস্থান ॥
নিরানন্দ বহু ক্লেশ সকলি প্রমান। শ্রীজয়ন্তীচন্দ্র সেন করিল বাখান ॥"

"অথ সেনজীর বাটীতে দস্যের আক্রমণ
ও মহাদেবের মাহাত্ম্য প্রকাশ

এখানে ঘটিল যাহা শুন মন দিয়া। প্রভাতে দস্যেরা সেন পুরেতে পৌছিয়া ॥
কোথাকি সম্পত্তি আছে দেখেনে নিশ্চয়। সেন কোথা পলাইল ॥ শব্দময় ॥
বাটীর মধ্যেতে জন প্রাণি না দেখিয়া। ভাণ্ডারে বিবিধ ধন প্রাপ্ত না হইয়া ॥
মালখানা ভাঙ্গে গিয়া ক্রোধান্বিত হয়ে। তল্লাস করয়ে ধন সর্ব্বজলাশয়ে ॥
সর্ব্ব ঘরে বেড়াইতে দেখে এক বুড়ি। তাহারে ধরিয়া আনে সবে তাড়াতাড়ি ॥
বহু ধন নাহি পেয়ে ক্রোধিত হইল। অট্টালিকা ভাঙ্গিবারে আরম্ভ করিল ॥

বুড়িকে তাড়না করে বিবিধ প্রকারে। সঙ্গে লয়ে যাইতে কহে ধনের আগারে ॥

বুড়ি কহে অট্টালিকা ভাঙ্গিলে কি হবে। স্থান দেখাইয়া দিব বহুধন পাবে ॥

প্রথমে মৃত্তিকা সব করহ খনন। অতঃপর কর সব কূপ অন্বেষণ ॥

বুড়ির কথায় সবে তাহাই করিল। স্বর্ণ রূপ্য তৈজসাদি অনেক পাইল ॥

তাহা পেয়ে দস্যুগণে জন্মিল আশ্বাস। মুদ্রা অলঙ্কার জন্য দেখায় তরাস ॥

অধম পামর পাপি দস্যুগণ ছিল। দেখায় কাহারে ত্রাস কিছু না বুঝিল ॥

খননে সম্পত্তি কূপে যথেষ্ট পাইয়া। তুষ্ট হৈয়া যদি তারা যাইত চলিয়া ॥

বিপদে পতিত কভু না হৈত সেখানে। লভ্য করি অনায়াসে যাইত অন্যস্থানে ॥

লোভে পাপ পাপে মৃত্যু জানয়ে সকলে। দুষ্টতা প্রযুক্ত পড়ে তাঁর কোপানলে ॥ [পৃষ্ঠা-১৪]

সর্ব্ব দস্যু একভাবে যুক্তি করে সার। না যাইব বিনা প্রাপ্তে ধন অলঙ্কার ॥

বৃদ্ধা কহিলেন তবে করি প্রকাশিত। স্থান কহি কিন্তু নাহি জানি হিতাহিত ॥

মন্দির ভিতর আছে ধন অলঙ্কার। শিবমাথে বহু মূল্য অর্ধচন্দ্রাকার ॥

বহু ধনে তাঁর দ্বার রুদ্ধ নাহি থাকে। জাগ্রত দেবতাস্থিত জানে সর্ব্ব লোকে ॥

তোমাদের দেখিতেছি জাতিতে যবন[৮]। কিরূপে মন্দিরে সবে করিবে গমন ॥

৮ বর্গীরা কিন্তু যবন ছিল না।

সেই সব ধন প্রাতে না দেখি বিহিত। বুঝিয়া করহ কর্ম্ম যে হয় উচিত ॥
নামানি দেবতা জ্ঞান শিলামাত্র সার। এক চাপে উঠে গিয়া মন্দিরের দ্বার ॥
কপাট সংস্পৃষ্ট ছিল খুলিবা মাত্রেতে। ভিতরে জ্বলন্ত অগ্নি পাইল দেখিতে ॥
দ্বার খুলিবাতে সেই অগ্নি নিঃস্বরিল। সম্মুখে যাহারা ছিল বদন পুড়িল ॥
জাগ্রত হিন্দুর দেব বুঝিয়া অন্তরে। তথা হৈতে পলায়ন করিল সত্বরে ॥
ক্ষনমাত্র নাহি রহে পুরির ভিতরে। পূর্ব্বে যাহা প্রাপ্ত হয় লয়ে যায় ঘরে ॥
বৃদ্ধমাতা রহিলেন বাটীর ভিতরে। রামেশ্বর ব্রহ্ম রুদ্র রূপেতে মন্দিরে।
কেহ দেশে নাহি নিত্য সেবা নাহি হয়। মন্দির ভিতরে হৈনমাত্র তেজোময় ॥
জাগ্রত দেবতা বটে জ্ঞাত সর্ব্বজন। জয়ন্তি পুস্তকে মাত্র করিল বর্ণন ॥"

"অথ সেনজীর হিজলি মোকামে অবস্থিতি ও মাতার ব্রতপালনে দ্বাদশ জলাশয় খনন।

ওখানে শুনহ বার্ত্তা সেনজীর কথা। উপস্থিত বহুদূরে গ্রাম নাহি যথা ॥
এখন সে স্থান খ্যাত হিজলি মোকাম।[১] অতি মন্দ বারি বায়ু নহে বাস গ্রাম ॥
পুরঃসর সেই স্থানে উদযোগী হইয়া। দূর দেশান্তর হৈতে সঞ্চয় করিয়া ॥

১ একবার খেলে হিজলীর পানি
যমে মানুষে টানাটনি' সেকালের ছড়া। কলকাতা থেকে পালিয়ে চার্ণক এখানে আশ্রয় নেন। এবং তাঁর সৈন্যদল মড়কের মুখে পড়ে।

রাজ রাজী বহুবিধ ছুতার কাসার। আবাদ করান তথা সহ পরিবার ॥
ব্রাহ্মন পণ্ডিত কত আনায়ে সেখানে। বহু ব্যয়ে বাস করালেন সেই স্থানে ॥
তৎপরে আপন বাটী হইল নির্ম্মাণ। বৃহত্তর অট্টালিকা হয় সমাধান ॥
একলা করিতে বাস ত্রাস পেয়ে মনে। দীর্ঘগঙ্গা হৈতেসবে আনেন সেখানে ॥
জ্ঞাতি যে কুটুম্ব তাঁর বহুবিধ ছিল। তথায় আসিয়া বাস সকলে করিল ॥
নিরুদ্বেগে কত দিন কাল কাটি যায়। পালনে মাতার ব্রত চিন্তেন উপায় ॥
একাদশ পুষ্করিণী হয়েছে খনন। একমাত্র বাকী রহে ব্রতের পালন ॥

[পৃষ্ঠা-১৫]

হিজলি মোকাম ভূমি স্থির করি মন। করিলেন জলাশয় দ্বাদশ পূরণ ॥
অষ্ট বিঘা জলকর হয় পুষ্করিণী। বহু উচ্চ পাড় সেই বারি প্রদায়িনী ॥
অদ্যাবধি পুষ্করিণী ভাল অবস্থায়। সেন পুষ্করিণী সবে প্রসিদ্ধ তথায় ॥
হয়েছে তাহার তটে নিমক কাছারি। বংশে কেহ নাই জ্ঞানে রাজঅধিকারী ॥
দ্বাদশ পুষ্কর্ণি কাটা যদি পূর্ণ হয়। পালনে মাতার ব্রত মনেতে উদয় ॥
একমাত্র পুষ্করিণী হইল তথায়। বাকী একাদশ দূরে থাকিল হেথায় ॥
ব্রতপূর্ণ জন্য পুনঃ আসিবারে হয়। লক্ষ্মীমাতা কথা তবে মনেতে পড়য় ॥
লক্ষ্মীমাতা যাত্রাকালে কহিলেন সার। রহিবেন বাটীমধ্যে সে সোভা-বাজার ॥
তাঁহারে দেখিতে পুনঃ আর রামেশ্বরে। আপন মাতার ব্রত পালনের তরে ॥
হিজলির ঘরবাটী ত্যাজিতে মনন। সকলি শনির কর্ম্ম জয়ন্তী বচন ॥"

"অথ সেনজীর হিজলি বাটী পরিত্যাগ ও
শোভাবাজারে পুনঃ আগমন।

এলেন হিজলি হইতে ফেলিয়া সকল। সঙ্গে আনিলেনমাত্র পুষ্করিণী জল ॥

অদ্যাবধি অট্টালিকা আছয়ে পতিত। নন্দরাম দেওয়ানের বাটী বলি খ্যাত ॥

কিয়দংশে বাস তাহে জ্ঞাতিরা করিছে। বহুবিধ অংশ তার পতিত রহিছে ॥

মাতাকে করিয়া সঙ্গে পুত্র পরিবার। উপস্থিত হইলেন এ সোভাবাজার ॥

হিজলি হইতে বাটী এলেন যখন। বৃদ্ধা স্ত্রী তাঁহারে দেখা দিলেন তখন ॥

কহিলেন শুন বৎস আর নাহি ভয়। তোমার শনির গ্রহ অল্প দিন রয় ॥

সৎকর্ম্মে ভ্রমণ এবে হইবে করিতে। মাতা লয়ে যাও জলাশয় উৎসর্গেতে ॥

কিছু দিন তরে আমি হলেন বিদায়। পুনঃরায় অধিষ্ঠান হইব হেথায় ॥

এতবলি লক্ষ্মী মাতা হন অন্তর্ধান। ব্রতের পালনে রত হলেন মহান ॥

যেখানে যেখানে ছিল পুষ্কর্ণি খনন। সর্ব্ব জল এক পাত্রে বিধি মতে লন ॥

যাত্রা করিলেন তবে ব্রতের পালনে। জয়ন্তী চন্দ্র সেন এবে পয়ারেতে ভণে ॥" [পৃষ্ঠা-১৬]

"অথ সেনজীর মাতার ব্রত পালনে বারাসতে দ্বাদশ পুষ্কর্নি উৎসর্গ
ও রথ প্রতিষ্ঠা ও ব্রাহ্মণকে ভূমি ও বাটী দান।

পুত্র পরিবার সবে রাখিয়া বাটীতে। মাতারে লইয়া যান এলোবারাসতে ॥

পঞ্চানন তলা তথা অবস্থিতি করে। ব্রাহ্মণ মণ্ডলী সব ডাকেন সত্বরে ॥

বর্ষশেষে চৈত্র সংক্রান্তির দিনে। পুষ্করিণি উৎসর্গ হয় ব্রতের পালনে ॥

তথায় থাকিয়া মাতা করিলেন মন। রথের প্রতিষ্ঠা করি সার্থক জীবন ॥

সে মহা পুরুষ তবে মাতৃ আজ্ঞা শুনি। কারিকরগণে তথা আনেন তখনি ॥

বহুবিধ কর্ম্মকারী কার্য্য আরম্ভিল। অল্পদিন মধ্যে রথ প্রস্তুত হইল ॥

দেখিলে সে রথ লোকে লাগে চমৎকার। বহু উচ্চধ্বজা তার বৃহৎ ব্যাপার ॥

রথ মধ্যে দেবস্থান বিবিধ প্রকার। উচ্চ মন্দিরের তুল্য রথের আকার ॥

অদ্যাবধি আছে রথ জীর্ণ অবস্থায়। বারাসত ধামে যথা আছে জলাশয় ॥

তুল্যমূল্য ব্যয় হয় উভয় নির্ম্মাণে। লক্ষমুদ্রা প্রত্যেকেতে সর্ব্ব দেশে জানে ॥

কলিকাতা অট্টালিকা লক্ষ মুদ্রা ব্যয়। অলিক কিছুই নহে সর্ব্ব লোকে কয় ॥

বিগ্রবাটী শিবা ব্রত বাটীতে নিশ্চয়। অন্য এক লক্ষ মুদ্রা হইলেক ব্যয় ॥

হাটখোলা ঘাটে আর গো অশ্ব আশ্রমে। আর লক্ষমুদ্রা যায় এইসব ধামে ॥

লক্ষ মুদ্রা ব্যয় পুনঃ পুষ্করিণি দ্বাদশে। হিজলি বাটীতে লক্ষ জানিহ বিশেষে ॥

দেশ দেশান্তরে সর্ব্ব পুষ্করিণি হওয়াতে। ব্রাহ্মণ মণ্ডলী বসবাস করাইতে ॥

তাহাতে অনেক ব্যয় লোকেতে জানিল। একলক্ষ মুদ্রা গত তাহাতে হইল ॥

বাটীর পূজারবাটী সুশোভন ছিল। আর লক্ষ মুদ্রা জান তাঁহাতে লাগিল ॥

শিববিগ্র তৈজসাদি যত্ন অলঙ্কার। সকলেতে ব্যয় হয় লক্ষ যে মুদ্রার॥
ব্রতের পালনে যত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠায়। লক্ষমুদ্রা ব্যয় হয় কারণ মাতার॥
লক্ষ মুদ্রা অভ্যন্তরে করেন স্থাপন। গো ভূমি প্রদান মাতৃ শ্রাদ্ধের কারণ॥
বৃহৎ কর্ম্মেতে এই সদ্ব্যয় করিয়া। বিবিধ সম্পত্তি তিনি স্থাপিত রাখিয়া॥
এলোবারাসত সৈতে সর্ব্ব স্থানে যান। যথা তথা হইলেক পুষ্করিণি বাখান॥
একে ২ সব মাতা করেন উৎসর্গ। বাটী আগমনে দেখা পরে জ্ঞাতিবর্গ॥
ব্রত বিধিমতে বারি উৎসর্গ হইল। ব্রাহ্মণে ভোজন দান করিতে রহিল॥
অশ্ব গাভীশাল বাটী মন্দির উত্তর। ইষ্টিট উত্তর আছ বাটীর গোচর॥
[পৃষ্ঠা—১৭]
মাতৃ পুণ্যে মুখোগণে করিলেন দান। বড় অট্টালিকা তাহা অদ্য বর্ত্তমান॥
শিবা ব্রত বাটীছিল পশ্চিমে তাহার। গোস্বামীকে দান দেন করি সুবিচার॥
তাহার পশ্চিমে বিত্ত আছিল তখন। আশীষ কারক যাঁরা চক্রবর্ত্তীগণ॥
তাঁহাদের সেই বিত্ত করেন প্রদান। তখন উন্মত্ত দানে হলেন মহান্॥
বাটীর উত্তর অংশে অন্য চক্রবর্ত্তি। জমিদানে তাঁহাদের স্থির হয় বৃত্তি॥
তাহার পশ্চিম বাটী পুষ্করিণি উত্তর। অন্য গোস্বামীকে দান করেন সত্বর॥
গোস্বামী বারির জন্য চান পুষ্করিণী। ব্যবহার জন্য দেন সেনজী মেলানি॥
মাতৃব্রত পূর্ণ হয় এরূপ বিধানে। শ্রীজয়ন্তীচন্দ্র সেন মহাহ্লাদে ভণে॥”

"অথ সেনজীর পিতৃ দৌহিত্র ও চারি কন্যার বিবরণ।

পিতার দৌহিত্র ছিলবাটীতে তাঁহার। আলাহিদা স্থান দিতে আজ্ঞা যে মাতার॥
মন্দির দক্ষিণে যেই বড় বাটী ছিল। সেই বাটী তাহাকেও প্রদান হইল॥
অদ্যাবধি সেই বাটী দেখি বর্ত্তমান। ঘোষের বসত বাটী সকলে বাখান॥
সেনজীর কন্যাছিল জানি চারি জন। সবার বিবাহ দেন হয়ে হৃষ্ট মন॥
প্রথম জামাতা বাটী হয়ে সেই স্থান। এখন শিমূলা বলি যাহার বাখান॥
প্রসিদ্ধ মদন মিত্র তাঁহার দৌহিত্র। যাঁর বাটী রাসলীলা বিখ্যাত বিচিত্র॥
অদ্যাবধি তাঁর বংশ আছে বর্ত্তমান। সেনজী দৌহিত্র বংশ সর্ব্বত্র বাখান॥
দ্বিতীয় জামনা বাটী হইল তাঁহার। এখন যে স্থান লোকে কহে বাগ্‌বাজার॥
দিব্য অট্টালিকা করি দেন জামাতারে। অনেক সম্পর্ত্তি দান দিলেন কন্যারে॥
রামানন্দ বসু তাঁর দৌহিত্র বিখ্যাত। খোনারামকান্ত বসু গুষ্ঠি বলি খ্যাত॥
তৃতীয় বিবাহ দেন জেলা বর্ধমান। অতি পুরাতন ঘর তাঁদের বাখান॥
ঘোষ কুল বলি খ্যাত তাঁহারা সেদেশে। জমিদারগণ সবে জানিত বিশেষে॥
দৌহিত্র প্রপৌত্র অদ্যতক বর্ত্তমান। পিতাম্বর ঘোষ নামে বড়ই সম্মান॥
বড়ায় মজুমদার কুল যে প্রধান। চতুর্থে বিবাহ তথা দিলেন মহান্॥

দৌহিত্রের পৌত্র অদ্যতক বর্ত্তমান। রাজকৃষ্ণ মজুমদার নামেতে বাখান ॥
দূর দেশান্তরে সবে হইলেক বাস। জয়ন্তী বিশেষ করি করিল প্রকাশ ॥" [পৃষ্ঠা—১৮]

"অথ সেনজীকে ব্রহ্মশাপ ও তদ্বংশে তাহার ফল।

এইরূপে কত কাল কাটান সংসারে। শনির আবিষ্ট নাহি ঘুচয়ে সত্বরে ॥
যদ্যপিও বহু ক্লেশ দাতা নাহি হন। ক্রমে ক্ষয় পায় তাঁর ধন বন্ধুজন ॥
এক দিন শুন যাহা ঘটিল তাঁহারে। বসিয়া আছেন তিনি বাহির আগারে ॥
এক বৃদ্ধ দ্বিজ আসি হন উপনীত। শিবের মন্দিরে হত্যা দেন আচম্বিত ॥
রক্তপীত্ত পীড়া যুক্ত ছিলেন ব্রাহ্মণ। ক্লেশ পরিসীমা নাই নিকট মরণ ॥
তিন দিবারাত্রি দ্বিজ রন অনাহার। সেনজীর মনে কষ্ট হইল অপার ॥
আপন আহার নিদ্রা সকল ত্যজিয়া। তিনদিন মন্দিরেতে রহেন বসিয়া ॥
ফলমূল আদি যত পানীয় লইয়া। ব্রাহ্মণ পারণ জন্য রণ নিরখিয়া ॥
তিন দিন পরে দ্বিজ উঠিয়া সত্বরে। সেনজীরে দেখি তথা হরিষ অন্তরে ॥
প্রাণ রক্ষা হৈবে মোর পীড়া উপশম। প্রতিকার প্রত্যাদেশ যুক্তি অনুপম ॥
সেনজী কহেন দ্বিজ আছ অনাহারে। তৃপ্ত হও কিছুমাত্র জলযোগ করে"
দ্বিজকন পীড়া আমি সহিতে না পারি। দোষক্ষমি কৃপামোরে করুন শীঘ্র করি ॥

অগ্রেতে পাদক জল দানদিন মোরে। পীড়াহৈতে মুক্তপ্রাপ্তি হইব সত্বরে ॥
শুনিয়া দ্বিজের বাক্য সেন মহাশয়। কম্পিত হইয়া উঠে কলেবর ময় ॥
শুদ্র হয়ে ব্রাহ্মণেরে পদজল দান। কোন শাস্ত্রে নাহি শুনি এমত বিধান ॥
অপরূপ প্রত্যাদেশ কভু নাহি শুনি। এমত কুকার্য্য দৈবাদেশ নাহি জানি ॥
অস্বীকার হইবাতে সেই দ্বিজবর। লোহিত লোচন ক্রোধে কম্পে কলেবর ॥
অভিশাপ করিলেন মহা কটু ভাষে। শুনিয়া সকল লোক কম্পমান ত্রাসে ॥
ব্রাহ্মণ বলেন শুন ওহে শুদ্রবর। ধর্ম্ম পুণ্যবলে তুমি শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর ॥
হইল তোমার মনে এই অহঙ্কার। ব্রহ্মশাপে সবংশেতে যাবে ছারখার ॥
এই কটু বাক্য দ্বিজ কহিবামাত্রেতে। বাক্য রোধ হয় তাঁর এক নিমিষেতে ॥
চৈতন্য রহিত হন নিদ্রায় কাতর। পুনঃ প্রত্যাদেশ তাঁরে হইল সত্বর ॥
পূর্ব্বকালে কটুভাষে পীড়া উপস্থিত। পুনঃ তব বুদ্ধি কেন হেন বিচলিত ॥
বংশলোপ কর যার সদা ধর্ম্মে মন। ব্রহ্ম শাপ ব্যর্থ যাবে নিগূঢ় কথন ॥
আশ্চর্য্য জানিয়া তবে পুণ্য সেনজীর। জাগিয়া ব্রাহ্মণ কন হইয়া সুধীর ॥
ব্রহ্ম শাপ হইলেক তোমার উপর। অবশ্য ঘুষিবে তব সংসার ভিতর ॥
[পৃষ্ঠা—১৯]
নির্ব্বংশ না হবে তুমি নিজ পুণ্যবলে। রক্ত পীত্ত রোগগ্রস্থ মরিবে সকলে ॥

মহাপুণ্যবান তুমি জগতে বাখান। নির্ণাম নাহিক হবে বুঝিনু প্রমাণ॥
আমি যে অস্থিরচিত্তে আছি ব্যাকুলিত। অস্থিরতা অবংশে হৈবে নিরুপিত॥
ধার্ম্মিক জন্মিবে বহু বংশের ভাজন। তাদের সৎকর্ম্মে সদা লিপ্ত হবে মন॥
কিন্তু যেইরূপ আমি অস্থির পীড়াতে। মম পরিবার ক্লেশ পায় বিধিমতে॥
তেমনি ঘটিবে তববংশীয় সকলে। সুস্থিরতা নাহি প্রাপ্ত হৈবে কোনকালে॥
বৃহস্পতি তুল্য যদি হয় জ্ঞানবান। কুবের সমান যদি হয় ধনবান॥
যুধিষ্ঠির তুল্য যদি হয় ধর্ম্মে জ্ঞান। বলির সদৃশ যদি করে মহা দান॥
পদপ্রাপ্ত হয় যদি ইন্দ্রের সমান। মন সুখ নাহি হবে বচন প্রমাণ॥
শুদ্র হয়ে ব্রাহ্মণের নাজান সম্মান। তব বংশ নীচ হস্তে হবে অপমান॥
এত বলি দ্বিজবর হলেন বিদায়। অপার মনের দুঃখ সেন নিরুপায়॥
ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ নাহি হয় কদাচন। পুরুষানুক্রমে বংশে সেরূপ ঘটন॥
কোন রূপে মন দুঃখে কাল কাটে তাঁর। এক দিন মনে তাঁর হইল বিচার॥
সকলি গ্রহর কর্ম্ম অবশ্য ফলিবে। জয়ন্তী পুস্তকে লেখে সকলে শুনিবে॥"

"অথ মহাদেব মন্দিরে অবস্থিতি ও মোহন্তর আদেশ ও কর্ম্মে প্রমাণ।

রামেশ্বর বুঝি ভাবিলেন অন্তর্ধান। এত বিভীষিকা নহে কেন বর্ত্তমান॥
চিন্তামনে এই কথা বসিয়া মন্দিরে। হঠাৎ মোহন্ত এক পৌছেন সত্বরে॥

মন্দির ভিতরে যান মুখে নাহি কথা। যোগাসনে বসি ধ্যান আরম্ভেন তথা॥
কর পদ্বি বৃদ্ধ এক বণিক্ যে ছিল। সোভাবাজারেতে তাঁর দোকান আছিল॥
বড়ই দরিদ্র সেই বহু পরিবার। বিক্রয়ের লভ্যে তার না চলে সংসার॥
জাগ্রত দেবতাস্থিত জানিয়া মন্দিরে। নিত্য ২ জপধ্যান করে রামেশ্বরে॥
দারিদ্রতা জন্য সেই সর্ব্বদা চিন্তিত। স্বপ্নে দুরাদৃষ্ট তার হয় সুবিদিত॥
কহিলেন তারে দেব আশ্বাস বচনে। মোহন্ত পৌঁছেন আসি মম নিকেতনে॥
থাকেন যতেক দিন এই স্থানে তিনি। সেবায় সুস্থতা তাঁহে সদা কর তুমি॥
সন্তুষ্ট হইতে তাঁর বিদায় কালেতে। দৈন্যতা হইবে দূর তাঁহার কৃপাতে॥
বণিক্ সেবায় থাকে আজ্ঞা যেই রূপ। শুনহ সকলে যাহা ঘটে অপরূপ॥
কত দিন পরে হন মোহন্ত বিদায়। দরিদ্র বণিক্ তাঁর পিছে পিছে ধায়॥
উত্তর দিকেতে তিনি যান বহু দূরে। পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায় বণিক্ সত্বরে॥
মোহন্ত ফিরিয়া দেখি কহিলেন তায়। এতকষ্টে কিনিমিত্তে আসিছ হেথায়॥
বণিক্ কহিল সাধু প্রসন্ন হইয়া। দৈন্যতা করুণ দূরে যাইব চলিয়া॥
নতুবা আপন পদে প্রাণ সমর্পিব। দেশেতে ফিরিয়া আর কভু না যাইব॥
হাসিয়া উত্তর দেন তপস্বী ঠাকুর। নাচিন্ত দৈন্যতা দিন হইবেক দূর॥
ইহা বলি তন্নিকটে ময়দান হইতে। সাধারণ বৃক্ষ পত্র তুলিয়া হস্তেতে॥
দুই হস্তে সেই পত্র ঘর্ষণ করিয়া। বণিকে অর্পেণ এই আদেশ বলিয়া॥

ইহা লয়ে তুমি নিজ দোকানেতে গিয়া। পত্ররস সর্ব্ব দ্রব্যে দেহ ছড়াইয়া ॥

সর্ব্ব দ্রব্য স্বর্ণ হৈবে প্রত্যক্ষ দেখিবে। দারিদ্রতা দূর তব তাহাতে হইবে ॥

কিন্তু এক কথা কহি শুনহ উপায়। দোকানের দ্রব্য ভিন্ন না দিবে কোথায় ॥

রামেশ্বর পুরী প্রান্তে তোমার দোকান। তাঁহার মাহাত্ম্যে ইহা ফলিবে প্রমাণ ॥

অন্যস্থানে অন্যদ্রব্যে ইহা না ঘটিবে। নিশ্চিত জানিয়া চেষ্টা কভু না করিবে ॥

দৈন্যতা হইলে দূর যাহ সেন ঘরে। বার্ত্তা কহ নন্দরাম সেনের গোচরে ॥

মন্দিরে আছেন রামেশ্বর অধিষ্ঠান। সেনজীর মনে ইহা হইবে প্রমাণ ॥

হইবেন বড় সুখি মন চিন্তা যাবে। ধার্ম্মিক সেনের মনে ধর্ম্ম যে বাড়িবে ॥

বণিক্ প্রফুল্ল চিত্তে ফিরিয়া আসিয়া। দোকানেতে পত্ররস দিল ছড়াইয়া ॥

সর্ব্ব দ্রব্য স্বর্ণ হয় দেখি চমকিত। বণিক্ হইল মনে বড় হরষিত ॥

ঘর্ষিত পত্রকে আস্তে ব্যস্তেতে খুলিয়া। আনন্দিত হৈল বৃক্ষ পত্র যে চিনিয়া ॥

দোকান করিয়া রুদ্ধ গেল নিজ ঘরে। সেই পত্র তুলিলেক বণিক্ সত্বরে ॥

ঘর্ষণ করিয়া রস সর্ব্বত্রে ছড়ায়। পত্ররসে ভিন্ন ভাব আশ্চর্য্য দেখায় ॥

কাংশ পিত্তলাদি লৌহ কাষ্ঠ যাহা ছিল। পত্ররসে বিড়ম্বনা মৃত্তিকা হইল ॥

আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখি বণিক্ বিস্ময়। তখন মনেতে তার ভাবনা উদয় ॥

মোহন্তর বাক্য আমি অবহেলা করে। বাটী দ্রব্য দেই, রস পরীক্ষার তরে ॥
তাহাতে আমাকে এবে বিবিবিড়ম্বিল। নাজানি দোকান দ্রব্য মৃত্তিকা ॥ হইল ॥
দ্রুতগতি গিয়া দেখে আপন দোকান। স্বর্ণময় সর্ব্ব দ্রব্য আছে বর্ত্তমান ॥
শিবের মাহাত্ম্য বুঝি হয়ে হরষিত। সেনজীর সমীপেতে হয়ে উপনীত ॥

[পৃষ্ঠা-২১]

কহিল সকল বার্ত্তা ঘটিল যেমন। সেনজীর হয় তাহে প্রফুল্লিত মন ॥
সেই বণিকের পৌত্র শম্ভুকর নামে ॥ দোকান করিত সদা সেন পুরধামে ॥
সকলে জানিত সেই বৃদ্ধ শম্ভুকর। নিধন হয়েছে এবে দ্বাদশ বৎসর ॥
ধন্য ধন্য সেনজীর পুণ্যের প্রকাশ। কলিযুগে হেন ঘটে কে করে বিশ্বাস ॥
সত্যধর্ম্মে যেই থাকে তার সদা জয়। শ্রীজয়ন্তীচন্দ্র সেন সার কথা কয় ॥"

"অথ সেনজীর প্রতি সত্যনারায়ণের ফকিরের শাপ এবং তাঁহার ও তদ্বংশের উপর শাপের ক্রমশঃ ফল প্রাপ্ত।

ধর্ম্ম পুণ্য কর্ম্মে কাল কাটিত তাঁহার। ঘটনা হইল পুনঃ শুনহ বিস্তার।
একদিন শুক্রবার সেন মহাশয়। বসিয়া আছেন তিনি শিবের আলয় ॥
পিরের ফকির এক আসি উপস্থিত। সত্যপির গুণ গায় বড় আনন্দিত ॥
মন্দির বাটীর মধ্যে আইল ফকির। তাহাতে সেনজী সয়ে মনেতে অস্থির ॥
কহেন ফকির সত্যপির পরায়ণ। হিন্দু দেব স্থান হৈতে করহ গমন ॥
পিরের ফকির তাহে বড়ই রুষিল। মহা ক্রোধে সেনজীরে কহিতে লাগিল ॥

সত্যপির আর দেখ সত্য নারায়ণ। একই পদার্থ দোঁহে জানে জ্ঞানীজন ॥
হিন্দুমতে তত্ত্ব কথা কহিলাম সার। যেই জাতী যেই নামে পূজয়ে তাঁহার ॥
ধার্ম্মিক নামেতে মাত্র হও তুমি খ্যাত। ধর্ম্ম তত্ত্ব কারেবলে নাহি আছে জ্ঞাত ॥
জাতীয় প্রভেদ হৈলে হানি কিবা হয়। ভক্তের ভাবনা রূপে প্রভুর সদয় ॥
জ্যোতীষে পণ্ডিত বড় ছিল সে ফকির। শতবর্ষে ঘটে যাহা গণিলেক স্থির ॥
সেনবংশে হৈবে যাহা গণিয়া দেখিল। ইংলণ্ডায় অধিকার সম্ভবনা ছিল ॥
নবাবি আমল ছিল জানিত তখন। বর্ত্তমান ভবিষ্যতে রাজা যে যবন ॥
বুঝিল সকল যাবে যবন হস্তেতে। সম্পত্তি সবার লোপ হয়তো কালেতে ॥
বড়ই সুবুদ্ধি সেখ চতুর ফকির। কথা কহে যাহা পরে ঘটিবেক স্থির ॥
বহুক্রোধ দেখাইয়া সেনজীরে কয়। অভিশাপ করি তোমা ফলিবে নিশ্চয় ॥
জাতীতে যবন বলি মোরে কর হেলা। বহুধন পুত্রগন লয়ে তব মেলা ॥
সকলি দেখিবা তুমি নিমেষের খেলা। যবনের প্রতি নাহি হবে অবহেলা ॥ [পৃষ্ঠা—২২]
চলিয়া যাবেন লক্ষ্মী তব জীবনেতে। দর্পমূল পঙ্কমুদ্রা না পাবে দেখিতে ॥
তুমি নিজে আর নাহি ফিরিয়া পাইবে। হইতে যবন হস্ত তব বংশ পাবে ॥
ধার্ম্মিক বটহে কিন্তু পুত্র অহঙ্কারী। ভয়বাসী পাছে মর পুত্র শোক ধরি ॥
অট্টালিকা ঘর বাটী হয়েছে বিস্তর। এই জন্য আছে তব গর্ব্বীত অন্তর ॥

দেবায়তন নিজ পুণ্যে রহিবে সমান। অট্টালিকা নাহি রবে কহিনু প্রমান ॥

তোমার বংশেতে কত মূঢ়মতি হবে। যবন সংস্পৃষ্ট কাল বিরহ করিবে ॥

তাহাতে সম্পত্তি যাহা বংশেতে থাকিবে। যবন রাজার ঘরে অবশ্য যাইবে ॥

ফকির ক্রোধিত হয়ে ভিক্ষা না লইল। তাহে সেনজীর মনে দুঃখ উপজিল ॥

শ্রীসেখ আমিন চাঁদ কত কাল পরে। পৌছে কলিকাতা বাস করিবার তরে ॥

ধনাঢ্য প্রকাণ্ড দাড়ি জানিত সকলে। বন্ধুত্ব সেনের সহ হইল কৌশলে ॥

দুই কর্ম্মে অন্তরক দুজন বিখ্যাত। মনে কর যেবা শুনিয়াছ অবিরত ॥

বিখ্যাত সকলে আমিন চাঁদের দাড়ী। জানিত বৃহৎ ছিল নন্দরাম বাড়ী ॥

দুজনেতে যাতায়াত বন্ধুত্ব ভাবেতে। পরস্পর উপকার হয় বিপদেতে ॥

সেনজী তখন শিঘ্র করেন মনেতে। ফকিরের কথা ক্রমে চলিল ফলিতে ॥

যবন নিকটে লৈতে হয় উপকার। অতএব তুচ্ছ করা মন্দ ব্যবহার ॥

সকল মানবগনে সমভাব জ্ঞানে। জগৎ সংসারে কর্ম্ম করে শিষ্টজনে ॥

নিজ ধর্ম্মমত শ্রেষ্ঠ করিয়া বিচার। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরে বলা দুরাচার ॥

ধার্ম্মিক নরের ইহা কর্ত্তব্য না হয়। যথার্থ দেবের তুচ্ছ তাহে প্রকাশয় ॥

ঈশ্বর সবার পক্ষে সম দয়াবান। যথা ভক্তি তথা ভিন্নরূপে অধিষ্ঠান ॥

সেনজীর মনে উঠে ভিন্ন ধর্ম্মভাব। জয়ন্তী প্রকাশ করি জানায় প্রভাব ॥”

"অথ সেনজীর হস্ত হৈতে পঞ্চ মুদ্রার অন্তর্ধান ও তদপঞ্চম পুরুষে পঞ্চম মুদ্রা মাত্র প্রাপ্ত।

যদ্যপি শনির কোপছিল সেনজীরে। লক্ষ্মীমাতা থাকিতেন তাঁরে রক্ষা করে ॥

বিষম শনির দৃষ্টি জানে সর্ব্বলোক। বহুদুঃখ দেন তিনি পৌঁছে রোগশোক ॥

লক্ষ্মীমাতা কভু নাহি পারেন রক্ষিতে। নারেন তিষ্ঠিতে লক্ষ্মী শনির কর্ম্মেতে ॥

যাইবেন লক্ষ্মীমাতা কিছু দিন তরে। কৌশলে চলিয়া যান কহি সেনজীরে ॥

আপন মুখেতে তিনি দিলেন বিদায়। জানিয়া পড়িতে পিছে অকুল চিন্তায় ॥

একদিন মহাশয় আহ্নিক ঘরেতে। মনলিপ্ত নিত্য পূজা ছিলেন ধ্যানেতে ॥

সকলে জানিত তাঁর ছিল এই প্রথা। পূজার কালীন নাহি কহিতেন কথা ॥

প্রথম কন্যার রূপ ধরি লক্ষ্মীমাতা। উপস্থিত হইলেন পূজাঘর যথা ॥

পূজাতে আবৃত তেঁহে দেখিয়া সেখানে। পিতৃ সম্বোধনে কথা কন তাঁর সনে ॥

বলিলেন পৌঁছিলেক সন্দেশ হেথায়। যাইতে এক্ষণে হৈবে শশুর আলয় ॥

ডাকেন পিতারে কন্যা শুনি বারেবার। শিঘ্রপিতৃ অনুমতি চান যাইবার ॥

সেনজী যে নাহি করি চক্ষু উন্মীলন। বলেন কন্যারে ক্রুদ্ধ হইয়া বচন ॥

চিরকাল জান তুমি মম ব্যবহার। পূজার কালীন বাক্য নাহিক আমার ॥

অপেক্ষা করিতে তুমি যদি নাহি পার। শশুর আলয় তুমি যাওগো সত্বর ॥

বিদায় পাইয়া কন্যা বলেন তখন। তব বাক্সে আছে মম জৌতুকের ধন ॥
স্বর্ণ রূপ্য মুদ্রা আছে রজত কৌটায়। মোর হস্তে দিয়া পিতা করুণ বিদায় ॥
ধ্যান ভঙ্গ নাহি হয় উঠিয়া সত্বরে। বাম হস্তে এক কৌটা দিলেন কন্যারে ॥
মহাভ্রম হয় তাহে শুন সর্ব্বজন। বিধির বিপাক ঘটে না হয় খণ্ডন ॥
পঞ্চ দৈব মুদ্রা ছিল যেরূপ্য কৌটাতে। সেনজী দিলেন তাহা কন্যার হস্তেতে ॥
ছিলেন তাহাতে মহালক্ষ্মী অধিষ্ঠান। কৌটা পেয়ে লক্ষ্মীমাতা হন অন্তর্ধান ॥
একমনে কিয়ৎক্ষণ পূজা সাঙ্গ করি। সেন মহাশয় আইলেন অন্তপুরি ॥
ভোজন করেন বসি এমত সময়ে। জোষ্ঠ কন্যা পরিবেশনের পাত্র লয়ে ॥
কন্যারে দেখিয়া জিজ্ঞাসেন মহাশয়। এখন না যাও তুমি শশুর আলয় ॥
কি জন্য বিরক্ত তবে আহ্নিক সময়। জানিয়া করিলে হেন তুমিগো আমায় ॥
কন্যা কহে কেন যাব শ্বশুর বাটীতে। কোথা আমি গিয়াছিনু তোমারে কহিতে ॥
সেনজী বিস্ময়াপন্নে শিরে করাঘাতে। বুঝেন বিপদ ঘটে শনির মায়াতে ॥
আহ্নিক ঘরেতে গিয়া দেখেন সত্বর। পঞ্চ মুদ্রা কৌটা নাহি বাক্সের ভিতর ॥
ছাড়েন তাহার নিদ্রা ভাবনা উদয়। লক্ষ্মীমাতা স্বপ্নযোগে হইয়া সদয় ॥
কহেন সেনজী শুন বচন আমার। অবধৌতীক মুদ্রা তুমি না পাবে আবার ॥
ফকিরের কথা এবে করহ স্মরণ। জানহ সে ব্যক্তি ভক্ত সত্য নারায়ণ ॥

বুঝহ কলির আয়ু বাড়িবে ক্রমেতে। জগৎ সংসার মুগ্ধ হইবে পাপেতে ॥ [পৃষ্ঠা—২৪]

যোগতত্ত্ব চারি মুদ্রা চারি অবতার। পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া দেখি হইবেক ভার ॥

তবে যে পঞ্চম মুদ্রা রাম অবতার। পঞ্চম পুরুষ গন্য তোমা হৈতে যার ॥

যবন হস্তেতে প্রাপ্ত হৈবে কোন জন। তোমার সংসারে হৈবে পুনঃ আগমন ॥

চিন্তাদূর কর তুমি ধর্ম্মে দেও মন। পারত্রীক চিন্তাকর না ভাবিহ ধন ॥

সপ্তবিঘা বাস্তুভূমি বাটী তব আছে। বিরহ হইবে তব বংশীয়ের মাঝে ॥

কালেতে ফকির কথা ফলিবে সত্বর। চূর্ণ হবে বাস্তুবাটী কহিনু গোচর ॥

থাকিবে দেবায়তন নাম মাত্র সার। বাস্তুভূমি তব বংশে স্থির থাকা ভার ॥

ব্রহ্মশাপ তুমি সেন করহ স্মরণ। অবশ্য ফলিবে তাহা জানে সর্ব্বজন ॥

বাস্তুভূমি অন্য হস্তে পতিত হইবে। কিয়ৎকাল তব বংশ তথা না থাকিবে ॥

পতিত অপর হস্তে হইবে যখন। এ বাস্তুভূমিতে বাস্তু করিবে যে জন ॥

তার বংশ বৃদ্ধি কভু হইবার নয়। দ্বাদশ বৎসর বাস করিতে না হয় ॥

সঠিক জানিহ তুমি বচন আমার। তব বংশ ভিন্ন বাস্তু না হবে কাহার ॥

এবে পঞ্চ রূপ্য মুদ্রা রজত কৌটাতে। আছয়ে তোমার বাক্সে দেখ ভাল মতে ॥

লক্ষ্মীপূজা হওনের বহুদিন পূর্ব্বে। আসিব তোমার ঘরে রহ তুমি গর্ব্বে ॥

সেই কৌটা পূজা জন্য সর্ব্বদা রাখিবে। লক্ষ্মীপূজা ফলতব বংশাবলী পাবে ॥

তদবধি পঞ্চমুদ্রা লক্ষ্মীর পূজায়। পূজাকালে উপস্থিত কৌটা দেখা যায় ॥
অতঃপর প্রায় শতবর্ষ গত হয়। পঞ্চম পুরুষ তাঁহা হৈতে গন্য রয় ॥
হঠাৎ যবন হস্তে প্রাপ্ত আরবার। সেই সে পঞ্চম মুদ্রা রাম অবতার ॥
অন্য পৃষ্ঠে লক্ষ্মীমাতা সীতারূপধরা। অধিষ্ঠান তথা উপবেশন যে করি ॥
বারসত ছেষট্টিসনে প্রতিষ্ঠা তাঁহার। একাত্তর সনে পূজা হইল প্রচার ॥
সেই কালে লক্ষ্মী বাটী হয় আরম্ভন। পূর্ণ না হইতে শাপ ফলিল তখন ॥
শ্রীসীতা নবমীব্রত যুগযুগান্তরে। প্রচলিত নাহি ছিল জগৎ সংসারে ॥
উক্ত সনে সেন বাটী কলিকাতা ধাম। সোভাবাজারেতে সভা হয় অনুপম ॥
প্রচার হইল ব্রত আদৌ লক্ষ্মী পূজা। ভবিষ্যপুরাণ উক্ত পালে সর্ব্ব প্রজা ॥
সীতাব্রত উপাখ্যান বহি প্রচারিল। জয়ন্তি কিঞ্চিৎ এবে পয়ারে কহিল ॥”

* * * * * *

এই কাব্যে যে কয়টি স্থানের নাম দেওয়া হয়েছে বর্তমানে তাদের অবস্থান নির্ধারণ করতে গিয়ে দেখা গেছে বারাসত মহকুমায় উলা বলে একটা গ্রাম আছে—সেটাই এলো বারাসত কিনা বলা শক্ত। তবে সেখানে রথের মেলার হয় না। জানুয়ারী ও মার্চ মাসে মানিক পীরের মেলা হয় প্রতি বৎসর। (২) দেগঙ্গা ত বর্দ্ধিষ্ণু জায়গা। (৩) সাইমানা নয় সাইবাগ বা সাইবানা বলে একটি খুবই ছোট গ্রাম আছে বারাসত মহকুমায়। এখানে নভেম্বরে হয় রাসমেলা। (৪) বারাসত মহকুমায় গোপাল নগর বলে কোন গ্রাম নেই। আছে গোপালপুর চণ্ডীগড়, গোপালপুর—নোয়াপাড়া ও শুধু গোপালপুর। এই সব তথ্য ১৯৫১ সালের Census Report থেকে সংকলিত।

THE LATE GOVINDRAM MITTER

['An Account of the late Govindram Mitter etc. etc. By a Member of the family. Calcutta '1869' —গ্রন্থের প্রয়োজনীয় প্রথম পরিচ্ছেদটি এখানে তুলে দেওয়া হ'ল। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর সৌজন্যে এটি সংগ্রহ করা গেছে।]

The late Govindram Mitter was the founder of the celebrated Mitter family of Koomartooly in Calcutta.

It is said that his ancestors lived in a village somewhere near Barrackpore or Chanak. He was the second son of Ratnessur Mitter, and grandson of Hongsessor Mitter, who gave him a liberal education in Persian, Bengali, and Sanskrit Languages, with a fair knowledge of the English tongue.

In about 1686-87 or 1093 B. E., Govindram Mitter was brought to the favourable notice of Mr Job Charnock, the then Governor of the English Factory, who finding him to be an educated, intelligent, and active young man, offered him an appointment in the service of the Hon 'ble East India Company, requesting him at the same time to remove his domicile.

Life and property not being very secure in those days of yore, Govindram thought proper in about 1687 or 1094. B. E. to remove from his ancestral place, and to settle himself in a place near the present Fort, which has since then been called after his name, Govindpore.

But when the Fort was to be built in Govindpore,

in about 1695-or 1102 B. E. Govindram Mitter at once removed thence, and settled himself in Koomartooly, a few yards from the Sobha Bazar, and built a a splendid mansion after clearing the jungles the place was beset with.

While in Govindpore, Govindram Mitter built a temple for a *Mohadeb* in that place, which still stands in a dilapidated state near the Great Jail of Calcutta.

Endowed with superior parts, strong common sense, and unfailing energy, Govindram Mitter rose very high in the estimation of his Hon 'ble Masters.

He was the Mayor of Calcutta. Mr Holwell in his treatise on the Black Hole, calls Govindram Mitter the Black Deputy or Zemindar.

In about 1730 or 1137 B. E., Govindram Mitter built a very stupendous and grand *Noborotna* temple on the Chitpore road, dedicated to 4 *Mohadebs.** It was famous for its high cupola, having nine steeples, the highest one of which was higher than the Octerlony monument, and the smallest one still stands on its original site with a large *Mohadeb* in it.

There were 4 *Mohadebs* placed in the four corners of the temple and other tutelary deities, named *Gocool Chunder*, *Radhika*, *Baladeb*, *Lakhi* and *Salgram*, in a portion adjoining to it, which was built after the fashion of a double thatch or Bangalow, whence the temple came to be called the *Jorebangala Mundir*. This appendage of *Jorebangla* added a peculiarity and beauty to the main Temple.

*বলাবাহুল্য, এই সেই বিখ্যাত 'Black pagoda' ডেনিয়েল যার ছবি এঁকেছিলেন। উইলিয়াম হিকির ও যার ছবি আছে। New man-এর Hand-book অনুযায়ী স্থাপিত ১৭৩০ সালে।

Govindram Mitter made an endowment of a most extensive and lucrative Zemindary called Pergunna Kristapore near Dum Dum, yielding an annual income of 10 to 15000 Rs. a year, with Govt. Revenue of not more than 1000 Rs. a year for the *Sheba* or support of the idols.

He also gave the idols, divers sorts of ornaments of pearls, diamonds, emeralds, saphire, gold and silver. Besides these, there were pure gold and silver *chowkees*, *pudmaashans*, bed-steads, utensils, dishes, waterpots, drinking vessels &c. the whole worth above 50,000 fifty thousand Rupees.

When the different members of the family separated themselves from each other, the above ornaments and other valuable articles were placed in custody of their spiritual guide, whose descendants have misappropriated them to their own use.

Govindram Mitter performed the Doorga Pooja Festival with great eclat. The images of Doorga and her companions were not of an ordinary kind. He caused them to be made in strict accordance to the description given of their persons in the *Shastras*. Most of the idols had gold and silver leaves attached to their bodies in lieu of the *Hartal* or yellow paint applied to the idols of others.

Again all the idols which were seven in number, viz.—the *Doorga* standing on a lion, and an *Asoor* or demon, the *Lakshmi*, the *Surusutty*, the *Mohadeb*, the *Ganesh*, *Ram Chunder* and *Kartic*, with their respective *Bahans* or conveyances, were made separate and kept apart from each other. At the time of worship they were placed on a silver throne

called *Merr* made of five compartments, which gave them a very beautiful, brilliant and divine appearance.

He used to offer *Nyvedyas* on very large brazen *thals*, the largest of which contained about 30 to 50 maunds of rice for a *Nyvedya* to the principal goddess *Doorga*. These very large curious *thals* are still to be seen at the house of his descendants.

When these idols—tobe cast into the river Ganges, they used to be conveyed in *Mohapaya*, *Chundol*, *Palky*, *Nalky* &c. all fitted up and equipped in costly embroidered cloths and coverings, each idol having a separate conveyance of its own. These splendid equippages are still to be seen at the places of his decendants.

The *Bodun* or the preliminary Pooja to propitiate the advent of the Goddess *Doorga* used to be held a fortnight before the said Pooja, i. e., on the 9th day of the moon in her dark side, when presents of cloths, silver, and copper, used to be made to about 1,000 Brahmans and Pundits from different parts of Calcutta and other places. Accomplished dancing girls were also engaged from that day for a fortnight in commemoration of the Pooja.

The next Poojah which Govindram Mitter performed in a most expensive and grand style was that of *Kally*, who is said to have been his favourite Goddess of worship. He used to give her gold and *Jarao* ornaments, and silver plates to the value of about 3,000 Rs. to present her sweetmeats to the quantity of nearly 200 maunds.

The greatest portion of these valuable ornaments and other gifts used to go to his spiritual guide, some

of whose descendants are now richer than his own descendants.

In 1756 or 1163. B. E. when Nabab Surjuddowla captured the English Factory of Calcutta, Govindram Mitter as a faithful servant of the Hon'ble Company, fought against the Nabab. But when the Nabab gained victory over the English and put them into the Black Hole, Govindram was put into "durance vile," and, after earnest expostulations, and humblest importunities, was released from it after a week or or two.

In the next year 1757 or 1164 B. E, on the successful result of the Battle of Plassey in favour of the English, and their triumphant return to the Factory of Calcutta, Govindram Mitter came back to his old masters, the Hon'ble East India Company, and was appointed by them to be the Deputy Fowzdar of the Police of Calcutta.

From his natural parts, tact, energy, perseverance and assiduity, Govindram Mitter excercised great influence over the factors of the Hon'ble Company; so much so, that they never did any thing without his advice.

This circumstances gave him an influeuce with his own countrymen, who looked upon him as the only mediator between the English and the Natives on an important subject or business.

This circumstance might have given rise to the Bengalee proverb known among the Natives, especially the old ones. It runs thus—Govindram's *Charri* or rod—Banamally Sirkar's *Bari* or house—Omi Chund's *Dari* or beard—Joguth Set *kouri* or money. Govindram's rod implies, that he was very powerful and influential man at the time. Bonamally

Sircar's house which was contiguous to that of Govindram Mitter, was considered the then best, having a very large compound, with a range of compartments for the accommcdation of *Athithe* or Guests, who, invariably received every attention and hospitality at his place.

Omichaund was a respectable rich merchant of the time, who had a long beard, which was rather rare in those days

Joguth Sett of Kasimbazar in Moorshedabad was the wealthiest banker in those days of yore.

In Govindram s splendid mansion in Koomartooly. there was a large compound of about 50 fifty beegahs, with a range of buildings on all sides. There is a third story room in it, which, was built of China porcelain bricks, which is still to be seen in the possessien of one his descendants. It is called the Rung Muhal, in which Govindram used to have *Nautches* every night for the entertainment of his his freinds and relatives.

Govindram Mitter had a splendid garden named Nundunbagan, with a large tank with 2 *Jal Toongees*, or water-rooms in it on the northern and southern sides of it. There was a grand *Bytakhanah* or Hall on the northern side of it, and a fine Hill with divers sorts of large trees upon it, beautifying the eastern side of the tank. This garden was however thrown outside the skirts of the Maharatta Ditch.

Govindram being a servant of the Hon'ble Company, and living under their protection, did not like that his pleasure garden should be beyond the Ditch of his Hon'ble Masters. Accordingly at his instance, the Ditch was turned round his garden, which has now unfortunately been the cause of many taxations to his descendants, who now wish, that it would have been a real boon to them, if Govindram had allowed his garden to remain out of the Ditch. Oh! What a change the present incongenial system of taxation has brought on the feelings of the people !!

At the nothern mouth of this Ditch, close to the Ganges near Baugbazar, there was sluice, through which the flow of tide was allowed to run through all parts of the town by this Ditch, in order to supply the Ditchers with fresh water every day. The people then very generally used to fill their tanks and wells with this water. But there was no sort of tax for this supply of water, as is now the case. Oh ! What a change has now come over the spirit of our rulers !!

Govindram Mitter lived to a good old age of about 80 years, leaving his only son Raghunath Mitter, to succeed him, in about 1766 or 1173 B. E.

The *Friend of India* in its issue of 12th July 1849, page 435, says, that, "the first notice we find of any municipal officer, is, in the year 1720 (1127 B. E.) when we are informed that the management of the revenues of the town, the ground rent, the monopolies and farm, was confided to a member of the Civil Service who was annually changed. In that year also, the celebrated Govindram Mitter, the ancestor of the present family of that name was appointed Naib Zemindar. He is styled by Mr Holwell, the Black Deputy, and he continued in the enjoyment of this office for about 32 years. The White Zemindar was often displaced two or three times in the course of the year, and thus, as that writer observes, a power in perpetuity devolved on the standing Deputy who was always styled Black Zeminder, and such was the dread conceived of him in the mind of the natives, that no one durst complain against him. "Revd. Mr J. Long also alludes to the celebrated Govindram Mitter in his "Peeps into the social life in Calcutta a century ago, "published on the 24th July 1868.

The *Doorga* and *Kally* Poojahs which were held with great pomp and ostentation by Govindram Mitter, are now a days done so only by his great great grandsons, Baboos Grudoss Mitter and Baradadoss Mitter of Benares and no longer by any of his off-springs in Koomortooly or Nundunbagan, Calcutta.

॥ নির্ঘণ্ট ॥

অ

অভয়চরণ মিত্র—১০১, ১০২

অভিরাম—১৪৭

অর্ম (রবার্ট)—১৭৩

অন্নপূর্ণা—২০৬

আ

আডামস্—৫৭

আকবর—৪২

আলিজান ভাই—৮০

আজিমুশ্বান—১৪৩

আলীবর্দী—১৬৭

আব্দুল আলি—১৯২

ই

ইব্রাহিম (মীর)—১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬৩, ১৭৩

ঈ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—১৬৭

উ

উইলসন—১০, ১৬, ৩৬, ৬৫, ৬৭, ৭৯, ৮৯, ১২৭, ১৪২, ১৭৩, ১৭৪

উড—৩১, ১৪৯

উমিচাঁদ (আমিন চাঁদ)—৪৯, ৫০, ৭৯, ৮৭, ৯০, ৯৬, ১২৮, ১৫৯, ১৭৯, ১৮৫, ১৯৩, ২৩৭, ২৪৬, ২৪৭

উইণ্ডার—৫৫, ১৬২

উলিয়ামসন (জেমস)—৬৭

উইলিয়াম থার্ড—১৫৫, ১৮৬

উমর বেগ—১৬৫

ও

ওয়েল্টডেন—৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬৫, ১২৬, ১২৭, ১৩১, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৮, ১৪১

ওয়াটসন—৭৬, ৭৭, ৭৮

ওয়েলর (নিকলস)—৫৯, ৯৩

ওসমান—১৩৪

ঔ

ঔরঙ্গজেব (আলমগীর)—৫৮, ১১০, ১৩০, ১৫৬, ১৫৭, ১৬৫, ১৭৮

ক

কোল—৫৫, ৫৬

কিং—৫৫, ১০৮

কেদার রায়—৬২

ক্লাইভ—৬৪, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ১২৮, ১৬৫, ১৮৭

কাশীনাথ—১৯৩

কান্তমুদী—১৫৪

কলেট—৭০

কুড়োরাম—৮১

কলেট (মিস)—৯১

কেষ্টচরণ—১০০, ১০১

কোলব্রুক—১০১

কর্ণওয়ালিস—১০২, ১৬৭
কামদেব—১১৮
কেনারাম—১২৭
কিরণচন্দ্র—১২৭
কালিদাস—১২৮
কৃষ্ণচন্দ্র—১৬৬, ১৬৭
কৃষ্ণরাম—১৬৬
কৃষ্ণদাস দেব মল্লিক—১৭৮
ক্লেটন (ডেভিড)—১৮৫

গ

গোবিন্দরাম মিত্র—১৩, ৩৩, ৩৫, ৪৫, ৫০, ৭৫, ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬ ৮৭, ৮৮, ৮৯. ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮ ৯৯, ১০০, ১০২, ১০৭, ১১৯, ১৭৮, ১৯০, ১৯১, ২০০, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮
গঙ্গারাম—৪৫
গোপাল (শেঠ)—১৩২, ১৪৭
গনি (আব্দুল)—১৭০
গুরুদাস মিত্র—২৪৮

ঘ

ঘনশ্যাম—১৪৭

চ

চাঁদ রায়—৬২
চার্নক (জব)—৮৮, ৮৯, ৯৪, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ২৪২,
চিট্টি—১৩২, ১৪৪, ১৪৫
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী—১৯৫
চলচ্চন্দ্র সেনদাস—২০২

জ

জগত দাস—১৩, ৩৩, ৫১, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৪, ৬৫, ১০৭, ১২৫, ১২৭, ১৩১
জগত শেঠ—২৪৬, ২৪৭
জনার্দন শেঠ—১৩, ৬০, ৬১, ১২৯-১৩৬, ১৪১, ১৪২
জয়রাম কলু—১৬, ৬১, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭২, ৭৪
জীমূতবাহন—১৯৫
জয়ন্তীচন্দ্র সেন—৪০, ৪১, ৪৩-৪৫, ৪৯, ২০২, ২০৫, ২০৬, ২১০, ২২২, ২২৪, ২২৬, ২৩০, ২৩২, ২৩৫, ২৩৭
জাফর খাঁ—১৪৬
জাহাঙ্গীর—৪৭
জয়নারায়ণ ঘোষাল—৯৩
জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন—১০১, ২০০
জিতমল কড়োড়ী—১১০
জয়দেব—১১৮
জিয়াউদ্দিন—১৩১, ১৩২, ১৪৩, ১৪৪
জয়কৃষ্ণ—১৩২
জগত সিংহ—১৩৪
জাহান্দার শা—১৪৩

ড

ড্রেক (রোজার)—৭৭, ৭৮, ৮১, ১৮৫

ডেনিয়েল—২৪৩

দ

দীপচাঁদ ভাল্লা—১৩, ১২৮

দুর্গারাম দত্ত—৮০

দয়ারাম বসু—৮০

দয়াকৃষ্ণ সরকার—৮০

দুর্গারাম বেদসঙ্গী—৮১

দুর্গারাম সারামাত—৮১

দ্রোপদী (টুনুমনি)—১২৭

দীনবন্ধু মিত্র—১৬৬

দর্পনারায়ণ মল্লিক—১৭৮

ন

নন্দরাম সেন—১৩, ১৮, ২৫, ২৯-৩৮, ৪১-৫০, ৫২, ৫৩, ৬০, ৬৫, ৬৬, ৮২, ৯০, ৯১, ১০৭, ১১৯, ২০২-২০৫, ২১৪, ২২৬

নাইটেঙ্গল—১৬০, ১৬৩

নারায়ণ ঠাকুর—৪৩

নয়নচাঁদ মল্লিক—৮০, ১৭৮, ১৭৯

নীলমণি মল্লিক—৮০

নীলমণি চন্দ্র—৮১

নবকৃষ্ণ—১০১, ১৬৫, ১৯০

নাসির (মীর)—১১২-১১৫, ১১৭

নন্দরাম শেঠ—১২৭

নন্দকিশোর—১৪৭

নরিস (উইলিয়ম)—১৫৬

নিউম্যান—২৪৩

প

পারকিনসন—১৫, ২০

স্পেনসার—৩৫

প্রতাপাদিত্য—৬২

পেজ—৬৭

প্যাটল (এডওয়ার্ড)—৫১

পার্কস (ফ্যানী)—১৯০, ২০১

প্রমথচন্দ্র—২০২

পীতাম্বর ঘোষ—২২৯

ফ

ফররুকশীয়র—৪৩, ১৪৩

ফিক—৬৭

'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'—২৪৮

ব

ব্রুশ—১৭২

ব্রজাঙ্গনা কাব্য—২০২

ব্ল্যাক প্যাগোডা—২৪৩

বরদাদাস মিত্র—২৪৮

বিপিনমোহন সেন—১৬৬, ১৬৭

বিনয় ঘোষ—১৬৬

বলরাম রায়—১৬৭

বারাণসী শেঠ—১৩, ৬৭, ৮৭, ১২৭, ১৩২, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৪১—১৪৮ (কিছু কিছু জায়গায় এঁর নামের বানান মুদ্রণ প্রমাদে বেনারসী বা বানারসী হয়ে গেছে।)

বৈষ্ণবচরণ শেঠ—১৩, ১৪৯

বাউচার—২০, ৩১-৩৩, ৫১-৫৫, ৯৮, ১০৭, ১০৮
ব্রাঁউ (সামুএল)—৫৭, ১১১, ১১৫-১১৭, ১২৫, ১৫২, ১৪৫
বিশ্বনাথ তর্কবাগীশ—৪২ ৪৩, ৪৭
বুলন্দ খাঁ (শের)—১৩০
বীরেশ্বর—৪৩
বিয়ার্ড (জন)—১২৭, ১৫৬, ১৫৭
বনমালী সরকার—১০, ২৪৬, ২৪৭
বলরাম মিত্র—৯৩
বেদার বখ্‌ত—১১০
বাহাদুর শা—১৪৩

ভ

ভগবতীচরণ মিত্র—১০২

ম

ম্যাথিসন—১৬
মধুসূদন দত্ত—২০২
মুর্শিদকুলি খাঁ—১১, ১১২, ১১৫. ১৩০, ১৫৪, ১৫৯. ১৬০, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮
মানিকচাঁদ—৭৭, ৭৮, ১৮৭
মীরমদন—১৮৬
মীরজাফর—৭৯, ৮০, ১০০, ১৬৫, ১৮৭
মীরকাশিম—১০০, ১৮৭
মুর (হ্যারী)—৫৭, ৬৯, ১১৪, ১১৬
মন্মথচন্দ্র—২০২
মিনকিন—৮৮
মুকুন্দরাম—১২৭,১২৮
মীর মহম্মদ রাজা—১৩০, ১৩১
মদন মিত্তির—১৩৭, ১৩৮, ২২৯
মানিকচাঁদ—১৪৫, ১৪৬
মহীউদ্দীন—১৬৩
ম্যাকক্কাচন (ডেভিড)—২০৬

য

যদু—১৩১, ১৪৭

র

রবীন্দ্রনাথ—৯
রামচন্দ্র—১৩, ১৯, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৮-১৬২, ১৬৪-১৬৭
রূপচাঁদ—১৩
রাজারাম মল্লিক—১৩, ১৪৭, ১৫৯, ১৬৭, ১৬৯, ১৭১, ১৭৫, ১৭৬-১৭৯
রামভদ্র—১৩, ১৬, ৩৩, ৬২-৭৫, ১০৭, ১২৫, ১৪১
রাধানাথ শিকদার—১৭
রাধাচরণ মিত্র—৩৫
রামনাথ পাটোয়ারী—১৯, ১০৭, ১০৯, ১১০, ১১৪, ১১৭-১১৯, ২০০
রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ—৪৩
রামেশ্বর শিব—৪৪, ৪৬
রাসেল (জন)—৬৫, ৬৭, ১২৫-১২৭, ১৩১, ১৩৮-১৪১, ১৪৩-১৪৫, ১৬০
রো (নিকলস)—৬৩, ৭১-৭৪
রঘু—৫৯
রতন সরকার—৮০, ৮১

রামকিশোর চক্রবর্তী—৮১
রঘুনন্দন—১৪৭, ১৯৫, ২০১
রঘুনাথ মিত্র—২২৮
রত্নেশ্বর মিত্র—২৪২
রাজকৃষ্ণ মজুমদার—২৩০
রামানন্দ বসু—২২৯
রামকান্ত বসু (খোনা)—২২৯
রামদেব—৮১
রবিনস্—৮৭
রত্নেশ্বর—৮৯
রঘুনাথ—৮৯, ১০১
রাধাকৃষ্ণ দত্ত—৯৩
রাজচরণ—১০১
রাজেন্দ্র মিত্র—১০২
রাভেনহিলস্—১৩৭, ১৩৮
রেবেকা—১৪০
রামকৃষ্ণ খাঁ—১৪২
রামকৃষ্ণ—১৪৯
রাসবিহারী (শেঠ)—১৪৯, ১৮৭
রো (টমাস)—১৫৬
রেডশ'—১৬২

ল

লক্ষণ উকিল—১৩, ১৫৪
লয়েড—৫৭
লঙ্—৭৯, ২৪৮
ললিতা—৮১
লক্ষ্মীনারায়ণ—১৩৭
লিটলটন (এডওয়ার্ড)—১৫৬, ১৫৭
লিগুস্ (উইলিয়ম)—১৮৮

শ

শেলডন (রালফ্)—৩০-৩৪, ৩৬, ৪১, ৪৯, ৫২-৫৫, ৬০, ৬৫, ৮২, ৯৮, ১০৭, ১৩৩, ১৩৭, ১৫৭, ১৭৫
শুকদেব মল্লিক—৮০
শ্যামসুন্দর সিংহ—১৬৪
শোভারাম বসাক—৮০, ৮১
শুকদেব মিত্র—৮১
শ্যামদাস—১০৯
শিবরাম—১৬৬
শায়েস্তা খাঁ—১৭৩
শ্রীনাথ—১০৭
শম্ভু কর—২৩৫

স

সন্তোষ মল্লিক—১২, ৬৫, ১৫৪, ১৭৮
সাবর্ণ চৌধুরী—৩০
সিরাজদ্দৌল্লা—৪৩, ১৬৫, ১৮৬, ১৮৭, ২৪৬
সাদিক (মহম্মদ)—৮০
স্টার্নডেল—৮৯, ৯২, ৯৩
সীতারাম রায়—১১২, ১১৪-১১৭

হ

হ্যামিলটন (আলেকজাণ্ডার)—৩৯, ১৩১
হেজেস (উইলিয়ম)—৬৭, ১৪০, ১৬৩

হেজেস (রবার্ট)—৬৭, ১১২, ১১৪, ১১৬, ১১৭, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৬, ১৪৮, ১৫৭, ১৭৫
হরেকৃষ্ণ ঠাকুর—৮০
হরতন বিবি—৮১
হরিরাম ঘোষ—৮১
হলওয়েল—৮২-৮৬, ৯১, ৯৫, ৯৬, ৯৮-১০০, ১৮৩-১৯৮, ২০০, ২০১, ২৪৩, ২৪৮
হেস্টিংস (ওয়ারেন)—৮৭, ৮৯, ৯৩
হংসেশ্বর—৮৯, ২৪১
হুজুরীমল—৯০, ১৭৯, ১৯৩
হরিনাথ—১৪২, ১৪৮
হরেরাম গোঁসাই—১৪৬, ১৪৭
হীথ—১৭৩
হিকি (উইলিয়ম)—২৪৩

[এই নির্ঘণ্টটি তৈরী করে দিয়েছেন শ্রীমান চিত্তরঞ্জন দত্ত।]

॥ শুদ্ধিপত্র ॥

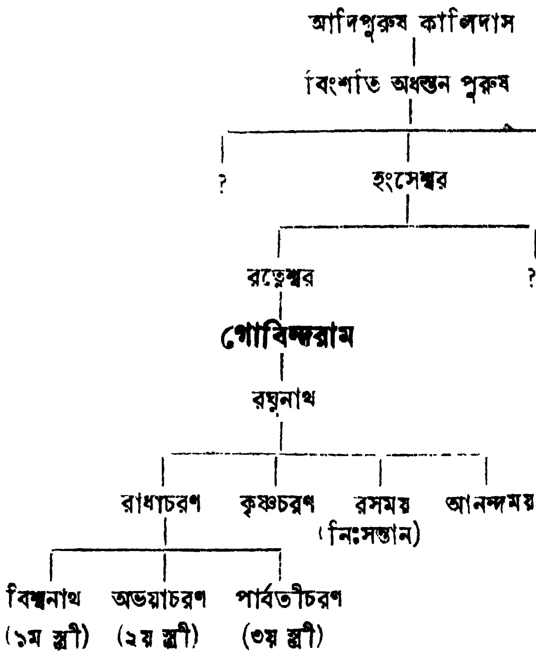
(যাঁদের কোনরকমই ভূতের ভয় নেই, প্রত্যয় ত নেই-ই, তাঁরাও কিন্তু ছাপাখানার ভূত বা 'প্রিন্টার্স ডেভিলে'র হাত থেকে রেহাই পান না। অবশ্য অন্যমনস্কতার সুযোগই এরা সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করে। এবং প্রতাপ জাহির করে। তবে ভাগ্য ভালো, দেরীতে হোক, এই সব 'ভূতের কীর্তি'গুলি ধরা পড়েছে। দেখা গেছে, বহু 'বিস্ময়' হয়েছে 'বিশ্ময়', 'বিত্ত, হয়েছে 'চিত্ত'। কোন কোন জায়গায় লাইনকে লাইন বা শব্দ বেমালুম বাদ হয়ে গেছে। যাইহোক, সেগুলির বিশেষ কয়েকটার অন্ততঃ শুদ্ধপাঠ পাশেই দেওয়া হ'ল।

পৃষ্ঠা	লাইন	বর্তমান পাঠ	শুদ্ধপাঠ
৩১	৮	নীচে	ওপরে
৩৪	২২	সুবেদার	ফৌজদার
৩৫	৫	সুবেদার	ফৌজদার
৪৩	২৩	সম্রাট ফররুকশায়রের	আজিমুশ্বানের
৬২	১৩	ভূষণার সীতারাম রায়	বা আরঙ্গজেবের সেনাপতি সঙ্গে ভূষণার সীতারাম রায়
৬৭	৬	কন্সটিটিউট	কর্নাসিষ্ট
৭১	১৪	হুকুক	হুকুম
৭২	২৫	কাছে গি শ্বা পড়ল	কাছে গিয়ে পড়ল
৮০	১২	দর্জিপাড়ার নীলমনি মল্লিক	পাথুরেঘাটার নীলমনি মল্লিক
৮০	১২	রতম সরকার	রতন সরকার
৮৬	১৯	করে ফেলেছিলেন	(এরপর একটা লাইন হবে) এই নবরত্ন মন্দিরের সামনেই আজকের সিদ্ধেশ্বরী মন্দির
৮৬	২৩	মন্দির	নবরত্ন মন্দির
৮৮	১৭	তার ছেলেমেয়েদের বিলেতে পাঠিয়েছিলেন	তার মেয়েদের মাদ্রাজ পাঠিয়ে 'ব্যাপ্টাইজ' করিয়েছিলেন

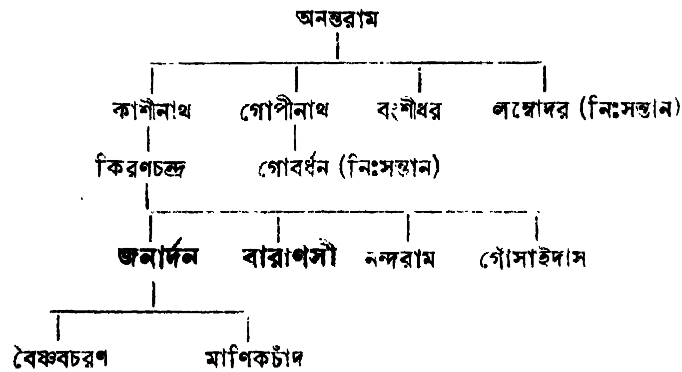
পৃষ্ঠা	লাইন	বর্তমান পাঠ	শুদ্ধপাঠ
৯৪	১৮	জোড়া বাঙলো ধরণের গঠন মন্দিরের	কলকাতায় জোড়া বাঙলো ধরণের কোন মন্দির নেই। রত্ন-মন্দিরই অনেক। এটি আবার নবরত্ন।
৯৬	১৩	তাঁর নন্দন বাগান	(এর পর একটি লাইন বাদ গেছে।) এই নন্দন বাগানের পাশেই উমিচাঁদের বাগান। একালের হালসি বাগান।
১০২	১১	যাঁরা এখনও টিকে আছেন, তাঁরা কাশীবাসী	কয়েকজন এখনও টিকে আছেন। এঁদের অনেকেই কাশীবাসী
১০২	১২	এই শাখার আদি পুরুষ	এই শাখার বিশিষ্ট পুরুষ
১১৮	২০	তারা রঘুনাথকে চাবকাতে	তারা রামনাথকে চাবকাতে
১৩২	২৫	এখনকার বড়বাজার-চিৎপুর রোডের	এখনকার বড়বাজার-হ্যারিসন রোডের
১৩৯	২২	আরও নীচে	আরও উপরে
১৪৩	১৪	পশ্চিম ভারতের	দক্ষিণ ভারতের
১৪৯	১৭	উড্ সাহেবের ম্যাপে	উইলিয়াম ওয়েলস্ সাহেবের ম্যাপে (১৭৫৩)
১৩২	২১	ফৌজদারের কোষখানায়	ফৌজদারের তোষাখানায়
১৭০	১০	গোড়া	গড়া
১৭৪	২৩	(এস-হেইম)	(এস-হেইন্)
১৭৫	১২	কতই	কাজেই
১৭৮	১৯-২০	এঁরই তৈরী করা	এঁরই অধস্তন পুরুষের তৈরী করা
১৮৩	১৯-২০	কলকাতা 'মিউনিসিপ্যালটি'র প্রথম 'চেয়ারম্যান'	কলকাতার প্রথম 'মেয়র'!
১৮৩	১৯-২০	আর তাঁর সাম্রাজ্য ছিল	আর তাঁর অন্ততঃ খাতায়-কলমে সাম্রাজ্য ছিল
১৮৪	১	দক্ষিণবাড়ী, বাহির দক্ষিণবাড়ী	দক্ষিণদাড়ী, বাহির দক্ষিণদাড়ী
১৮৯	৭	কোম্পানীর খাস চাকরিতে	কোম্পানীর কাছারির চাকরিতে
১৯২	২৩	নাম-জাহানুমা	নাম-ই-জাহানুমা
১৯৬	১৪	তস্মৈ চিত্তং…ক্রীড়া	তস্মৈ চিত্তং…ক্রীড়াং

কয়েকটি সম্ভাব্য বংশতালিকা

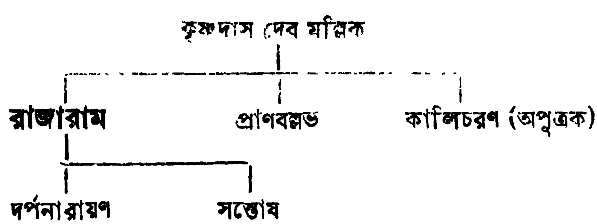
১। শ্রীবসন্তকুমার বসুর 'কায়স্থ পরিচয়' অনুযায়ী গোবিন্দরাম মিত্রের সম্ভাব্য বংশতালিকা—



২। শ্রীনগেন্দ্রনাথ শেঠের গ্রন্থানুসারে জনার্দন ও বারাণসী শেঠের সম্ভাব্য বংশতালিকা—



৩। শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিকের 'কলিকাতার কথা' অনুযায়ী রাজারাম মল্লিকের সম্ভাব্য বংশতালিকা—



C. R. Wilson—Early Annals of the English in Bengal Vols. I—III.
Ibid—Old Fort William in Bengal. Vols. 1 & II.
H. H. Wilson—Military History of British India.
W. W. Hunter—History of the British India. Vol. II.
Seton-Kerr—Selections from the Calcutta Gazettes. Vol. I.
William Bolts—Consideration on Indian Affairs.
C. E. Buckland—Bengal under the Lieutenant Govenors.
L. S. S. O'Malley—Bengal District Gazette (24. Parganas).
Curzon—British Government in India. Vols. I & II.
H. E. Busteed—Echoes of Old Calcutta.
T. G. P. Spear—The Nabobs.
W. H. Carey—Good Old Days of Hon. John Company. Vols. I & II.
Charles Stewart—History of Bengal.
K. C. Sterndale—An Historical account of the Calcutta Collectorate etc.
A Hamilton—A New Account of the East India.
Sir Henry Yule—Hedge's Diary
H. E. A. Cotton—Calcutta Old and New.
K. Blechendvn—Calcutta Past and Present.
J. Z. Holwell—Tracts.
Ibid—Historical Events etc.
J. Long—Selections from theUnpublished Records of the Government, etc. Vol. I.
Seid Gholam Hossain Khan—Seir-e-Mutwakherin (English Translation).
N. N. Ghose—Memoris of Maharaja Nabakrishna Dev Bahadur
G. D. Bysack—Kalighat and Calcutta.
Benoy Krishna Dev—The Early History and Growth of Calcutta
A. K. Roy—Census of India 1901—Calcutta ed.
Gaura Narayan Bose—A legend of the Sovabazar Sen Family.
W. K. Firminger—The Founder of Calcutta (Articles Benga Past & Present)
Member of the family—An Account of the late Govindram Mitter etc.

Michael Edwards—The Battle of Plassey and the Conquest of Bengal
W. Hickey —Memoirs of William Hickey. 4 Vols.
David Mccutchion—Temples of Calcutta. (article)
Fanny Parks—Wondering of a pilgrim, Vols, I & II.
W. Word—A view of the history, literature and mythology of the Hindus.

প্রমথনাথ মল্লিক—কলিকাতার কথা (দুই খণ্ড)
হরিসাধন মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা সেকালের ও একালের
হরিহর শেঠ—প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়
ঐ —পুরাতনী
অক্ষয়কুমার মৈত্র—ফিরিঙ্গী বণিক
তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়—পলাশীর যুদ্ধ
ঐ —পলাশীর পর বক্সার
নিখিলনাথ রায়—মুর্শিদাবাদ কাহিনী
সুবলকুমার মিত্র—কলিকাতার কথা
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙলার ইতিহাস (দুই খণ্ড)
সমুদ্রগুপ্ত—শহর কলকাতার আদিপর্ব
নকুল চট্টোপাধ্যায়—তিন শতকের কলকাতা
শ্রীপান্থ—আজবনগর
ঐ —শ্রীপান্থের কলকাতা
রাজেন্দ্রকুমার মিত্র—গোকুলচন্দ্র মিত্র ও সেকালের কলিকাতা
নরেন্দ্রনাথ লাহা—সুবর্ণবণিক কথা (তিন খণ্ড)
কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ—ভট্টপল্লী ব্যাশিষ্ট পরিচয়
শিবেন্দ্র নারায়ণ শাস্ত্রী—কলিকাতার পারিবারিক ইতিহাস
বসন্তকুমার মিত্র—কায়স্থ পরিচয়
নগেন্দ্রনাথ শেঠ—কলিকাতাস্থ তন্তুবায় জাতির ইতিহাস
বিপিনমোহন সেন—চাঁদরাণী
বিনয় ঘোষ—পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি
ঐ —সুতানুটি সমাচার
ঐ —টাউন কলকাতার কড়চা
জয়ন্তীচন্দ্র সেন—নন্দরাম সেনের জীবনোপাখ্যান
সতীশচন্দ্র মিত্র—যশোর ও খুলনার ইতিহাস
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী—বাংলার পালপার্বণ